বৈচিত্র্যময়

মেদিনীপুরের ইতিহাস

বৈচিত্র্যময়

মেদিনীপুরের ইতিহাস

১ম খণ্ড

শ্যামাপদ ভৌমিক

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
১৯৯৯

Baichitramoy Medinipurer Itihas
by Shyamapada Bhowmik

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
নীলিমা ভৌমিক

প্রকাশক ঃ
ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
প্রাণগোপাল ঘোষ
পি - ৭১৬ মহাত্মা গান্ধী রোড
ঠাকুর পুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৬৩

মুদ্রাকর ঃ
রবি দত্ত
ইমপ্রেশান হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট্
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মামণিকে—

এবং

যে নেই, অথচ আজও আমার সব,

সেই অন্বেষণকে—

ভূমিকা

বিগত পাঁচ-ছ য় বৎসরের সময়কাল যাবৎ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু বিষয়কে এই প্রবন্ধ-সংগ্রহ একত্রিত করেছে। মেদিনীপুরই এই সংগ্রহের নিবন্ধগুলির অন্তর্গত মিল। প্রচেষ্টা যথার্থ কিনা তা পাঠকের বিচার্য বিষয়। শুধু বলতে পারি, কোন একজন লোকের পক্ষে জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সহজ নয়, বোধ করি সম্ভবও নয়। বিশেষতঃ মেদিনীপুরের মত বিরাট ও বৈচিত্র্যময় জেলার ক্ষেত্রে; যার আয়তন ও জনসংখ্যা ভারতের অনেক রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী। আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে মেদিনীপুরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষাপট সহ বর্ণনা ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়গুলির কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন; কয়েকটি নতুনভাবে বিশ্লেষিত বা পরিবেশিত। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সাধারণ পাঠকের কিছুটা কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

তবে কোন লেখাই বোধহয় ঐতিহাসিক অর্থে সম্পূর্ণ নয়। বিশেষতঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের বেলায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় যেটুকু জানা গেছে, অজানা থেকে গেছে তার ঢের বেশী। আরো বেশী তরুণ গবেষককে এবিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের সামগ্রিক ইতিহাসের স্বার্থে।

আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। জানি কোন যোগ্যতর ব্যক্তি একাজ করলে আরও হয়ত ভালো হত। কিন্তু যেহেতু ইতিমধ্যেই বহু তথ্য হারিয়ে গেছে, আরো দেরী করলে আরো বিলুপ্তির সম্ভাবনা। তাই ভাঙ্গা মন ও শরীর নিয়ে যতটুকু পেরেছি ততটুকুই এই গ্রন্থে নথিভূক্ত করার চেষ্টা করেছি। মাতৃভূমির প্রতি ঋণ শোধ করবার এ আমার সামান্য চেষ্টা মাত্র।

'দাঁতনের ইতিকথা' আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ডুলুং-এর তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (১৩৯৯), 'স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজ' এর কিয়দংশের ইংরাজী তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব হিষ্ট্রি-এর ভল্যুম ওয়ানে। রানী শিরোমণি ও কৃষকবিদ্রোহ' প্রকাশিত হয়েছে ইতিহাস অনুসন্ধান - ১০ (১৯৯৫) এ। 'রেলশ্রমিক আন্দোলন এবং .....' ইতিহাস অনুসন্ধান - ১১ (১৯৯৬) তে। তাছাড়া 'মেদিনীপুরের ডোম সম্প্রদায়ের বিবর্তন' প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছে ১৯৯৯ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ১৫শে বার্ষিক সম্মেলনে। ইতিহাস অনুসন্ধানের আগামী সংখ্যায়

প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন। বাকী প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে লেখা, তাই গ্রন্থনার ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক ক্রম অনুসরণ করা যায়নি। তথ্য বিবৃতি ও বিশ্লেষণে ভুলভ্রান্তি যে নেই, কিংবা মুদ্রণ প্রমাদ যে নেই, সে কথা আমি বলতে পারবো না। আশা রাখি, পাঠকরা নিজগুণে মার্জনা করবেন।

বইটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে যাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সাহায্য আমি পেয়েছি তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত পুস্তক প্রণেতাদের যাঁদের বই থেকে প্রচুর তথ্য ও তথ্যসূত্র জানতে পেরেছি। সুবর্ণরেখার শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় পুস্তকটি প্রকাশে সম্মত হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ প্রখ্যাত শিল্পী প্রাণগোপাল ঘোষের কাছে — পুস্তকটির প্রচ্ছদ করে দেওয়ার জন্য।

সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ আমার আরাধ্য পরমশ্রদ্ধেয়া মামণির কাছে. তাঁর আশীর্ব্বাদ না পেলে এই বই জগতের আলো দেখতো না। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আজকের দিনে যার কথা আমার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে, যার হাসি হাসি মুখখানা আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে, যার তাগিদে আমার লেখা শুরু, সে আজ পাওয়া না পাওয়ার হিসাব নিকাশের বাইরে অনন্ত শুন্যতায় ভাসমান - সে আমার আত্মজ অন্বেষণ। অন্বেষণের জন্যই অন্বেষণ।

কিন্তু রাক্ষুসী দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পেয়ে আজও আরেকটি মরমী হৃদয় আমার জন্য রয়ে গেছে; আমাকে সমস্ত দুর্বলতা থেকে নিরন্তর রক্ষা করার চেষ্টা করছে, সেই নীলিমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন বোধকরি না।

'অন্বেষণ'
জীবনানন্দ সরণি
উত্তর ইন্দা (খড়গপুর)
মেদিনীপুর - ৭২১ ৩০৫
২৫. ৮. ৯৯

শ্যামাপদ ভৌমিক



পৃষ্ঠা

লেখকের অন্যান্য পুস্তক ঃ-

- HISTORY OF THE BENGAL NAGPUR RAILWAY WORKING CLASS MOVEMENTS (1906-1947)
- খড়গপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)

পুস্তিকা

- A HOMAGE TO PROF. H. B. SARKAR

এক

মেদিনীপুর জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও নামকরণ

মেদিনীপুর জেলাই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। লোক সংখ্যাতেও সর্বাধিক। আয়তনে ১৩,৭২৪ বর্গ কি. মি.। জেলাটি ২১° ৩৬′ ৩৫″ থেকে ২২° ৫৭′ ১০″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ১২′ ৪০″ থেকে ৮৬° ৩৩′ ৫০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে মোটামোটি ভাবে অবস্থিত। এই জেলার অবস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিমপ্রান্তে। জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা, পুর্বে হাওড়া ও চব্বিশ পরগনা এবং পশ্চিমে বালেশ্বর, ময়ুরভঞ্জ, সিংভূম ও মানভূম। আবার উত্তর পশ্চিম কোণে একটি সংকীর্ণ ফালি স্পর্শ করেছে পুরুলিয়া জেলাকে। এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিক কালের মেদিনীপুরবাসীর কর্মকৃতির উৎস ও ধর্ম, কর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই জেলার একদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, বাকি অংশে সমভূমির সাম্য - এটাই মেদিনীপুরবাসীর ভৌগোলিক ভাগ্য।

সাতটি মহকুমা সম্বলিত মেদিনীপুর জেলার জলবায়ু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। জেলার উত্তরাঞ্চলের জলবায়ুর সাথে দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ুর ভিন্নতা লক্ষিত হয়। দক্ষিণের জলবায়ু সমুদ্রের প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ। উত্তরে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়েই তীব্র। আবহাওয়া আর্দ্রতাহীন। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে মাটির রং লাল, চাষের অনুপযুক্ত। স্থানে স্থানে পাহাড় ও টিলা। অঞ্চলটি পাথুরে হলেও রুদ্র রুক্ষ নয়। বিভিন্ন গাছগাছালিতে ভরা। পূর্বকালে অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তাই নাম ছিল 'জঙ্গাল মহাল'। বৃটিশ আমলে ব্যাপক বৃক্ষছেদন চলে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাঠের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দফায় দফায় বনসংহার চলতে থাকে। অঞ্চলের শাল, সেগুন, পিয়াশাল প্রভৃতি বৃক্ষ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করে মুনাফাখোররা প্রভূত মুনাফা লোটে। জঙ্গলের কাঠকে ব্যাপক কাজে লাগায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী রেল-পথের নির্মান কাজে। বাংলার বহু জায়গায় নদীর ওপর সেতু নির্মাণে এই অঞ্চলের কাঠকে ব্যবহার করা হয়। আশার কথা বর্তমানে সরকার ও পঞ্চায়েত কর্তৃক বন-সৃজন ও রক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাই সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মেদিনীপুর জেলা বনসৃজনে পুরস্কৃত হচ্ছে। তবে পূর্বের জঙ্গলমহিমা ও সৌন্দর্য্য আর বোধহয় ফিরবে না। পূর্বে এই জঙ্গলে যে সব জীবজন্তু বাস করতো, সেই সব বাঘ, ভালুক প্রভৃতি এখন আর নেই। তবে মেদিনীপুরের পশ্চিমের জঙ্গলে আজও মাঝে মাঝে চিতা ও নেকড়ের উৎপাত

হয়। সবথেকে বেশি উৎপাত ও ক্ষতি করে দলমা পাহাড় ও বিহারের জঙ্গল থেকে আগত বুনো হাতীর দল। হাতীর অত্যাচার খবরের শিরোনামে উঠে আসে। বনদপ্তর হাতীদের বাগে আনতে হিমশিম খায়। এই অরণ্যই ছিল একদিন এই অঞ্চলের মানুষের বাঁচার, জীবনধারনের অবলম্বন। আজ আর তা নেই। মানুষের শহুরে সভ্যতার টানে আঞ্চলিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। যুব সমাজ চাকরির খোঁজে দিশেহারা। কেউ কেউ চিরাচরিত চাষবাস ছেড়ে অধিক লাভজনক নতুন চাষে নেমেছে। যেমন - ফুল চাষ, ছাতু চাষ, মাছ চাষ প্রভৃতি।

তবু আজ জেলার প্রধান ফসল ধান। বহু ধরনের ধানের চাষ হয়। আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে। প্রায় জায়গায় দো-ফসলী চাষ হচ্ছে। ফলে গ্রামীন এলাকায় ভূমিহীন ক্ষেত মজুররা প্রায়ই কাজ পাচ্ছে। এই জেলায় ধান ছাড়া আর চাষ হয় সরিষা, রাই, তিল, কয়েক রকমের ডাল, আলু, বেগুন, লঙ্কা, টমেটো প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি। তুঁত চাষও হয়ে থাকে জেলার বিভিন্ন জায়গায়, তবে প্রধানতঃ তমলুক ও ঘাটালে। মাদুর তৈরীর জন্য জেলার সবং, পাঁশকুড়া, নারায়ণগড় প্রভৃতিঅঞ্চলে মাদুর কাঠির চাষ করা হয়। মাদুর কাঠিকে অনেকে 'খাঞ্চি' বলে। মোঘল আমলের আগে থেকেই[১] মেদিনীপুরের মাদুরের কদর সর্বত্র। বর্তমানে নাইলনের মাদুর সবং এর মাদুর শিল্পকে বিশেষ আঘাত হেনেছে। তথাপি মেদিনীপুরের মাদুর শুধু ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নয়, পৃথিবীর বহু জায়গায় রপ্তানি হচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

জেলার আর একটি অর্থকরী ফসল হল পান। বছরে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার পান উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদনের বেশীর ভাগই যায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। যেমন আসাম, বিহার , মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, কেরালা, হিমাচলপ্রদেশ, কাশ্মীর, অন্ধ্র, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তামিলনাডু ইত্যাদি। পানের কেনাবেচা ও চালানকে কেন্দ্র করে কয়েকটি আড়তও গড়ে উঠেছে। এদের ভিতর কাকটিয়া, মেছেদা, নন্দকুমার ও চৈতন্যপুর উল্লেখযোগ্য[২]। আখের চাষ ও গুড় তৈরী ভসরা, কেশিয়াড়ী অঞ্চলে বেশ ভালই হয়। খেজুরিতে খেজুর গাছের উপর ভিত্তি করে খেজুর রস ও গুড় তৈরীর শিল্প গড়ে উঠেছে। গড়বেতার আলুর চাষ ও মেছেদা পাঁশকুড়ার নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ফুলের চাষ জেলার আর্থিক কাঠামোকে অনেক সুদৃঢ় করেছে। কাঁসাই নদীর দুই তীরে ব্যাপক সবজির চাষ হয়। সমুদ্রতটবর্তী এলাকায় সুপারী ও নারকেল যথেষ্ট হয়। জেলার চাহিদা মিটিয়ে এগুলি অন্যত্র রপ্তানি হয়। নারকেলের ছোবড়া থেকে গড়ে উঠেছে তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, কাঁথি, রামনগর প্রভৃতি এলাকায় কয়ার শিল্প। সম্প্রতি কাজুবাদাম ও চীনেবাদাম চাষেও মেদিনীপুর বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

মেদিনীপুরবাসীর জীবনে নদীর প্রভাব অল্প নয়। মেদিনীপুর শহর, তমলুক শহর প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল নদীকে কেন্দ্র করে। একসময় কাঁসাই নদীর নাব্যতা এত ভাল ছিল যে ব্যবসায়ীরা মাল বোঝাই নৌকা নিয়ে এই নদীতে যাতায়াত করত। তমলুকের বাণিজ্যও বহুদিন ধরে চলেছে নদীপথে। প্রাচীনকালে জেলার পরিবহনের মূল ভূমিকা পালন করত এই নদীগুলি।

বর্তমানে হলদী নদীর মোহনাতে গড়ে উঠেছে হলদিয়া বন্দর। তবে জেলার প্রধান নদী মূলতঃ তিনটি। কংসাবতী, রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা। জেলার মানুষের কাছে জলসেচের প্রধান উৎস কংসাবতী নদী। বর্তমানে নদীর খাতটি ক্রমশঃ পলিপূরিত হওয়ায় জলধারনের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। আঁকাবাঁকা গতি পথে ব্যাপক বর্ষায় স্ফীততর হয়ে দু-ধার প্লাবিত করে বয়ে চলে। রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা, নদীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জেলা সীমানা নির্দ্ধারিনের আংশিক কাজ করে। রূপনারায়ণ মেদিনীপুরকে হাওড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। হুগলী নদীর মোহনা তাকে ২৪ পরগনা জেলা থেকে আলাদা করেছে। রূপনারায়ণ কোন স্থানেই জেলার মধ্য দিয়ে প্লাবিত হয় নি, সীমা বরাবর বয়ে গেছে। সুবর্ণরেখা নদী বিহারের ধলভূম থেকে এসে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে মেদিনীপুর জেলায় ঢুকেছে। এই নদী মেদিনীপুরের দুটো থানা নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুরকে মেদিনীপুর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই নদীর যাত্রা শেষ বঙ্গোপসাগরে। এ ছাড়া রয়েছে অনেক ছোট ছোট নদী বা উপনদী যে গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডুলুং, শিলাই, কেলেঘাই, বাগদা প্রভৃতি। এই নদীগুলিকে কেন্দ্র করেই এক সময়ে গড়ে উঠেছিল জনপদ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। কালের প্রভাবে এ সমস্ত কৃষ্টি সংস্কৃতি আজ ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত- নবরূপ প্রাপ্ত।

ষাট সত্তর বছর আগে পর্যন্ত মেদিনীপুরের গ্রামে গঞ্জে মাছের অভাব ছিল না। আজ আর সেদিন নেই। জেলায় মাছ বড় দুর্লভ। তবে আশার কথা, তমলুক ও কাঁথি মহকুমার প্রায় পনের শতাংশ ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে মৎস্য শিল্পের সাথে আজ যুক্ত। সমুদ্রে মাছ ধরে আজ বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করছে। হলদিয়া ও কোলাঘাটের ইলিশের জনপ্রিয়তা আজও কমে নি, যতই বাংলাদেশের ইলিশ আসুক না কেন। সরকারি মৎস্য প্রকল্প চলছে দীঘা ও জুনপুটে। শংকরপুরও আজ মৎস্য শিল্পের একটি বড় কেন্দ্র। তমলুক ও কাঁথি মহকুমার কয়েক জায়গায় চলছে চিংড়ির চাষ। বর্তমানে এই চিংড়ির জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা। তাছাড়া শুকনো মাছও মেদিনীপুর থেকে বিদেশে চালান যায় বহুল পরিমানে। মেদিনীপুর জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মৎস্য শিল্পকে কেন্দ্র করে অধুনাকালে কিছু নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন মাছ সংরক্ষণ, জাল তৈরী ও মেরামত, নৌকা তৈরী ও মেরামত ইত্যাদি।

মেদিনীপুর জেলা শিল্প প্রধান জেলা নয়। তবু বেশ কিছু ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে। কুটির শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সবং ও রামনগর অঞ্চলের মাদুর শিল্প, ঘাটালের পেতল ও কাঁসা শিল্প, শিলদা অঞ্চলের পাথর শিল্প, গোপীবল্লভপুর, আনন্দপুর, রামজীবনপুর, কেশপুর, অমর্ষি ও তমলুকের তাঁতশিল্প; পাঁশকুড়া দাসপুরের শিঙের তৈরী চিরুনী শিল্প প্রভৃতি। ক্ষুদ্রশিল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাজুবাদাম শিল্প, বাঁশ শিল্প, শোলা শিল্প, চামড়া শিল্প, বয়ন শিল্প, নানা ধরনের রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি। এই জেলায় শাল পাতার তৈরী বিভিন্ন ধরনের সুন্দর ও ব্যবহার উপযোগী গ্লাস, বাটি ও প্লেট ক্ষুদ্রশিল্পের মর্যাদা পেয়েছে।

মাঝারি ধরনের শিল্পগুলি গড়ে উঠেছে মূলতঃ খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম ও হলদিয়াকে কেন্দ্র করে। এ সব জায়গায় বিস্কুট কারখানা, কাগজ কল, লোহা কারখানা, হাড়ের কল, চিনির কল প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে মূলত খড়গপুর ও হলদিয়ায় এবং কিছুটা ঝাড়গ্রামে। খড়গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে রেলের যন্ত্রাংশ সহ বিভিন্ন জিনিষ তৈরী হয়। নিমপুরায় হয়েছে কয়েকটি মাঝারি ও বড় কারখানা। এগুলির মধ্যে মেটাল প্রসেসিং, রোলিং মিল, মেটারলজিক্যাল যন্ত্রপাতি নির্মানের কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হলদিয়া শিল্পাঞ্চল হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত খড়্গপুরকে অতিক্রম করে যাবে। এটি কলকাতার কাছাকাছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখানে গড়ে উঠেছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের তৈল শোধনাগার, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার সার কারখানা, পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স্ প্রভৃতি। কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট আজ অনেক ছেলেমেয়ের কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। ঝাড়গ্রামে বড় তিনটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দু টি কাগজের কল; একটি বনজ সম্পদ ভিত্তিক কারখানা।

মেদিনীপুর জেলায় খনিজ সম্পদ নেই বল্লেই চলে। কেবল ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ল্যাটেরাইট, চুনাপাথর, কেওলিন, সোপস্টোন প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রাম মহকুমার পাথর শিল্প অতি প্রাচীন। ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, শিলদা অঞ্চলের কয়েক শ পরিবার এখনো পাথরের জিনিসপত্র তৈরী করে জীবিকা অর্জন করছে। এই শিল্পটির সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে এই পুরানো কুটির শিল্পটি অবলুপ্তের মুখে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পাথর শিল্পীরা বৃদ্ধি করছে কৃষিভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা।

একদা মেদিনীপুরের লবণের খ্যাতি ছিল। লবণ উৎপাদনকারী 'মাঙ্গলী'-রা দেশের লবণের চাহিদা অনেকাংশে মেটাতো। বৃটিশ শোষণের বিরূদ্ধে মেদিনীপুরের মাঙ্গলীদের লবণ আন্দোলন আজ কিংবদন্তী। সম্প্রতি কাঁথি মহকুমায় আবার লবণ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে। মেদিনীপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য যে গ্রাম ও জনপদকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সময়ের আর্বতনে গ্রামই গড়ে দিয়েছে শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতি। যে ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে বর্তমানের মেদিনীপুর, সেটি সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হলেও, এই সীমারেখার মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। সুবর্ণরেখার অববাহিকা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাক্- আর্য সভ্যতার বহু নিদর্শন। ঝাড়গ্রাম ও ময়ূরভঞ্জে পাওয়া গেছে তাম্র প্রস্তর যুগের বেশ কিছু জিনিসপত্র। এ সব অস্ত্রশস্ত্র, কুঠার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায়- এ অঞ্চলে এক সময় প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছিল। এই জেলার বিনপুর থানার অর্ন্তগত কংসাবতী (কাঁসাই) তারাফেনী নদীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি সিজুয়ায় গত ১৯৭৮ সালের জানুয়ারীতে মনুষ্যজীবাশ্মের যে নিদর্শনটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেটি আদি 'হোলেসীন' পর্বের অর্থাৎ আজ থেকে দশ হাজার বছর আগের হতে পারে। এটি ভারতে **আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মানুষের জীবাশ্ম** বলে জিওলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞানীদের অভিমত।[৩]

জেলাটিতে প্রাচীনকাল থেকে অসংখ্য বহিরাগত মানুষ এসেছে। এদের বেশ কিছু অংশ মেদিনীপুরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মহামিলন ঘটেছে এই মেদিনীপুরে। অধুনাকালে খড়্গপুরে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা হল মিশ্র-সংস্কৃতির এক প্রতিচ্ছবি মাত্র। বর্তমানে হলদিয়াতেও একটি মিশ্র সংস্কৃতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তথাপি সনাতন গ্রামীন সংস্কৃতিই আজও মেদিনীপুর বাসীর প্রধান সম্পদ। কে না জানে, এই 'মেদিনীপুরিয়া' সংস্কৃতির অন্তরালে আছে মেদিনীপুরবাসীর স্বভাবসিদ্ধ সরলতা, অতিথিপরায়ণতা, সাধারণ জীবন যাপন, বীরত্ব ও পান্ডিত্য। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই- আধুনিক সভ্যতার দাপটে এই বৈশিষ্ট্য আজ অস্তগামী।

নামকরণ

একদা বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ কেন 'মেদিনীপুর' নামে পরিচিত হল তা নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ মনে করেন, 'মেদিনীপুর' শহরের নামানুযায়ী এ জেলার নামকরণ হয়েছে মেদিনীপুর।[৪] তা হতে পারে। কিন্তু একটি শহরের নাম কবে ও কেন মেদিনীপুর হল সে সম্বন্ধে মন্তব্যকার নীরব। তাছাড়া মেদিনীপুর জেলাতেই 'মেদিনীপুর' নামে আরও তিনটি গ্রামের নাম আছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে কোন্ মেদিনীপুর থেকে সমগ্র অঞ্চলের নাম মেদিনীপুর হল। আর বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের কয়েকটি গ্রামের নামই বা কেমন করে মেদিনীপুর হল।[৫]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, উড়িষ্যার শাসক প্রানকরের পুত্র, মেদিনীকর নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টিয় তের থেকে পনের শতকের মধ্যে উৎকল দেশ থেকে এসে বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের যে স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন তা তাঁর নামানুসারে 'মেদিনীপুর' হয়। এই মেদিনীকরই নাকি 'মেদিনীকোষ' নামে একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এই যুক্তির স্বপক্ষে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর আবিষ্কৃত রাজা রামচন্দ্র লিখিত প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থের একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন।

"শালি- ধানস্য চোৎপাদ গান্ডিচাদেশে প্রজায়তে
কৃষকানাং ভূরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননম্
প্রানকরাখ্যো নৃপতির্গন্ডিচাদেশস্য শাসক:
মেদিনীকোষকারশ্চ যস্য পুত্রো মহানভুৎ
বিহায় গান্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম স:।৭৫৪"[৬]

অবশ্য এই শ্লোক অনুযায়ী মেদিনীকরের নামে 'মেদিনীপুর' নামকরণ হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। বরং মেদিনীকরের আগেই যে এই বা একটি অঞ্চলের নাম মেদিনীপুর ছিল তার উল্লেখ আছে। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে মেদিনীকোষকার (মেদিনীকর) গান্ডিচাদেশ (ওড়িষ্যা) ছেড়ে মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। তাছাড়া এই মন্তব্যের যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, মূলতঃ অনুমানের উপর নির্ভরশীল, সেকথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই মন্তব্য করে গেছেন এবং

স্থানীয় গবেষকদের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার আহ্বান জানিয়ে গেছেন।

নামকরণ নিয়ে আর একটি অভিমত হল- মেদিনীমাতার মূর্তি থেকে 'মেদিনীপুর' নামকরণ হয়েছে। কর্নেলগোলার জনৈক রুদ্রনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক মেদিনীমাতার মূর্তি পাওয়ার বিষয়টি একেবারে আষাঢ়ে গল্প। কারণ- বর্ণনানুযায়ী সামান্য মাটি খুঁড়ে তিনি একটি বৃহৎ প্রস্তরখন্ড পান এবং ঐ প্রস্তর গাত্রে তিনি একটি দেবী মূর্তি খোদিত থাকতে দেখেন। তারপর তিনি ঐ মূর্তিটিকে মেদিনীমাতার মূর্তি বলে সনাক্ত করে পুরাতত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই জঙ্গলে নিক্ষেপ করে দেন।[৭] সহজেই বোঝা যায়- এই মন্তব্যটি কত হাল্কা ও অনৈতিহাসিক। জঙ্গলে নিক্ষিপ্ত মূর্ত্তিটিই বা কোথায়।

অনুরূপ আর একটি অভিমত হল- তুরস্ক থেকে আগত জনৈক গাজী, মদিনার অনুকরণে হিজলী পরগনার নামকরণ করেছিলেন মদিনাপুর। এবং এই ভাবেই মদিনাপুর থেকে মেদিনীপুর নামকরণ হয়।[৮] এ প্রসঙ্গে তারাপদ সাঁতরা মহাশয় সঠিক মন্তব্য করেছেন যে-"কিংবদন্তীর এ কাহিনী তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়।" এই মন্তব্যে অনেক অসংগতি আছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণের উড়িষ্যা থেকে মেদিনীমল্লরায় এসে শিলদা অঞ্চলের আদি রাজা বিজয় সিংহকে পরাজিত করে এখানকার বিস্তৃত অঞ্চলটি অধিকার করে কাঁসাই তীরবর্তী এই এলাকায় বিখ্যাত 'মেদিনী' বংশের পত্তন করেন এবং এই 'মেদিনী' বংশের নামানুযায়ী মেদিনীপুর নামের উৎপত্তি। মেদিনীমল্লগণ মারাঠা ছিলেন। সময়ানুক্রমে এই বংশের শাসনকাল সম্বন্ধে যা জানা গেছে তা হল-

১। মেদিনী মল্লরায়-				খ্রী:	১৫২৪- ১৫৬৬
২। মঙ্গরাজ	মেদিনী	মল্লরায়	-	"	১৫৬৬- ১৬২৩
৩। গৌরচন্দ্র	"	"	-	"	১৬২৩- ১৬৯১
৪। বলরাম	"	"	-	"	১৬৯১ - ১৭১১
৫। হরিশ্চন্দ্র	"	"	-	"	১৭১১—১৭২৪
৬। মানগোবিন্দ	"	"	-	"	১৭২৪ — ১৭৮৭
৭। রানী কিশোরমনী	"	"	-	"	১৭৮৭- ১৮৪৮
৮। ঐ পোষ্যপুত্র চন্দ্র মহাপাত্র	"	"	-	"	১৮৪৮- ১৮৪৯
৯। রানী সুবর্ণমনী	"	"	-	"	১৮৪৯- ১৮৬১

মেদিনী মল্লরায়ের আমলেই মেদিনীপুরের স্থায়ী নামকরণ হয় বলে অনুমিত হয়।[৯] কিন্তু এই অভিমতটি অন্যকোন দলিল দস্তাবেজ দ্বারা সমর্থিত নয়। তাছাড়া, মন্তব্যকার তাঁর মতের স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ করেন নি। না হলে, অভিমতটিকে হাল্কাভাবে নেওয়া যেত না।

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে (পৃ:১৮৮) উল্লেখ করেছেন যে, "মৌলানা

মুস্তাফা মদনীকে (র:) সম্রাট আওরঙ্গজেব বর্তমান মেদিনীপুর শহরে একটি মসজিদ সম্পর্কিত মহল ও বহু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। এই মৌলানা মদনী সাহেবের নাম হইতে মদনীপুর নাম হয়; পরে তাহার অপভ্রংশ মেদিনীপুর হইয়াছে।'[৯] এই অভিমতটি একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মেদিনীপুরের উল্লেখ ঔরংজেবের অনেক পূর্বে ষোল শতকেই আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লেখ আছে।[১০]

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর নামকরণের পশ্চাতে আদিবাসী সমাজের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে সুহৃদকুমার ভৌমিক মনে করেন যে মেদিনীপুর নামটি মুন্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর অবদান। কিন্তু এই অভিমতের স্বপক্ষে কেউই তেমন জোরালো যুক্তির অবতারনা করেন নি। সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দ বিভাজনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে - 'মেদ' শব্দ থেকেমেদিনীপুর শব্দটি এসেছে। তিনি মনে করেন, একদা 'মেদ' উপজাতির বসতিস্থল ছিল মেদিনীপুর। তাদের নাম থেকেই মেদিনীপুর নামের উৎপত্তি। বক্তব্যটি কষ্টকল্পিত।

মগধ, বঙ্গ ও চেরপাদের উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন চেরপাদ হল দক্ষিণাপথের এক প্রাচীন রাজ্যের নাম। অধুনা হরিমোহন প্রণীত 'চেরো' নামে এক পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে- চেরো এলাকা মগধের লাগোয়া গয়ার দক্ষিণ ভূভাগ থেকে হাজারিবাগ, ডালটনগঞ্জ ও সারগুজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেউ কেউ মনে করেন - এই চেরো ভূভাগে মেদিনীরায় নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি এক বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেনযেটি মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ হিসাবে এঁরা চেরো জাতির ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঝাড়খন্ড ও মেদিনীপুরের বহু অঞ্চলের জনজীবনের মিলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং মেদিনীরায়ের নাম থেকে মেদিনীপুর নামকরণকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন।[১১] কিন্তু এই অভিমতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ- চেরো জাতির জনজীবনের সঙ্গে অনেক মিল ভারতের অন্য জায়গাতে অন্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

প্লিনী (খ্রী: পূ: ১ম শতক) কলিঙ্গ দেশকে যে তিন ভাগে ভাগ করেন তার মধ্যভাগের নাম ছিল মধ্যকলিঙ্গ। পুরাতত্ত্ববিদ মনোমোহন গাঙ্গুলী এই 'মধ্যকলিঙ্গ' দেশকে মেদিনীপুরের ভূভাগ বলে সনাক্ত করেছেন তাঁর 'উড়িষ্যা অ্যান্ড হার রিমেন্স-এ্যানসেন্ট অ্যান্ড মিডিভাল গ্রন্থে।' প্রাচীন মধ্য কলিঙ্গ যে বর্তমানের মেদিনীপুর তা প্রায় স্বীকৃত। এই মধ্য কলিঙ্গের এক সময় নাম ছিল মিধুনপুর। অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা তথা কলিঙ্গনগরের অধিপতি হন। অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে- তাঁর রাজ্যের পূর্বদিকে ছিল সমুদ্র, পশ্চিমদিকে পর্বতমালা, দক্ষিণে গোদাবরী নদী ও উত্তর প্রান্তে মিধুনপুর।[১২] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও মনে করেন, " দ্বাদশ শতকের উড়িষ্যার চোড়গঙ্গ রাজাদের আধিপত্য মিধুনপুর (নিঃসন্দেহে বর্তমান মেদিনীপুর) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, এবং অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দার- রাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার দুর্গনগর আরম্য ধ্বংস করিয়াছিলেন।"[১৩]

মিধুনপুর নামটি কালের আবর্তে আবর্তিত হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে আইন-ই-আকবরীতে 'মিদনাপুর' এবং সপ্তদশ শতকে (১৬৫৯-১৬৬০) গোপীজনবল্লভ দাসের 'রসিক মঙ্গল' কাব্যে 'মেদিনীপুর' নামে উল্লিখিত হয়েছে।[১৪] পরে সাহেবদের লেখায় বা অংকিত মানচিত্রে মেদিনীপুরকে বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে।যেমন, গ্যারেট 'আইন-ই-আকবরী' -কে ইংরাজীতে অনুবাদ করার সময় মেদিনীপুরকে লিখেছেন 'Midnapur', ১৬৬০ সালের ডেন ব্রুকের মানচিত্রে 'Midnapoer', ১৭৫২ সালে অংকিত দ্য আঁভিলের মানচিত্রে 'Medinapour', ১৭৬৭-'৭৪ সালে অংকিত রেনেলের মানচিত্রে 'Midnapour,' অষ্টাদশ শতাব্দীর সরকারী দলিল-দস্তাবেজে বিভিন্ন বানানে ইংরেজরা মেদিনীপুরকে সূচিতকরেছে। বানানের বা উচ্চারনের সামান্য তফাৎ মানেই তো আর নতুন দেশ নয়। 'Midnapoer ' এবং 'Medinapour' - এই শব্দদুটি নিশ্চয় আলাদা স্থানকে সূচিত করে না। কালের প্রভাবে ব্যক্তির অথবা স্থাননামের পরিবর্তনের অসংখ্য নজীর আছে। কোথাও কোথাও ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। যেমন- 'দন্ডভূক্তি' থেকে দাঁতন, মাদ্রাজ থেকে চেন্নাই প্রভৃতি। তাই কয়েক শতাব্দীর আবর্তনে 'মিধুনপুর' স্থাননামটি 'মেদিনীপুর' স্থাননামে রূপান্তরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই মনে হয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতটিই যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। অন্য মতগুলি অনেকটা কষ্ট কল্পিত ও অবাস্তব।

দুই

সাগর-বাণিজ্যে সেকালের মেদিনীপুর

ভারতের সঙ্গে বর্হিভারতীয় দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেকদিনের। হেরোডোটাস, টেসিয়াস, ডায়োডোরাস প্রভৃতির উক্তিতে ভারতের কথা আছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ। স্মৃতিপুরাণাদি, বৌদ্ধগ্রন্থ প্রভৃতিতেও ভারতীয় বণিকদের সমুদ্রপথে বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায়। পশ্চিমভারত, দক্ষিণভারত কিংবা দক্ষিণপূর্ব ভারতের কোন অঞ্চলই সমুদ্রবাণিজ্যে অপটু ছিল না। সে সময় পূর্ব ভারতের উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত। তখন মেদিনীপুর নামের অস্তিত্ব ছিল না। কালক্রমে তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি মেদিনীপুরের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এই তাম্রলিপ্তকে প্রাচীনকালে অনেক নামে পাওয়া যায়। যেমন দামলিপ্ত, তমালিনী, তমালিকা, বিষ্ণুগৃহ প্রভৃতি। তাম্রলিপ্তের অবস্থান নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও তা আলোচ্য প্রবন্ধের বাইরের জিনিস। শুধু এটুকু বলা যায় তাম্রলিপ্ত (যার বর্তমান নাম তমলুক মনে করা হয়) রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত একটি শহর। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলীর সূত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাম্রলিপ্ত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল বলে জানা যায়। ঐতিহাসিক যুগে এটি যে পূর্বভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল তা দীপবংশ, মহাবংশ, প্লীনী ও টলেমীর বিবরণ, পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সী'র অজ্ঞাতনামা গ্রীকলেখক, চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং-এর বিবরণ, কথাসরিৎসাগর, দশকুমার চরিৎ ইত্যাদি থেকে জানা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে তাম্রলিপ্ত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে প্রাচীনযুগে নিজ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।[১]

বহু প্রাচীনকাল থেকে তাম্রলিপ্ত সন্নিকটস্থ সাঁওতালপরগণা, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চল তাম্র আকরের (Chalcopyrites) জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল। ঘাটশিলার রাখা তাম্রখনিতে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক থেকে তাম্র উৎখনন করা হত।[২] অনুমিত হয় এ সমস্ত অঞ্চল থেকে তাম্র বা তাম্র আকর তাম্রলিপ্তে আসত এবং সেখান থেকে জাহাজে বিদেশে রপ্তানী হ'ত। কেউ কেউ মনে করেন তাম্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় অঞ্চলটির নাম হয়ত তাম্রলিপ্ত হয়েছে। তাম্রলিপ্তের বর্হিবাণিজ্য খ্যাতি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। তখন এই বন্দর অবস্থিত ছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। বুঝতে অসুবিধা হয় না খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে হঠাৎ করে এই বন্দর গড়ে ওঠে নি। একটি অঞ্চল বন্দরে রূপান্তরিত

হতে অন্ততঃ কয়েকদশক সময় তো নেবেই। সে কারণে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতককে তাম্রলিপ্তের সূচনাকাল ধরা অসঙ্গত হবে। বিদেশী বণিকদের আসার ফলে এই বন্দরটি গড়ে উঠেছিল না ভারতের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। অনুমান করা যেতে পারে বাণিজ্য সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্বভারতের পণ্যরপ্তানীর চাহিদা পূরণ করার জন্য রূপনারায়ণের বুকে এই বন্দর গড়ে উঠে। বিদেশীরা এসে এই বন্দর গড়েনি। তাম্রলিপ্তকে কেন্দ্র করে সমুদ্রের বুক বেয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এমন কি ইওরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হয়। এই লেনদেন কখনো প্রত্যক্ষ কখনো অপ্রত্যক্ষ।

তাম্রলিপ্ত ছিল ভারতবর্ষের পূর্বদ্বার স্বরূপ। প্রাবন্ধিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "তাম্রলিপ্ত বা তমলুক ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব হইতে একটা শ্রেষ্ঠ সাগরতীর্থ বা বন্দর বলিয়া প্রাচ্যদেশের সর্বত্রই পরিচিত ছিল। চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ হইতে সাগর পথে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে সাগর তমোলুকেই সকল জাহাজ ভিড়াইতে হইত। ভারতবর্ষ হইতে সাগরপথে প্রাচ্য দেশে যাইতে হইলে এই তাম্রলিপ্তের বন্দরে অর্ণবপোত আরোহণ করিতে হইত। বালী, লম্বক, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপসকল এবং ব্রহ্ম, শ্যাম, কোচিন, এনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি প্রদেশসকল পর্যটন করিলে এবং ঐ সকল স্থানের হিন্দু ও বৌদ্ধ ভগ্নস্তূপ পর্যবেক্ষণ করিলে এখনও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিককালে ভারতবর্ষ হইতে এই সকল দেশে ভারতবাসীর যাতায়াত ঘনঘন হইত .... তাম্রলিপ্ত এই যোগাযোগের দ্বারস্বরূপ ছিল।"[৩]

তাম্রলিপ্তের সঙ্গে সিংহলের যে বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য যোগাযোগ ছিল তা জানা যায় প্রাচীন সিংহলীপালী গ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ এবং সমুদ্দ-বণিজ-জাতক, শঙ্খজাতক, মহাজনকজাতক ইত্যাদি গল্পে। খুব সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ পঞ্চম শতক থেকে উভয়দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[৪] এইসঙ্গে সিংহলীপালী গ্রন্থে উল্লিখিত সিংহবাহু ও তাঁর ছেলে বিজয়সিংহের লংকাবিজয় কাহিনীও স্মরণ করা যায়। ফা-হিয়েনের সময়ে (৩৯৯-৪১১খ্রীঃ) তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ফা-হিয়েন নিজে একটি বাণিজ্য জাহাজে করে তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহল গিয়েছিলেন। মহাবংশ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে প্রিয়দর্শী ভারত- সম্রাট অশোক সিংহলরাজের কাছে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে বোধিদ্রুমের একটি শাখাসহ তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহলে পাঠিয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে মহারাজ অশোক স্বয়ং তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হয়ে তাঁদের অভিবাদন জানিয়েছিলেন। এবং এই যাত্রার স্মারক হিসেবে এখানে দশ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ এই স্তম্ভটি দেখেছিলেন। ইৎ-সিং-এর সময়ও (৬৭৩খ্রীঃ) অসংখ্য বৌদ্ধ শ্রমণ সিংহল ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে যাতায়াত করতেন। ধর্মীয় কারণে কেবল এই যাত্রা বিনিময় নিশ্চয় হ'ত না। বাণিজ্যিক কারণ অবশ্যই ছিল। সিংহল ও তাম্রলিপ্ত পারস্পরিক বাণিজ্যিক পণ্য বিনিময় করে পরস্পর উপকৃত হ'তো।

ভারতের বাইরে থেকে প্রাচীনকালে তমলুক বন্দরে বিভিন্ন দেশের লোক ব্যবসা করতে আসতো। আসতো মালয়, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি থেকে। বাণিজ্যিক

প্রয়োজনে নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে তমলুকে বসবাস করতে হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে রচিত পন্ডিত সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" দেবস্মিতা ও গুহসেন শীর্ষক কাহিনীতে তাম্রলিপ্তের ব্যবসায়ীদের সূদুর মালয়ে গিয়ে ব্যবসা করার কথা জানা যায় এবং ঐ ব্যবসা চলতো মালয় ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে।[৫] সে সময় সমুদ্রতীরবর্তী তাম্রলিপ্ত শহরের ঘরবাড়ীগুলি মূলতঃ কাঠের তৈরী ছিল।[৬] তার কারণও সম্ভবতঃ ছিল তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি জঙ্গলমহলের বিশাল বনাঞ্চল এর সহায়ক হয়েছিল। তবে সমুদ্র নিকটস্থ পলিমাটির দেশ তাম্রলিপ্তে পোড়া ইঁটের ব্যবহার যে একেবারে হ'ত না তা নিশ্চয়ই নয়। এমন হতে পারে ইষ্টক-নির্মিত গৃহ কাষ্ঠ - নির্মিত গৃহ অপেক্ষা অধিক ব্যয়বহুল ছিল। কিংবা সমুদ্রের নোনাজলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হ'তো। সিংহল ছাড়া তাম্রলিপ্তের সমুদ্রপথে যোগাযোগ ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সূবর্ণভূমি (বার্মা বা মায়ানমারের দক্ষিণাংশ), তৌ-খুলি বা তপোলা (মালয়েশিয়া উপদ্বীপের পশ্চিমতীরের একটি বন্দর) কোইং (মালয়েশিয়া বা সুমাত্রায় অবস্থিত) এবং এমন কি বোধ হয় ফু-নানা দেশের (কম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম) অন্তর্গত ও-কি ও এলাকার কোন বন্দরের সঙ্গে।[৭] তাম্রলিপ্তের সঙ্গে চীনেরও যোগাযোগ ছিল, হয়ত অপ্রত্যক্ষভাবে। তবে "সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ই-চিং জলপথে চীন থেকে যাত্রা শুরু করে সুমাত্রার দুটি বন্দর, কেডা (মালয়েশিয়া) এবং খুব সম্ভবতঃ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছুঁয়ে তাম্রলিপ্ততে পৌঁছেছিলেন।"[৮] ঠিক এসময় বাংলার যে দুটি নগরী বাণিজ্যিক কারণে বিশেষ খ্যাত হয়েছিল তার একটি সুবর্ণগ্রাম, অন্যটি তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত থেকে বঙ্গীয় নাবিকদের অর্ণবতরীগুলি ভারত সাগরের প্লাবমান দ্বীপপুঞ্জে এবং চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করতো।[৯] জাপানের সাথেও তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাম্রলিপ্তে বর্তমানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ বিশেষতঃ বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির মূর্ত্তি একথারই ইঙ্গিত দান করে যে প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও রোমের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের ছিল ঘনিষ্ট বাণিজ্যিক সম্পর্ক। বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির মূর্ত্তির সঙ্গে দুটি মাটির কলসীও পাওয়া গেছে। এগুলি পত্র, তারকা ও মাছ অঙ্কিত। প্রত্নতাত্ত্বিক টি. এন. রামচন্দ্রনের মতে কলসীদুটির আকার ও কারুকার্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় মিনওয়ান, মাইসেনীয় ও ইজিপ্সীয় রীতিতে নির্মিত একই প্রকার মৃৎপাত্র সমূহের। তাছাড়া এখানে পাওয়া গেছে হাড়ের তৈরী 'হারপুন' বা কাঁটাযুক্ত সূক্ষাগ্র ফলা—মিশরের নীল নদের উপত্যকার স্থানে স্থানে যারকিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ সমস্ত কারণে অনুমিত হয় যে প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল মিশর প্রভৃতি দেশের।[১০] সূদুর ভূমধ্যসাগর বাঙ্গালী বণিকদের কাছে অজানা ও অজ্ঞাত ছিল না। পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সী, প্লিনী ও টলেমীর বিবরণ থেকে জানা যায় তাম্রলিপ্তের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ছিল গ্রীক ও রোমান জগতের। পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির সঙ্গে তাম্রলিপ্তের আদৌ সম্পর্ক ছিল কিনা এবং থাকলেও তা কি ধরণের ছিল তা নিয়ে আজও অনুসন্ধান চলছে। টলেমী "তামালিতেস" বা তাম্রলিপ্তি উল্লেখ করলেও একে "এম্পোরিয়ান"

অর্থাৎ ভারত-রোমক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বলে নির্দিষ্ট করেননি।[১১] তাম্রলিপ্তির সাথে রোমান বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক ছিল বলে আপাততঃ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন না।[১২] প্লিনী একবার লিখেছিলেন," (বাণিজ্যিক) লাভের বাসনা ভারতকে আমাদের (অর্থাৎ রোমক সাম্রাজ্যের) কাছাকাছি নিয়ে এসেছে"[১৩]। একদল ঐতিহাসিকের মত খ্রীষ্টপূর্ব সময় কালে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের মত বঙ্গে গ্রীক রোমান জগতের বণিক কূলের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য হ'ত না। তবে কালেভদ্রে তাদের নৌযান তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বন্দরে ভিড়তে পারে। কিন্তু তাম্রলিপ্তিতে সদ্যপ্রাপ্ত নিদর্শন সমূহ একটু ভিন্ন কথার ইঙ্গিত দেয়। যেমন নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত অসংখ্য প্রত্নবস্তু যথা- পোড়ামাটির তৈরী নারী-মূর্ত্তির অবস্থান ভঙ্গীতে হেলেনীয় প্রভাব (হরিনারায়ণপুর, রোমক শিল্পশৈলী "রুলটেড" মৃৎপাত্র (তাম্রলিপ্ত, হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড়, আটঘরা, যক্ষিনীর মূর্ত্তির পরিধানে হেলেনীয় ধরনের ঘাগরা (বেড়াচাঁপা, তাম্রলিপ্ত) দগ্ধ মৃত্তিকার 'শীলে' গ্রীকলিপি (তিলদা), দগ্ধ মৃত্তিকার ফলকে দুজন শৃংখলিত এবং সংঘর্ষে লিপ্ত মনুষ্য দেহ (তাম্রলিপ্ত), রোম অনুকরণে নির্মিত দগ্ধ মৃত্তিকার নালিমুখ প্রভৃতি নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টপূর্ব কালে বাঙ্গলার সঙ্গে পশ্চিমী জগতের যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয়[১৪]। দন্ডীর 'দশকুমার চরিতের' মিত্রগুপ্ত উপাখ্যানে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) বন্দরের কাছে এক যবন জাহাজের উল্লেখ প্রসঙ্গে সেই জাহাজের নাবিকের নাম বলা হয়েছে 'রামেযু', যা গ্রীক 'রামাসিস'-এর নামান্তর মাত্র। এ থেকে গ্রীসদেশের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৫] এবং এই যোগাযোগ তখনকার দিনে বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কিত ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি বেশ কয়েক বছর স্থায়িত্ব পেয়েছিল। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে তাম্রলিপ্তের যে সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্ট জন্মের সাতশ বছর পরেও মোটামুটি একই সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ৪১১ খ্রী. ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তের যে সমৃদ্ধি দেখেছিলেন তার প্রায় দুশ বছর পরে হিউয়েন সাঙ সেই একই সমৃদ্ধি দর্শন করেছিলেন। মৌর্য যুগেতেও তাম্রলিপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বহির্ভারতীয় বহু দেশেরই সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিল। ডঃ এ.এল.বাসাম লিখেছেন," By the Mouryan times, with the last ward expansion of Aryan culture, Tamralipta became the main Sea-port of the Ganges basis, and Champa lost its importance from Tamralipta ships not only sailed to Ceylon, but from before the beginning of the Christian era, to the South East Asia and Indonesia."[১৬] হাজারিবাগ জেলার দুধপানি প্রস্তর লিপি, ইৎ-সিং-এর বিবরণ ইত্যাদি থেকে অনুমিত হয় গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১৭]

পূর্ব ভারতে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত নদী কেবল রূপনারায়ণ নয়। অথচ তাম্রলিপ্তে আগে বন্দর গড়ে ডঠল অর্থাৎ বন্দর নগর হিসেবে গড়ে ওঠার প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তই

তখন তাম্রলিপ্তকেই পূরণ করতে হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল তাম্রলিপ্ত ও তৎসন্নিহিত এলাকার আইন শৃংখলার পরিবেশ। এর অভাব ঘটলে এখানে বিত্তশালী বণিকেরা বাস করতে পারত না বা দেশ বিদেশের বণিকেরা মূল্যবান দ্রব্য বিনিময় সারতে পারত না। অঞ্চলটির শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে মূলতঃ মৌর্য ও গুপ্ত শাসক, সেইসঙ্গে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক সহ কয়েকজন আঞ্চলিক অধিপতি। তাছাড়া জলপথে ও স্থলপথে তাম্রলিপ্তের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের যোগ থাকার ফলে বন্দর হিসাবে তার পটভূমি ছিল ব্যাপক। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই তাম্রলিপ্ত এক উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বন্দর; প্রাচ্য ভারতের বহির্বাণিজ্যের উৎস মুখ। নগর ও বন্দর রূপে তার সমৃদ্ধির কারণ সে সমুদ্রপথ ছাড়াও ভাগীরথীর জলপথ এবং আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্দেশীয় স্থলপথের আকর্ষণীয় বাণিজ্যকেন্দ্র।

তাম্রলিপ্ত থেকে ভারতের সাগর-বাণিজ্য চলত বড়বড় নৌকোর সাহায্যে বা জাহাজের মাধ্যমে। আধুনিক জাহাজের সঙ্গে এসব জাহাজের বিস্তর ফারাক। এগুলি আধুনিক কালের মত লৌহ নির্মিত বা যন্ত্রচালিত ছিল না। এ জাহাজগুলি ছিল কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো। বিশেষ ধরণের ও বিশেষ প্রক্রিয়ার তৈরী কাঠের তক্তাগুলিকে পরপর রেখে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। যে ধরণের জাহাজে তাম্রলিপ্ত সহ বিভিন্ন ভারতীয় বন্দর থেকে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার দিকে মালপত্র নিয়ে যাওয়া হত তার একটা আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় শতাব্দীর এক চীনা বই-এ। এতে লেখা হয়েছে যে, "বিদেশে (এ ক্ষেত্রে ভারত?) জলযানকে বলা হয় 'পো' (পোত)"। পরিবেশিত তথ্য থেকে মনে হয়যে জাহাজগুলি ছিল দুশ ফুট লম্বা এবং এগুলি জলের উপরে উঠে থাকত কুড়ি থেকে ত্রিশ ফুট।এতে ছ'শ থেকে সাতশ লোকের এবং দশ হাজার হো (চীনে প্রচলিত এক ধরণের মাপ) থেকে বেশী পরিমাণের মালের স্থান হ'ত। এই জলযানগুলি চার পালের। জোর বাতাস বা উত্তাল ঢেউ- এর বাধা এগুলি অবলীলায় অতিক্রম করতে পারত।[১৮] বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহের সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭, মতান্তরে ৫৪৩) বঙ্গদেশে জাহাজ নির্মাণ হ'ত। গঙ্গাপুত্র বংশীয় রাজাগণ যখন তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করতেন তখন সেখানে জাহাজ নির্মাণ হয় বলে প্রমান পাওয়া যায়।[১৯] ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকেও জানা যায় তাম্রলিপ্ত বন্দরে ব্যবহৃত অর্ণবপোত গুলি আকারে ছিল সুবিশাল এবং বহন করতে পারত যথেষ্ট পণ্যদ্রব্য ও দু'শতের অধিক আরোহী। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কেডা অঞ্চলের রাজকীয় জাহাজ এবং কখনও কখনও পারসিক জাহাজও তাম্রলিপ্তিতে আসা যাওয়া করত। লাভের আশায় বণিকরা সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমাত ঠিকই তবে তাদের সমুদ্র যাত্রা সবসময় সুখকর হতনা। জাহাজডুবি ও সামুদ্রিক ঝড়ে কষ্ট পাওয়ার অনেক কাহিনী শোনা যায়। একটি মাটির তাবিজের ওপরে লেখা খরোষ্ঠী -ব্রাহ্মী লেখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে "সমুদ্রে (বিপদে) দ্বিজের স্মরণ নেবে।[২০]"

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তির বিশ্বজোড়া নামের পিছনে রয়েছে স্থানীয় বণিকদের অশেষ অবদান। কারণ তাম্রলিপ্ত বন্দর বিদেশী বণিকদের দ্বারা সৃষ্ট নয়। স্থানীয় বণিকরাই তাদের ব্যবসার

শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনে তাম্রলিপ্তকে আন্তর্জাতিক বন্দরে রূপান্তরিত করেছিল। আর এই আন্তর্জাতিক বন্দরকে সমৃদ্ধতর করেছিল বহির্ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বণিকরা।

অর্ন্তদেশীয় ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র ছাড়াও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র রূপেও তাম্রলিপ্তের খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছিল সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে। তাম্রলিপ্ত থেকে সাগর-বাণিজ্যের তিনটি পথের কথা জানা যায়।[২১] বলাবাহুল্য এগুলো ছিল জাহাজ যাতায়াতের পথ। প্রথম পথটি হল তাম্রলিপ্ত থেকে সমুদ্র পথে উড়িষ্যা দেশের পার্লোরা (Parloura) বন্দর। সেখান থেকে সোজা পথে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপগুলি এবং সুদূর প্রাচ্য। দ্বিতীয় পথটি হ'ল দক্ষিণ পশ্চিম উপস্থল ধরে কলিঙ্গ ও করোমন্ডল হয়ে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে পৌঁছানোর পথ। তারপর সেখান থেকে উত্তর দিকে পশ্চিম উপকূল ধরে সিন্দুর মুখ পর্যন্ত বা আরবসাগর অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতের কোনও বন্দর থেকে আরবদেশীয় বন্দর ও পূর্ব আফ্রিকা। তৃতীয় পথটি হ'ল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরাকান উপকূল ধরে ব্রহ্ম ও মালয় উপদ্বীপে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীন পর্যন্ত। প্রাচীন-কালে সুবর্ণভূমি যাওয়ার এটি ছিল স্বীকৃত পথ।

তাম্রলিপ্তির সমুদ্র বাণিজ্যের পণ্যসম্ভারও ছিল বিচিত্র ধরণের। এই সব পণ্যসম্ভারের কিছু পাওয়া যেত স্থানীয় বা নিকটবর্তী এলাকায়। আবার কিছু আসতো উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে। নদীপথে অথবা স্থলপথে। তমলুকে তখন ব্যাপকভাবে পাওয়া যেত হাতির দাঁতের নানান জিনিসপত্র, পোড়ামাটির ভাঁড়, নানাবিধ খেলনা, ঘোড়া বা মানুষের অনেক মূর্ত্তি। এ সমস্ত জিনিসগুলি আঞ্চলিক উৎপাদন বলে মনে হয়। যদিও তমলুকের মাটির তলা থেকে কিছু পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে তবু এ অঞ্চলে পাথরের চাইতে পোড়ামাটির উপর কাজ হ'ত বেশী। তার প্রধান কারণ, নদীমাতৃক দেশের শিল্পীরা মাটিকে পুড়িয়ে পাথরের মত শক্ত করে নিয়েছিল যেহেতু পাথর ঐ অঞ্চলে ছিল দুষ্প্রাপ্য।[২২] তবে তখন পাথর যথেষ্ট পাওয়া যেত ঝাড়গ্রাম, শিলদা, বেলপাহাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে। শিলদা-বেলপাহাড়ী এলাকার পাথর-শিল্প যথেষ্ট প্রাচীন বলে অনুমিত হয়। আর তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের পাথরের তৈরী মূর্ত্তিটি যে শিলদা-বেলপাহাড়ী অঞ্চলের শিল্পীদের নয় তা কে বলতে পারে। তাছাড়া তাম্রলিপ্ত থেকে গভীর অরণ্য বেশীদূরে ছিল না। জঙ্গল মহালের বনজ সম্পদ তাম্রলিপ্তির ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল।

রাজশেখর তাঁর কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে পূর্বদেশে ষোলটি জনপদের উল্লেখ করেছেন। যথা-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কোশল, তোশল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর (মুদ্ধগিরি = মুঙ্গের), বিদেহ, নেপাল, পুন্ড্র, প্রাগ-জ্যোতিষ, মলদ, মল্লবতক, সুক্ষ, ব্রহ্মোত্তর ও তাম্রলিপ্তক (তমলুক)। এই ষোলটি জনপদের উৎপন্নদ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়েছেন। যথা-লবলী, গ্রন্থিলনক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে এটি একটি গন্ধদ্রব্য ও আয়ুর্বেদীয় উপকরণের ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র। তাছাড়া 'দ্রাক্ষা' শব্দটি লাক্ষা হবে। কারণ, তখন

পূর্ব ভারতের অনেক জায়গায় লাক্ষা জন্মাতো। কথাসরিৎসাগর থেকে জানা যায় তাম্রলিপ্ত তখন ছিল বিত্তশালী বণিকদের কেন্দ্র। এখানকার বনিকরা সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ আয় করতো। তাই তারা উত্তাল সমুদ্রকে তুষ্ট করার জন্য মাঝে মাঝে মনি রত্ন সহ মূল্যবান দ্রব্যাদি সাগরের জলে অর্পণ করতো।[২৩] তবে বাণিজ্য মারফৎ তাম্রলিপ্তে যে প্রচুর অর্থাগম হতো তার অধিকাংশ বণিকদের হাতে কেন্দ্রীকৃত হতো। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় বণিকরা বাণিজ্য পসরার বদলে তখন মুদ্রা নিয়ে ফিরত। এগুলি ছিল সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় বাণিজ্যও চলত। তবে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে জনসাধারণ কড়িই ব্যবহার করত। তাম্রলিপ্তের বাজারে কেনাবেচা চলতো মুদ্রা, কড়ি বা পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কেনা বেচার সুবিধা হতো।

ঠিক কখন থেকে এই বন্দর মারফৎ আমদানী-রপ্তানী শুরু হয় তা নির্ণয় করা আপাততঃ অসম্ভব। তবে মহাবংশের সাক্ষ্য অনুযায়ী মৌর্য রাজা অশোকের(২৭৩-২৩৬ খ্রীঃপূঃ) আমলেই সিংহলের সাথে তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। "তাম্রলিপ্ত"(তামার দ্বারা লিপ্ত) নামটি যেন সংশ্লিষ্ট বন্দরে (সিংভূম অঞ্চল থেকে) স্থলপথে তামার আমদানী এবং ঐ স্থান থেকে জলপথে রপ্তানীর ইঙ্গিত করে। মৌর্যযুগের মহাস্থান লেখতে উল্লেখিত 'কাকিনী' যদি কপর্দক বা কড়ি হয়, তাহলে বোধহয় ঐ কড়ি আমদানী হতো এর এক প্রধান প্রাপ্তিস্থল মালদ্বীপ থেকে এবং তাম্রলিপ্ত মারফৎ।[২৪] বঙ্গ=গঙ্গা দেশ থেকে নানারূপ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর বর্ণনা বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় চি এন-হান শু, পেরিপ্লাস টেস ইরিথ্রাস প্রভৃতি গ্রন্থে এবং কিছু খরোষ্ঠী ও খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মীলেখতে। সবচেয়ে দূরের যে বাণিজ্যিক সামগ্রী বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ তাম্রলিপ্ত থেকে আমদানী ও রপ্তানী করা হোত তা ছিল মধ্য-এশিয়ার ঘোড়া। তাম্রলিপ্তি থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে জাহাজভর্ত্তি ঘোড়া খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হোত। রপ্তানী তালিকায় আরও ছিল ঘষা কাঁচ, খুব উঁচুদরের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, চাল ইত্যাদি এবং সোনা, রূপা, পট্টবস্ত্র, কড়ি প্রভৃতি আমদানী করা হোত। আমদানী করে রপ্তানী করা হোত হিমালয় অঞ্চলে জাত তেজপাতা ও কয়েক প্রকার গুল্ম পিষে তৈরী সুগন্ধ তেল এবং (খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণ সমুদ্রে জাত) মুক্তা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য বিনিময়ের পর বাড়তি দেয় অর্থ বোধ হয় সোনা বা রূপায় (তার চলতি বাজার অনুসারে) দেওয়া হোত। স্থানীয় বাণিজ্যে এছাড়াও চালু ছিল একপ্রকার তামার মুদ্রা ও কড়ি।[২৫] প্রাচীন তাম্রলিপ্ত মধু রপ্তানীতে একসময় বিশেষ খ্যাত হয়েছিল আর এই খ্যাতির পিছনে ছিল মেদিনীপুর জেলার লোয়াদা অঞ্চলের মোদক জাতির অবদান। কারণ লোয়াদায় তখন তৈরী হোত চিনি বা গুড় থেকে মিশ্রী। প্রাচীন পদ্ধতিতে সুতো দিয়ে যে কলসীতে মিশ্রী তৈরী হোত তাতে থাকতো ফুটো-তা দিয়ে দানা না বাঁধা চিনির রস চুইয়ে চুইয়ে পড়তো। তা খুব গাঢ় মোরব্বার রসের মত রং, দীর্ঘস্থায়ী ও সুস্বাদু। এর নাম 'চলকান।' বিদেশে এই মিশ্রী ও চিনির রস মধু নামে চালান দিয়ে লোয়াদার মোদকরা একসময় যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন।[২৬] প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত

'সুবর্ণভূমি' মোটামুটিভাবে দক্ষিণ ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জকে বোঝায়। এই অঞ্চলটি ছিল ভারত ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরামস্থান। কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন, অগুরু সুবর্ণভূমি থেকে বঙ্গদেশে আমদানী করা হোত। রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে যে ঋষভ পর্বত থেকে চন্দন কাঠ এদেশে আমদানী করা হোত। এর অবস্থান পূর্ব-ইন্দোনেশিয়ার তিমোর (Timor) বা সেলিবিস (Celebes)-এ। উক্ত চন্দনকাঠ পশ্চিমে রপ্তানীর জন্য ভারতীয়রা সংগ্রহ করতো।[১৭] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সে সময় ধুনো এবং তিল, সরিষা প্রভৃতি তেলের বিশেষ চাহিদা ছিল। ওখানকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে এগুলি বিশেষ মর্যাদা সহকারে ব্যবহার করা হোত। তাই এদেশের বণিকেরা তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমেই সে সময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঐ সব বস্তু প্রেরণ করত।[১৮]

ময়ূরের প্রথম আবির্ভাব ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ থেকে ময়ূর বিদেশে রপ্তানী হোত। ময়ূর ভারতীয়দের নিজস্ব পাখী ছিল বলে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাই তারা তাদের পোতগুলিকে অনেক সময় ময়ূরাকৃতি করত।[১৯] এই ময়ূরাকৃতিবিশিষ্ট অর্ণবপোতে ভারতীয় বণিকরা চীন দেশ থেকে রেশম, কর্পূর, ইস্পাত, সিঁদুর প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানী করতো বলে সংস্কৃত সাহিত্যে ও চীন দেশের পুরাবৃত্তিতে উল্লেখিত হয়েছে। ভারতীয় বণিকেরা মিশরে গজদন্তের ব্যবসা চালাতো। তাম্রলিপ্ত থেকে জঙ্গল মহলের হাতীর দাঁত জাহাজে চড়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাত। আফ্রিকার অরণ্যে হাতী থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত বন্য। তাকে পোষ মানানো আফ্রিকা বাসীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাছাড়া প্রাচীন মিশরে হাতীর ব্যবহার কেউ জানতো না। অন্ততঃ এ বিষয়ে কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। তাই পাশ্চাত্য দেশে গজদন্তের প্রবর্তন ভারতবর্ষ থেকেই হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে যে সমস্ত জিনিস বিদেশে চালান যেত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল সেগুনকাঠ, চাল, নানাবিধ মশলা, সোনা, রূপা, মূল্যবান রেশমী বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, সুগন্ধ দ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা প্রভৃতি। পৃথিবীর অনেক দেশে তখন অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময় যে সকল সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহৃত হতো তার অনেকটাই ভারতবর্ষজাত এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে প্রেরিত হোত।

তাম্রলিপ্তর গৌরব রবি কতদিন মধ্য গগনে বিরাজিত ছিল তা নিয়ে নানা মত আছে। সোয়াং-সাঙ-এর ভ্রমণকালে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে) তাম্রলিপ্তির সমুদ্র বাণিজ্যের অবস্থা ভালো ছিল। যদিও তখন দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার জন্য ঘোড়া রপ্তানী ব্যবসা উঠে গিয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর দুধপানির লেখ অনুযায়ী অষ্টম শতাব্দীতেও তাম্রলিপ্তের সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্ব একেবারে কমে যায় নি। কিন্তু এরপরে প্রাচীন কালের আর কোন তথ্যসূত্রে তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী মন্তব্য করেছেন, ''অষ্টম শতকের পরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় তথ্যসূত্রে তাম্রলিপ্তির বর্ণনা আরও পূর্বের গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃত এবং সেই কারণে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্তিমকাল নির্ধারনের ক্ষেত্রে মূল্যহীন।[২০] মোট কথা অষ্টম শতাব্দীর পরে প্রাচীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের

অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাম্রলিপ্তের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য স্থান নেই।

এর মূল কারণ হোল গঙ্গার যে শাখার ওপর তাম্রলিপ্তের অবস্থিতি ছিল তার খাত শুকিয়ে যাওয়ার ফলে হয়তো বিরাট পশ্চাদভূমি থেকে নদীপথে মাল আনা বা পাঠানোর অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহারযোগ্য সামুদ্রিক পথে অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তীকালে সমন্দর (চট্টগ্রাম) বন্দরের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছিল। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে পূর্ব ভারতের যে সব পণ্যের বিশেষ কদর ছিল তার সব ক'টি এখানে পাওয়া যেত। এই কারণটি বন্দর হিসাবে তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব হারানোর অন্যতম কারণ।[২১] অথবা যে নদীর তীরে তাম্রলিপ্তের অবস্থান ছিল পলি পড়ে সেই নদীর মুখ হয়তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অথবা নদীটি খাত পরিবর্তন করেছিল। নবম শতাব্দী থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। সে কারণে বৃহৎ বাণিজ্যপোতগুলি তাম্রলিপ্তের অগভীর পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করতে পারল না। পশ্চিমের বাণিজ্যবাজার ধীরে ধীরে আরব বণিকদের হাতে চলে গেল। প্রাকৃতিক কারণে তাম্রলিপ্ত-এর সৌভাগ্য সূর্যও চির অস্তমিত হোল। তাই বলে অষ্টম শতকের পরে তাম্রলিপ্ত হতে কোন জলযান সমুদ্রে যেত না সে কথা ঠিক নয়। আনুমানিক সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত দেশাবলী বিবৃতিতে লেখা হয়েছে যে, ''তাম্রলিপ্ত মহাদেশে ব্যবসায়ী জনের প্রচুর লাভ হয়।''[২২]

বিখ্যাত বন্দর ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র তাম্রলিপ্তের পতনের পর কাঁথি মহকুমার হিজলী ও খেজুরী বন্দর কলকাতা বন্দর পত্তনের পূর্বে উল্লেখযোগ্য বন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাম্রলিপ্ত যখন বিরাট বন্দর ছিল তখন হিজলী ছিল সমুদ্রের গর্ভে। শুধু হিজলী নয়; মহিষাদল, দরো, সুতাহাটা, হুমগড় প্রভৃতি পরগনাগুলি হুগলী নদীর মোহনার পলি পেয়ে ধীরে ধীরে নতুন দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। হিজলগাছের আধিক্য থেকে 'হিজলী' নাম হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

১৫০৫ সালে ঐতিহাসিক হিজলী ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, অনধ্যুষিত জলাভূমি ও ধীবর পল্লী। এই অঞ্চলে পর্তুগীজদের আনাগোনা শুরু হয় ১৫১৪ সালের দিকে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য ইওরোপীয় বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম পর্তুগীজরা সাম্রাজ্যবিস্তার ও ব্যবসার জন্য ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করে। তারপর তারা ধীরে ধীরে কালিকট, কোচিন, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দর হয়ে ১৫১৪ সালে উড়িষ্যার ত্রিপোলীতে এসে পৌছায়।[২৩] সেখান থেকে তারা ঐ বছর মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল হিজলীতে এসে পৌছায়। অবশ্য স্টুয়ার্ট- এর মতে পর্তুগীজরা বাংলায় প্রথম আসে ১৫৩৫ সালে শের খাঁর বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রার্থী বাংলা সুলতান মামুদশাকে সাহায্য করতে।

পর্তুগীজরা হিজলীতে অবতরণ করেও ব্যবসা অপেক্ষা লুঠপাটের দিকে বেশী নজর দেয়। লুণ্ঠনে লাভ ষোল আনাই। কোন বিনিয়োগ নেই কেবল মুনাফা। পর্তুগীজ দস্যুরা ছোট ছোট ছেলে ধরে বিভিন্ন দেশে বিক্রী করতো। স্থানীয় লোক তাদের ছেলেধরা বলেই জানতো।

পর্তুগীজরা পিপলী, বালেশ্বর ও তমলুকের দাসহাটে ধৃত লোকজনদের বিক্রী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। ভারতের বাইরের অনেক দেশের দাসহাটেও এই সব দাসেদের বিক্রী করত। হিজলী ছিল পর্তুগীজদের মানব মৃগয়ার ক্ষেত্র।[৩২] বাংলার মানুষদের দাসরূপে বিক্রীর জন্য তারা অভিনব কৌশল অবলম্বন করতো। পুণ্য লোভাতুর ভারতীয়রা যখন পুণ্যার্জ্জনের জন্য গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে নৌকাযাত্রা করতো তখন পর্তুগীজরা জলপথেই তাদের লুণ্ঠন করতো। কারণ ছোট নৌকায় অগাধ জলের বুকে অল্প কয়েকজন যাত্রীর পক্ষে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বড় জাহাজের পর্তুগীজ দস্যুদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল। দস্যুরা তাদের বড় জাহাজ দিয়ে ছোট নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাত। বন্দী যাত্রীদের শুধু লুণ্ঠন করা হোত তাই নয় তাদের দাস রূপেও চালান করা হোত। এসমস্ত কারণে পর্তুগীজ দস্যুদের গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীদের দিকেই অধিক লক্ষ্য থাকত।[৩৪] সাগর থেকে চট্টগ্রাম কোন অঞ্চলই তখন নিরাপদ ছিল না। ১৫৫১ সাল নাগাদ হিজলী মগ পর্তুগীজদের দাস ব্যবসা ও দস্যুবৃত্তির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এদের দৌরাত্মে হিজলী অঞ্চল তখন প্রায় জনশুন্য। ম্যানরিক যখন প্রথম বাংলায় এসেছিলেন (১৬২৮-২৯) তখন মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে দাস ব্যবসা রমরমা। এই দস্যুরা প্রত্যেক বছর কয়েক হাজার লোক ধরে নিয়ে গিয়ে আরাকানের বিভিন্ন বাজারে বিক্রী করতো। ১৬২৯ সাল থেকে ১৬৩৫ সাল, এই ছয় বছরে দিয়াংগা ও আরাকানের দাসবাজারে প্রায় আঠারো হাজার ভারতীয় দাস দাসী বিক্রী করেছিল মগ ও পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা। ও-ম্যালের মতে এই আঠার হাজার ভারতীয় দাস দাসী আরাকান বাজারে নয় রাজার কাছে বিক্রী করা হয়েছিল। রাজা এই সমস্ত দাসদাসীদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ কারিগর শিল্পী ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে নিজের দাসরূপে ব্যবহার করেছিল বাকী বন্দী দাসদাসীদের বাজারে কুড়ি থেকে সত্তর টাকা মূল্যে বিক্রী করেছিল। ক্রেতারা এদের কৃষিকার্যে নিযুক্ত করেছিল।[৩৬] পর্তুগীজ দস্যুরা যে কেবল মেদিনীপুরের মানুষদের ধরে দাস হিসাবে বিক্রী করত তা নয়। তারা ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমদানী করা দাসদাসী তমলুকের বাজার থেকে কিনে নিত। প্রশাসন ও জনগণের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া তমলুকে তখন দাসব্যবসা চলা অসম্ভব ছিল। মগ পর্তুগীজ দস্যুরা বন্দী করা স্ত্রী পুরুষের হাতের চেটো ছিদ্র করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে সবাইকে বাঁধত। তারপর তাদের জাহাজের পাটাতনের নীচে হাঁস-মুরগীর মতো স্তূপাকারে রাখতো। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কাঁচা চাল খাদ্য হিসাবে পাটাতনের উপর থেকে নীচে মুরগীকে খাদ্য দেওয়ার মতো ছড়িয়ে দেওয়া হোত। নবম শতকে ইউরোপীয় বণিকেরা বহির্বাণিজ্যের প্রধানতম পণ্য হিসেবে (অধিকাংশই অখ্রীষ্টান এলাকা থেকে সংগৃহীত) দাস রপ্তানী আরম্ভ করে। কারণ দাসব্যবসার মাধ্যমেই তাদের প্রচুর অর্থাগম হোত। দাস শ্রমের উপর নির্ভর করাটা তখন ইউরোপীয় সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হোত। শিল্পোৎপাদন উন্নততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাস শ্রমের উপর নির্ভর করাটা অলাভজনক বিবেচিত হওয়ায় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে দাস ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু পর্তুগালে শিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ার ফলে ত্রয়োদশ শতকের

পরও দাস শ্রমের প্রয়োজন থেকে গিয়েছিল। এ সমস্ত কারণে দূর বিদেশে দাসদাসী রূপে মানুষদের বিক্রী করার মতো হীন মনোবৃত্তি ছিল অর্থলোলুপ পর্তুগীজ বণিকদের। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল বাংলার সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এলাকার অনুকূল পরিবেশ। অনেকদিন হিজলী অঞ্চলে মোগলদের অধিকার কায়েম না হলেও ১৬৩০ সালে তারা হিজলী অধিকার করে। তাই পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার থেকে স্থানীয় জনসাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব আঞ্চলিক অধিপতির সঙ্গে মোগলরাও এড়িয়ে যেতে পারে না। এর ফলও মোগলরা পেয়েছিল। পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারের ভয়ে স্থানীয় কৃষকরা জমিজমা ফেলে প্রাণ নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার ফলে হিজলী অঞ্চলের ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। অঞ্চল থেকে রাজস্ব সংগ্রহের কোন উপায় ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে মোগলরা ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হির্জলী থেকে পর্তুগীজদের বহিস্কৃত করে দেয়।[১৭]

হিজলীতে বিদেশী বণিকদের যাতায়াত ছিল। প্রায়ই তাদের হিজলীতে রাত্রিবাস করতে হতো। সে কারণে তারা যেমন বাণিজ্য ভবন নির্মাণ করেছিল, তেমনি নির্মাণ করেছিল উপাসনার জন্য দুটি গির্জা ; একটি হিজলী শহরে অন্যটি বানজা গ্রামে। ব্রুকের মানচিত্র অনুসারে বানজা তমলুক মহিষাদলের কাছাকাছি কোন একটি গ্রাম। সে যাহোক, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদিত পণ্যসম্ভার তারা স্থানীয় দালাল কিংবা বণিক মারফৎ বাণিজ্য ভবনে মজুত করতো। সেখান থেকে সংগৃহীত পণ্য সামগ্রী দিয়ে জাহাজ ভর্তি করে তবেই জাহাজ ছাড়ত। হিজলী থেকে পর্তুগীজরা যে সমস্ত জিনিস তখন রপ্তানী করত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল এক প্রকার তৃণজাত গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার্য্য অতি সুন্দর সূক্ষ বস্ত্র।[১৮] ১৫৮৬ সালে বিখ্যাত ভারত পর্যটক র‍্যাল ফ্ ফীচ্ হিজলীর এই সূক্ষ বস্ত্রের কথা বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,"Not far from Portu Piqueno south-westward standeth a haven, which is called Angeli, in the country of Orixa. In this place is very much rice, and cloth made of cotton, and great of cloth, which is made of grass which they call yerua: it is like a silk. They made good cloth of it, which they send for India and divers other places."[১৯] র‍্যাল ফ্ ফীচ আরো লিখেছেন যে এই স্বর্গ (ব্যবসায়ের) হিজলীতে প্রতিবছর নাগাপতম, সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক জাহাজ আসত এবং সেগুলি তারা সেই জায়গা থেকে সুতী, রেশমের বস্ত্র, চিনি, লঙ্কা, মাখন ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতে পূর্ণ করে ফিরে যেত।[২০] ভ্যালেন্টান হিজলী ও আশপাশ অঞ্চলে সস্তায় প্রচুর উন্নত মানের ধান, চাল ও মোম পাওয়া যেত বলে তাঁর ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজ মিশনারী পাদরী ম্যানরিকও প্রায় একই কথা বলেছেন। তবে এ অঞ্চলের সম্পর্কে তিনি সংযুক্ত করেছিলেন উন্নতমানের প্রচুর চিনি ও রেশমজাত সূক্ষ বস্ত্র। র‍্যালফ ফিচ লিখেছেন, " হিজলীতে প্রচুর চাল ও তুলা উৎপন্ন হোত। তৃণজাত কাপড়(রেশমী কাপড়ের ন্যায়) প্রস্তুত হোত। এই কাপড় হিজলীবাসীরা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রেরন করতো। হিজলী বন্দরে

ভারতবর্ষ, নাগাপতম, সুমাত্রা, মালাক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু জাহাজ আসত এবং প্রচুর চাল, কার্পাস, পশমাদি বস্ত্র, চিনি, লঙ্কা, নবনীত ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে যেত'।[১১] হিজলী অঞ্চলে জঙ্গল মহল ও সুন্দরবনে মধু সংগৃহীত হয়ে সঞ্চিত হোত এবং পরে পর্তুগীজ বণিক মারফৎ তা বিদেশে চালান যেত।

তবে মেদিনীপুর তথা বঙ্গের বাগানবাগিচা পর্তুগীজদের আনা নানারকমের ফলফুল, সব্জী ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রবর্তনে সম্পদশালী হয়েছে। আতা, নোনা, সপেটা, কামরাঙ্গা প্রভৃতি উপাদেয় ফল; রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি নয়নরঞ্জক পুষ্প; কপি, ওলনা, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি মুখোরোচক তরিতরকারী সালসা, আয়াপান, জোলাপ প্রভৃতি গাছগাছড়া পর্তুগীজদের আমদানীকৃত। পর্তুগীজরাই হিজলীতে বিখ্যাত ''হিজলীবাদাম''বা কাজুবাদামের চাষ প্রবর্তন করেছিল। সাগু, পাঁউরুটি, বিস্কুট, তামাক, প্রভৃতি পর্তুগীজদেরই প্রথম আমদানী। আলমারী, কেদারা, জানালা প্রভৃতি গৃহসজ্জা; বিস্তী, কুপন প্রভৃতি ক্রীড়া; সুতী, নিলাম প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি; ক্যানেস্তারা, গামলা, বালতি,তিজেল প্রভৃতি গৃহস্থালী জিনিস; সাবান, তোয়ালে, বোতল প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্য, গরাদ, বর্গা প্রভৃতি গৃহ নির্মাণের উপকরণ; মধুর সঙ্গীতযন্ত্র বেহালা পর্তুগীজদের দ্বারাই বাঙ্গালীরা পেয়েছে।[১১] পর্তুগীজদের বানানো খাদ্যদ্রব্য বা সৌখিন দ্রব্য বাঙ্গালীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়েছে। তারা বাংলাদেশে আম, কমলালেবু আদা প্রভৃতি থেকে মুখরোচক মিষ্টান্ন ও আচার তৈরী করতো। তাছাড়া মেদিনীপুরে ফুলের নির্যাস থেকে একধরনের আতর ও একরকম বীজ থেকে সুগন্ধী তৈরী করতো। এবং এসমস্ত সুগন্ধী তখন গায়ে মাখা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ বলে বিবেচিত হোত।[১২] পর্তুগীজদের একাংশ তখন মেদিনীপুরের মেয়েকে বিয়ে করে মেদিনীপুর জেলাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। মেদিনীপুরের মীরপুরে ফিরিঙ্গীপাড়া আজও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তারা ধর্মের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান কিন্তু কৃষ্টি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একেবারে ভারতীয়। পর্তুগীজদের স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে মেদিনীপুরে কৃষিকাজের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। কারণ পর্তুগীজরা তাদের নিজেদের দেশে ছিল উন্নতমানের কৃষক। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে ও শব্দ বিন্যাসে প্রায় ৫০টি পর্তুগীজ শব্দ স্থায়ী আসন করে নেয়। যেমন- চাবি, পেরেক, বালতি, আলপিন, বারান্দা, জানালা প্রভৃতি। প্রথম বাংলা গদ্য পুস্তক রচনার কৃতিত্ব পর্তুগীজদেরই।

কাজেই পর্তুগীজরা হিজলী থেকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানী করে কৃষকদের উপকারই করেছিল। কারণ কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভালো বাজার পেয়েছিল। শুধু দাস ব্যবসার জন্য বাঙ্গালীরা তাদের ভয় ও ঘৃণার চোখে দেখত। না হলে মেদিনীপুরবাসীর কাছে তারা অত্যন্ত জনপ্রিয়। আবার পর্তুগীজরা অত্যন্ত বিশ্বাসীও ছিল। নাহলে মহিষাদলের রাজা মারাঠা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য জমি দানের বিনিময়ে কিছু বন্দুকচালক পর্তুগীজকে নিজ সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত করত না।[১৩]

ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই হিজলী বন্দরেই ১৬৮৭ সালের ১০ই জুন ভারতে ইংরেজ রাজত্বের

গোড়াপত্তন হয়েছিল। পরে সুতানটি হল ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের ফলে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মেদিনীপুর সহ হিজলী প্রদেশও হস্তগত হয়। হিজলী-কাঁথি অঞ্চল থেকে এ সময় ওলন্দাজ- পর্তুগীজরা চলে গেলেও ফরাসীরা অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজদের পাশাপাশি ব্যবসা চালিয়ে যায়।[৪৭] সপ্তদশ শতক থেকে ওলন্দাজ বণিকরা এই অঞ্চলে ব্যবসা শুরু করে। এই শতকের শেষ দিক থেকে ইংরেজরা ওলন্দাজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। ইংরেজদের বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যতরী নিরাপদে হুগলীর অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতে না পারায় তারা অধিক পরিমাণে হিজলী বন্দর ব্যবহার করতে শুরু করে। পরবর্ত্তীকালে অধিক মুনাফার আশায় তারা মেদিনীপুরের অভ্যন্তরভাগে বাণিজ্য শুরু করে। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের মতে (১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ) সে যুগে চন্দ্রকোনা ও রাধানগর তুলা, কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য তৈরীর একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ফরাসী ও ওলন্দাজরাও অনতিবিলম্বে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন স্থানে কাঁচামালের সন্ধানে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে শুরু করে। যদিও তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ ইংরেজদের মত তত বিপুল ছিল না।[৪৬] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিজলীর বাণিজ্যঅস্তিত্ব ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে থাকে কলকাতা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

তাই বলে হিজলী ধ্বংসের সাথে সাথে মেদিনীপুরের সাগর-বাণিজ্য অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। সমুদ্র থেকে কয়েক কিলোমিটার ভেতরে বানজা ও খেজুরীকে অবলম্বন করে সাগর বাণিজ্য চলতে থাকে। পর্তুগীজ বণিকদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যঘাঁটি বানজা ছিল মোম ব্যবসার বিখ্যাত কেন্দ্র তবে হিজলীর পরিপূরক বাণিজ্যকেন্দ্র বানজা বন্দর ছিল না, ছিল স্থল বাণিজ্য কেন্দ্র।

খেজুরী বন্দর ও পোতাশ্রয় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি অবস্থিত ছিল কাঁথি মহকুমার উত্তর-পশ্চিমে, ষোল মাইল দূরে হুগলী নদীর ডান তীরে।[৪৭] হিজলী বন্দরের রমরমার সময়ে খেজুরীর স্থানগত অবস্থান ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতা বন্দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক বন্দর হিসেবে খেজুরীতেও ক্রমাগত উন্নতি হয়। খেজুরী সমুদ্রের খুব কাছে অবস্থিত হওয়ায় জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাসের আপেক্ষিক সুবিধা ছিল। কলকাতা থেকে যাঁরা সমুদ্র যাত্রা করতেন তাঁরা প্রথমে ছোট ছোট নৌকা বা সুলুপে করে খেজুরীতে আসতেন এবং সেখানে দু-এক রাত্রি বিশ্রামের পর বড় জাহাজে করে বিদেশ যেতেন। বিদেশীরা কলকাতাতে আসতেন একইভাবে— খেজুরী হয়ে ছোট নৌকা করে।[৪৮] এ সমস্ত কারণে খেজুরী হয়ে উঠেছিল বাংলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পোতাশ্রয় ও কোলাহল-মুখর বন্দর শহর।[৪৯] এই খেজুরী বন্দর থেকে রাজা রামমোহন রায় (২০শে নভেম্বর, ১৮৩০) 'আলবিয়ান' নামে একটি জাহাজে করে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেছিলেন।

খেজুরীর তিন চার মাইল দক্ষিণে কাউখালির আশি ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট লাইট হাউসটি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগামী জাহাজে আলো দেখাতে শুরু করে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ১৫ মাইল দূর থেকে এর আলো দেখা যেত। এই আলো পূর্ণ জোয়ারের সময় জলের উচ্চতার ৭৫

ফুট ওপরে ছিল। সমুদ্রগামী জাহাজকে সঠিক পথদর্শনের জন্য এই আলোকস্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫০] ইউরোপ থেকে আগত বহু জাহাজ মালপত্র খালাস করে পুনরায় বোঝাই করার জন্য বেশ কিছুদিন খেজুরী বন্দরে অবস্থান করত। তাই বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই এখানে গড়ে উঠেছিল হোটেল, গীর্জ্জা, বিশ্রামাগার এমন কি গণিকালয় পর্যন্ত। ভারতে প্রথম টেলিগ্রাফলাইন খেজুরীতে প্রবর্তনের ভার, খেজুরী পোষ্টাপিসের ভার, ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সহ সব জাহাজের যাত্রী ও নাবিকগণের সঙ্গে কার্য সম্বন্ধ নির্ণয়ের ভার, উচ্চবেতনভোগী ইংরেজ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল।[৫১] দক্ষিণবঙ্গ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশে রপ্তানী হোত মূলতঃ চাল, সিল্ক ও চিনি। আর ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কর্তৃক আমদানী হোত প্রধানতঃ সুতীবস্ত্র, তুলাজাত সুতা প্রভৃতি।[৫২]

কিন্তু খেজুরী বন্দর হিসেবে বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। সমুদ্র থেকে যেমন তার উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তেমনি সমুদ্রের করালগ্রাসে সে অবলুপ্ত হয়েছিল। ১৮০৭, ১৮২৩, ১৮৩১, ১৮৩৩ সালে ঝড় ও বন্যায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। ১৮৩৪ সমুদ্রের বিধ্বসী জলোচ্ছ্বাসে খেজুরী মারাত্মক ভাবে প্লাবিত হয়েছিল। প্রায় সমস্ত ফসল ও পশুপাখী ধ্বংস হয়েগিয়েছিল। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ খাদ্যভাবে ও মহামারীতে মারা পড়েছিল। এই জলোচ্ছ্বাস ভারতীয়-ইউরোপীয় ভেদাভেদ রাখেনি। বহু ইউরোপীয়ের তখন সলিল সমাধি ঘটে। বাণিজ্য বন্দর হিসেবে খেজুরীর নাম সমুদ্রের ঢেউ-এ হারিয়ে যায়।

তাম্রলিপ্ত, হিজলী বা খেজুরীর সামুদ্রিক বাণিজ্য কেবল পণ্য আমদানী রপ্তানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছিল না কেবল আর্থিক লাভ লোকশানের মধ্যে গন্ডীবদ্ধ। যে সব দেশে বাণিজ্যিক লেনদেন চলেছে সেগুলির মধ্যে অনেক ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে বহু নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সাগর-বাণিজ্যের ফলে দেশগুলির প্রয়োজনীয় সামগ্রী গুলির উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে উৎপাদকরা কিছুটা হলে বর্ধিত মূল্য পেয়েছে। স্থানীয় ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্রের প্রসারণ ঘটেছে অথবা নতুন করে আবির্ভাব ঘটেছে। বাণিজ্যিক লেনদেন পদ্ধতির বিনিময় ঘটেছে। মানুষ জীবিকা অর্জ্জনের বহু পথের সন্ধান পেয়েছে। ব্যবসায়ীদের যাতায়াত নতুন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পড়েছে গভীর প্রভাব। শিল্পকলা, শিক্ষাসাহিত্য ও বহু নান্দনিক পরিকাঠামোর মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। বাণিজ্যিক সূত্রকে অবলম্বন করেই দেওয়া ও নেওয়ার মূলমহামন্ত্রকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই মহামিলন যজ্ঞে মেদিনীপুর সামিল হতে পেরে কিছুটা অত্যাচারিত ও শোষিত হওয়া সত্ত্বেও, হয়েছে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী।

তিন

দাঁতনের ইতিকথা

মেদিনীপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তিস্থল দাঁতন। দাঁতনের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত। তবে এখনকার দাঁতন প্রাচীন 'দণ্ডভুক্তি'র রাজধানী ছিল কিনা, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ প্রাচীন 'দন্তপুর' নগরের সঙ্গে দাঁতনকে অভিন্ন বলে মনে করেন। সে যা হোক, দাঁতন থেকে পাওয়া অজস্র পুরাবস্তু লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। দাঁতন ও তার আশপাশ থেকে যে সব উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু পাওয়া গেছে, সেগুলি হল, কাকরাজিৎ গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি ও অরুণমূর্তি, দাতুনিয়ার বুদ্ধমূর্তি, পানপাত্র, প্রাচীন লিপি ইত্যাদি। দাঁতনের 'পুরাতনগড়' থেকে যে কয়েকটি মূর্তি আবিষ্কৃত, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— মহাবীর মূর্তি(চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিসহ) এবং একটি বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধের একটি ভগ্ন মস্তকও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। দাঁতন ও তার আশেপাশে মাটির নীচে প্রাচীন স্তূপ, ভগ্ন ইঁট পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ সূচিত করে বহু প্রাচীনকালের এক সমৃদ্ধশালী নগরীর অস্তিত্ব। প্রাচীন দণ্ডভুক্তির সঙ্গে দাঁতনের অভিন্নতা স্বীকার করে নিলে এই স্থান যে বেশ প্রাচীন তা অনুমান করা যায়।[১]

'দাঁতন' নামের উৎপত্তি নিয়ে দুটি জনশ্রুতি আছে। এক, শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব পুরী গমনকালে এই স্থানে দাঁত মেজে দাঁতন ফেলেছিলেন বলেই জায়গাটির নাম দাঁতন হয়। জনশ্রুতিটি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ, চৈতন্যদেব দাঁতন ফেলার জন্য জায়গাটির নাম দাঁতন হয়— এ ধরণের অনুমান শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও। তাছাড়া, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বহু সাহিত্যিক উপাদানে উল্লিখিত হয়েছে— চৈতন্যদেব দাঁতন হয়ে পুরী গমন করেছিলেন। সুতরাং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই দাঁতন নামক জায়গা ছিল। অন্ততঃ এই নামে এটি একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। একথার কিছুটা সমর্থন মেলে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে লেখা পণ্ডিত যদুনন্দনের দাঁতনের ইতিহাসে। দুই, বুদ্ধদেবের দন্ত এখানে এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা থেকে 'দন্তপুর' বা দাঁতন নামের উৎপত্তি। এই অনুমানটি কিছুটা সত্য হতে পারে। কারণ, এই স্থানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হয়েছিল, প্রমাণ আছে। তাছাড়া, বুদ্ধদন্তের স্মারক হিসাব অঞ্চলের নাম দাঁতন হতে পারে।

প্রাচীনকালে 'ভুক্তি' বলতে সাধারণতঃ কয়েকটি গ্রামকে বোঝাত। কয়েকটি 'ভুক্তি' নিয়ে গঠিত হত 'বিষয়' বা জেলা। প্রদেশগুলি 'মন্ডল' নামে পরিচিত ছিল। প্রদেশগুলি শাসিত হত স্বাধীন অথবা সামন্ত নৃপতি কর্তৃক। তবে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, ''সর্বাপেক্ষা

বড় বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি। প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি বিষয়, মন্ডল, বীথি ও গ্রামে বিভক্ত ছিল।" [১] তাই 'দন্ড' নামক একটি জায়গা 'ভুক্তি'-তে রূপান্তরিত এবং পরে সেটিই 'মন্ডল' বা প্রদেশে রূপান্তরিত হয়েছিল কিনা বলা মুস্কিল। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীতেই যে একটি অঞ্চল 'দন্ডভুক্তিমন্ডল' নামে সুপরিচিত ছিল তা অনুমান করা যায় এবং ঐ সময় থেকেই অঞ্চলটি বিভিন্ন বিবাদমান রাজশক্তির দ্বন্দ্বক্ষেত্র ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উত্তরভারতে গুপ্তদের আবির্ভাবের পূর্বে কোন উপাদান থেকে দন্ডভুক্তি বিষয়ক কোন রাজ্যবিভাগের কথা জানা যায় না। এই অঞ্চলের প্রথম কথা জানা যায় একটি তাম্রশাসন থেকে যেটি ঘোষিত হয়েছিল বাংলার এক অজানা রাজপরিবারের 'মহারাজা' গোপচন্দ্রের অধীনস্থ দন্ডভুক্তির সামন্ত শাসক অচ্যুত কর্তৃক।[২] 'মহারাজা-মহাসামন্ত' অচ্যুত কর্তৃক উক্ত তাম্রশাসনটি দন্ডভুক্তি থেকে ঘোষিত হয়েছিল তার প্রভু গোপচন্দ্রের রাজত্বকালের প্রথমবছরে, সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। অর্থাৎ এই সময়ের পূর্বে দন্ডভুক্তি গড়ে উঠেছিল এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে দন্ডভুক্তি ক্ষুদ্র নৃপতির রাজ্য হিসাবে গোপচন্দ্রের অধীনস্থ হয়েছিল। অচ্যুতের এই তাম্রশাসনটি বালাশোর জেলার দক্ষিণস্থ ভোগরাই থানার জয়রামপুর অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এটি ঘোষিত হয়েছিল দন্ডভুক্তির অর্ন্তভুক্ত বোধিপদ্রকে অবস্থিত একটি বৌদ্ধ মহাবিহারের জন্য। শ্বেতবালিকা নামে দান করা গ্রামটি এবং বোধিপ্রদক অঞ্চলটি তখন সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত উৎকল অংশটি (বর্তমান বালাশোর জেলার অংশবিশেষ), বিশেষতঃ ভোগরাই, জলেশ্বর ইত্যাদি অঞ্চল গোপচন্দ্রের শাসনের পূর্বেই দন্ডভুক্তির অর্ন্তগত ছিল। এই তথ্য পরবর্তীকালে প্রাপ্ত কিছু লিপি কর্তৃক দৃঢ়ভাবে সমর্থিত।[৩]

কয়েক বৎসর পূর্বে গোপচন্দ্রের সময়ে উপরিউক্ত সনদের প্রায় সমসাময়িককালে উড়িষ্যার কেওনঝাড় জেলায় আর একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার থেকে নাগবংশের দাবিদার একসারি রাজার অস্তিত্বের কথা জানা গেছে এবং এও জানা গেছে যে এই সব রাজারা তাদের নামেরশেষে 'ভঞ্জ' শব্দটি ব্যবহার করতো। মানভঞ্জ-এর পুত্র শত্রু ভঞ্জ 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি স্বর্ণ ও গোদান করতে করতে পাটলীপুত্র, ললাবর্দ্ধন, গয়া, কৃমিল, পুন্ড্রবর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, তাম্রলিপ্ত উভয়তোসলি প্রভৃতি পবিত্র অঞ্চল সমূহ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর ভ্রমণ তালিকায় দন্ডভুক্তির কোন উল্লেখ নেই। তখন তাম্রলিপ্ত দন্ডভুক্তির একটি অংশ ছিল কিনা বলা প্রমাণাভাবে শক্ত। তবে এই লিপিতে উল্লিখিত 'উভয়-তোসলির'- ভৌগোলিক অবস্থান অষ্টম ও নবম শতকের কিছু উড়িষ্যা লিপি থেকে আন্দাজ করা যায়। এ সময় উভয়-তোসলি জনৈক ভৌম-কর রাজবংশ কর্তৃক শাসিত হতো এবং তাদের রাজত্ব দু-ভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর-তোসলি ও দক্ষিণ- তোসলি। মহানদী এই উত্তর ও দক্ষিণ তোসলির মধ্যকার সীমারেখা ছিল। এই রাজ্য পূর্বে মেদিনীপুর জেলার সম্ভবতঃ দন্ডভুক্তি অঞ্চল থেকে চিল্কা লেক সহ গঞ্জাম জেলার উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪] কারণ শত্রুভঞ্জের রাজত্বকালে দন্ডভুক্তি উত্তর

তোসলির একটি অংশ ছিল কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেও তোসলি উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত ছিল এবং তোসলি আঠারটি অরণ্যরাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। শশাঙ্কের সামন্ত রাজা সোমদত্তের একটি তাম্রপটলিপি থেকে জানা যায় যে দন্ডভুক্তি স্পষ্টতঃ ঐ আঠারটি অরণ্যরাজ্যের একটি অংশ ছিল।[৮] গৌড়রাজ শশাঙ্ক তাঁর উনবিংশ রাজত্ববৎসরে সোমদত্তকে দন্ডভুক্তিসহ উৎকল দেশের সামন্ত শাসকরূপে নিয়োজিত করেন। ঐ সময় সোমদত্তের উপাধি ছিল 'সামন্ত মহারাজা'। গৌড়রাজ শশাঙ্কের উত্থান হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর কিছু আগে বা পরে। তাঁর উত্থান সমগ্র পূর্বভারতের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহকে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ বর্তমান গঞ্জাম জেলার সীমা বরাবর কলিঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাই উত্তর-পূর্বে তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণে উৎকল, পশ্চিমে ওড্র এবং এদের মধ্যবর্তী ভূভাগ সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের রাজত্বকালের 'দন্ডভুক্তি'। ওড্রের অর্ন্তগত সামান্য প্রাচীন ভূমি ছাড়া (ঝাড়গ্রাম মহকুমা), দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার অবশিষ্ট অংশ তখন দন্ডভুক্তি রাজ্যের অর্ন্তগত ছিল বলে অনুমান করা হয়। শশাঙ্কর লিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান ও দাঁতনের নিকটবর্তী 'সরশঙ্কা' সরোবর এই অনুমানের সহায়ক।[৯]

সোমদত্তের মোটামুটি সমসাময়িক শশাঙ্কের আর একজন অধীনস্থ রাজা শুভকীর্তির নিজস্ব একটি লিপি (মেদিনীপুর লিপি) থেকে জানা যায়, মহাপ্রতিহার শুভকীর্তি দন্ডভুক্তি শাসন করেছিলেন। এই লিপিটি প্রকাশিত হয় শশাঙ্কের রাজত্বের অষ্টম বৎসরে। সোমদত্তের ও শুভকীর্তির লিপি এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে দন্ডভুক্তি উড়িষ্যার কেওনঝাড় ও ময়ূরভঞ্জ জেলার কিছু অংশ এবং বালাশোরের উপকূলবর্তী জেলাসহ উৎকল দেশের একটি অংশ ছিল। তবে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ দন্ডভুক্তির উল্লেখ করেন নি; করেছেন তাম্রলিপ্তর: যাকে পন্ডিতরা একটি পৃথক রাজ্য বলে মনে করেন। একথার সমর্থন মেলে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, যেখানে তাম্রলিপ্ত কখন সুম্ভ আবার কখন বঙ্গের একটি অংশরূপে উল্লিখিত। কিন্তু সমসাময়িক লিপিসমূহ তাম্রলিপ্তকে একটি পৃথক রাজ্যরূপে সূচিত করে না। বরং মধ্যযুগের প্রথমভাগে তাম্রলিপ্তকে দন্ডভুক্তির একটি অংশরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভৌম-কর রাজারা (C.736-740 A.D.) তাঁদের শিলালিপিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, দন্ডভুক্তি তাঁদের উত্তর-তোসলি রাজ্যের একটি অংশ। চতুর্থ শীবকরের তলচের প্লেট থেকে জানা যায় (C.885 A.D.) দ্বিতীয় শীবকর- উন্মত্ত সিংহ বা উন্মত্তকেশরী রাঢ়ের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর কন্যাকে বিজয়ের প্রতীকরূপে ছিনিয়ে আনেন। এই রাঢ় রাজা কে ছিলেন তা জানা যায় না। তবে এটা অনুমান করা যেতে পারে, উন্মত্তকেশরীর সময় (৮ম শতাব্দীর প্রায় মধ্যবর্ত্তীকাল) বাংলায় পাল রাজবংশ দ্রুত স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। তথাপি উন্মত্তকেশরী দন্ডভুক্তির উপর দিয়ে পাল রাজাদের বিরূদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা

করেছিলেন। অষ্টম ও তৎপরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী রাঢ় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অঞ্চল সমূহকে সূচিত করতো। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, উন্মত্তকেশরী দন্ডভুক্তি অঞ্চল দখল করে তোসলি রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করেন। এবং এই অঞ্চলটি ভৌম-কর সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল প্রায় ৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ভৌম-কর রানী দ্বিতীয় ত্রিভূবনমহাদেবী বা পৃথ্বীমহাদেবী কর্তৃক প্রচলিত তাম্রশাসন এই তথ্যকে সমর্থন করে।[৮] এই দুটি তাম্রশাসনে বর্ণিত হয়েছে যে, মন্ডলাধিপতি মঙ্গলকলসের স্ত্রী শশীলেখা দ্বিতীয় ত্রিভুবনদেবীর সম্মতি লাভ করে শিবমন্দির নির্মাণের জন্য দন্ডভুক্তি অঞ্চলের কিছু ভূমি দান করেন। মন্দিরচত্বরটি তাঁর পিতা নম্নর নামানুযায়ী নম্নেশ্বর নাম রাখা হয়। এই অনুশাসনে বর্ণিত হয়েছে যে, শশীকলা বিরাট বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাগড়ী বংশের মন্ডলাধিপতি সামন্ত নরপতি মঙ্গলকলস দন্ডভুক্তি মন্ডলের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু বিরাট বংশের রাজত্বের ভৌগোলিক অবস্থান আজও ঠিকমত নির্ণীত হয়নি।[৯] তবে এই দুই রাজবংশ সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। বিরাট নামক রাজবংশের অস্তিত্ব নাকি উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের যথাক্রমে ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুর জেলা সমূহে ছিল। স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করে এন.এন.বসু ময়ূরভঞ্জ ও বালাশোর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই বংশের শাসনের একটি বিবরণ দিয়েছেন।[১০] বিরাট রাজাদের রাজধানী আজও বিরাটপুর নামে পরিচিত এবং বিরাটপুরকে ময়ূরভঞ্জ জেলার বর্তমানের কোইসরাগড় অঞ্চল বলে সনাক্তকরণ করা হয়েছে। এই বংশের প্রাচীন নিদর্শনাদি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে , ময়ূরভঞ্জ জেলার খিচি, কপতিপদ ও বালাশোর জেলার নীলগিরি ও তৎসন্নিহিত এলাকায় দেখা যায়।[১১] ঐ অঞ্চলে ভঞ্জরাজাদের আবির্ভাবের পূর্বে ময়ূরভঞ্জে বিরাট বংশ খ্যাতিলাভ করেছিল। এই বংশের রাজারা নাগমূর্তির উপাসক ছিলেন এবং এইজন্য তারা বিরাট-ভূজঙ্গরূপেও পরিচিত ছিলেন। এরা খিজ্জিংগকোট্টার ভঞ্জরাজাদের অধীনে ময়ূরভঞ্জের একটি ছোট অঞ্চলের সামন্ত নরপতি ছিলেন। আবার এই ভঞ্জরা ছিলেন তোসলির ভৌম-করদের অধীনে অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী।[১২] সময়ের আবর্তে মহাভারতের বিরাট রাজার সঙ্গে ময়ূরভঞ্জ এলাকার বিরাট রাজবংশকে জড়িয়ে জনশ্রুতি গড়ে ওঠে। ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জদের অধীনে বিরাট বংশের বংশধরেরা হয়ত মেদিনীপুর ও বালাশোরের কিছুকাংশের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন। মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি এবং বালাশোর জেলার জয়রামপুরের বিরাট টিপিকে কেন্দ্র করেও জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে। ভঞ্জদের অতীত স্মারক থেকে জানা যায় যে. তাঁরা তাঁদের প্রভাব মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছিলেন। এবং দন্ডভুক্তিমন্ডল তাঁদের অধীনে বহুকাল ছিল। একটি মজার কথা হল এই যে, অন্ততঃ বৃটিশদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মেদিনীপুর শহরের একটি অংশ বহুকালধরে ভঞ্জভূম নামে পরিচিত ছিল।[১৩] মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় দু-মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র গড় বা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয় যা জনসাধরণের কাছে আজও বিরাট রাজার গড় বা গোপগড় বা গোগৃহ নামে সুপরিচিত। পরবর্তী সময়ে বৃটিশ শাসনকালে এই গড়ের উপর

একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে।

দন্ডভুক্তির সামন্তরাজা মঙ্গলকলসের (শশীলেখার স্বামী) ব্রাগড়ী (বগড়ী) বংশের ইতিহাস পূর্বের পন্ডিতরা তেমন কিছু জানতেন না, জানতেন না তাঁদের শাসনাধীন অঞ্চল ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় ত্রিভুবনমহাদেবীর উপরিউক্ত দুটি লিপি থেকে প্রথম জানা যায় যে, দন্ডভুক্তিমন্ডল অঞ্চলে নবম শতাব্দীর দিকে বগড়ী রাজবংশ রাজত্ব করছিল। এই লিপিগুলি থেকে এই বংশের প্রথম রাজার নামও জানা যায়। আরো জানা যায়, এই বংশ মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলের বগড়ীরাজ্যের একদা অধীশ্বর ছিল এবং মুসলমানের আক্রমণের পূর্ব পর্যান্ত এরাই অঞ্চলটি শাসন করছিল। এই প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল বর্তমানের গড়বেতা শহরাঞ্চল। মধ্যযুগে বগড়ী একটি পরগনা ছিল। প্রাচীন বৃহৎ জলাশয়, মন্দির ও দুর্গের ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ অঞ্চলটির প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। টোডরমল্লের রাজস্ববিভাগে বগড়ীর নাম আছে। অনেকে মনে করেন 'বকডিহি'নামের অপভ্রংশ বগড়ী। এখানকার অধিবাসীদের ভেতর বাগদীদের সংখ্যা বেশি। বাগদিদের নামানুযায়ী নাকি অঞ্চলের নাম হয়েছে বগড়ী। মহাভারতোক্ত বক রাজার রাজ্য ছিল এই অঞ্চলেই। অবশ্য এ সমস্তই অনুমাননির্ভর। সে যা হোক্, এ বংশের সদস্যরা বাংলার সেন-পাল অথবা উড়িষ্যার ভৌম-করদের অধীনে ছোট ছোট রাজ্যসমূহের শাসক ছিলেন এবং মোঘলদের উত্থানের পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁরা সে অধিকার ভোগ করছিলেন। 'বল্লালচরিত' - এর কিংবদন্তী অনুসারে বল্লালসেনের রাজ্য বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগড়ী ও মিথিলা— এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা সন্দেহ। কারণ বিহারের ভাগলপুর জেলায় অর্থাৎ প্রাচীন অঙ্গ জনপদে বল্লালের রাজত্বের প্রমাণ আছে। কিন্তু তালিকাটিতে অঙ্গের উল্লেখ নেই। আবার মিথিলাতে এই সময় কর্নাটবংশীয়েরা রাজত্ব করছিলেন। সেখানে বল্লালের অধিকার প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বর্তমান পদ্মা ও ভাগীরথীর সঙ্গম- অঞ্চলে পদ্মার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদের নাম বাঘড়ী। কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, সেন আমলে জনপদটি অনেকটা বিস্তৃত হয়েছিল কিনা, তা বলা কঠিন।[১৪] আবার কেউ কেউ মনে করেন, বল্লাল সেনের প্রথম চারটি প্রদেশ অবস্থিত ছিল বর্তমান বাংলাদেশে এবং একটি পশ্চিমবঙ্গে। তখন বাগড়ীর অবস্থান ছিল উৎকল ও রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল তথা মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে। ভৌম-করদের শাসনকালে দন্ডভুক্তি অঞ্চল সম্ভবতঃ রূপনারায়ণ নদী এবং ব্রাগড়ীদের রাজ্য, বিশেষতঃ তাঁদের রাজধানী বগড়ী তথা গড়বেতা অঞ্চল পর্য্যন্ত উত্তরে বিস্তৃত ছিল।

খিজ্জিংগকোট্টার ভঞ্জরা উড়িষ্যার ভৌমশাসনের শেষের দিকে তাঁদের অন্যান্য শাখা বংশের তুলনায় (যাঁরা এসময় পুরী ও গঞ্জাম জেলায় শাসন চালাচ্ছিলেন) সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী সামন্ত শাসক ছিলেন। ভৌমদের যে শেষ রানীর কথা জানা যায় তাঁর নাম ছিল বকুলমহাদেবী। তিনি ভঞ্জবংশের রাজকুমারী ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম চতুর্থ শুভাকর। ভৌম

শাসনের ২০৪ অব্দে (৯৪০ খৃষ্টাব্দে) যে সর্বশেষ তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা এই রানী কর্তৃক প্রচলিত।[১৫] ভৌম-কর শাসনের শেষের দিকে উড়িষ্যায় সম্ভবতঃ ভঞ্জদের (বিশেষতঃ ময়ূরভঞ্জের কাজ্ঝিংগকোট্টা থেকে এই বংশের যে শাখা শাসন করছিল) রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধারণার সমর্থন মেলে বকুল মহাদেবীর তাম্রশাসন থেকে যাতে তিনি ভৌমশাসকের রানী বলে উল্লেখ না করে ভঞ্জরাজকুমারী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন।

ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জবংশের বংশধরেরা দশম ও একাদশ শতাব্দীর দিকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শাসকরূপে দন্ডভুক্তি শাসন করেছিলেন। ভঞ্জবংশের একজন বংশধর কোট্টভঞ্জ দশম শতাব্দীর শেষ দিকে দ ন্ডভুক্তি মন্ডল শাসন করেছিলেন বলে তাঁর তাম্রশাসন[১৬] থেকে জানা যায়। তবে এই কোট্টভঞ্জ ও দন্ডভুক্তি মন্ডলের ভঞ্জশাসকের প্রকৃত সম্পর্ক এখনও নির্ণীত হয় নি। কেউ কেউ মনে করেন আদি-ভঞ্জরা বিহারের সিংভূম ও উড়িষ্যার বালাশোর জেলা সহ পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর জেলা শাসন করতেন। এই তথ্য মোঘল ও বৃটিশ আমলের কিছু তথ্য কর্তৃক সমর্থিত। এই আদি-ভঞ্জরা কিছুকাল ভৌমদের অধীনে আধা স্বাধীন শাসক থাকলেও, পরবর্তীকালে তাঁরা ভৌম-করদের অধীনতা ছিন্ন করে খিজ্ঝিংগকোট্টা থেকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

তৌসলির ভৌম-করদের পতনের পর দন্ডভুক্তি সম্ভবতঃ কাম্বোজ শাসকদের অধীনে আসে। কাম্বোজরাজ নয়পালদেবের দুটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর সময়ে দন্ডভুক্তি বর্দ্ধমানভুক্তি রাজ্যের অর্ন্তগত ছিল। তিনি দন্ডভুক্তিতে ভূমিদান করেছিলেন বলে কথিত হয়। এই বংশের শাসনকাল সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর শেষের দিক। বাংলার পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই রাজবংশ দন্ডভুক্তি এবং বর্দ্ধমানভুক্তি সমূহ অধিকার করেন বলে ধারণা করা হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে দন্ডভুক্তির দক্ষিণ - পশ্চিম সীমারেখা বালাশোর জেলার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত ছিল। অবশ্য কাম্বোজরা এই অঞ্চলটি বেশিদিন নিজেদের অধিকারে রাখতে পারে নি। কারণ, ১০২৫ খৃষ্টাব্দে তামিলনাড়ুর রাজা রাজেন্দ্রচোলের ১৩ শ রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ তিরুমালে অভিলেখে দেখা যায়, ঐ তারিখের অল্পকাল পূর্বে চোল সৈন্য বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে উপস্থিত হয়ে কতিপয় স্থানীয় নরপতিকে পরাজিত করেছিলেন।[১৭] এই রাজগণ হলেন—(১) দন্ডভুক্তির ধর্মপাল, (২) দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, (৩) বঙ্গাল দেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং (৪) উত্তরাঢ় অঞ্চলে পরাজিত মহীপাল। এই রাজগণের মধ্যে কেউ বা মহীপালের বশীভূত-মিত্র এবং কেউ বা সামন্ত ছিলেন বলে মনে করা যায়। মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অঞ্চলের রাজা ধর্মপাল হয়তো কাম্বোজ বংশীয় ছিলেন, যাঁরা তাঁদের নামের শেষে পাল শব্দ ব্যবহার করতেন।[১৮] চোল রেকর্ড থেকে প্রতীয়মান হয় যে দন্ডভুক্তি সহ বর্দ্ধমানভুক্তি এ সময় পাল সাম্রাজ্য থেকে কিছু সময়ের জন্য কাম্বোজরা বিচ্ছিন্ন করেছিল। পালরাজা মহীপাল (সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল) উত্তর রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। বর্দ্ধমানভুক্তি দক্ষিণ রাঢ়ের অর্ন্তভূক্ত ছিল এবং সেখানে রণশূর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন যেমন ধর্মপাল রাজত্ব করছিলেন দন্ডভুক্তিতে। যদি এই ধর্মপালকে

কাম্বোজ বংশের বংশধর বলে ধরা হয় তাহলে একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে নয়পাল, এই রাজার একজন পূর্বপুরুষ দশম শতব্দীর শেষের দিকে দন্ডভুক্তি সহ বর্দ্ধমানভুক্তি বিহার ও বাংলার পাল রাজাদের কাছ থেকে বলপূর্বক দখল করে নিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, সোমবংশীয় রাজা উদ্যোতকেশরী উৎকল, ওড্র ও গৌড়ের শাসকদের পরাজিত করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ দন্ডভুক্তিমন্ডল পাল রাজাদের পরাজিত করার পর অধিকার করেছিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে কৈবর্তযুদ্ধে রামপালকে সাহায্য করেছিলেন উৎকলরাজ কর্ণকেশরীর বিজেতা দন্ডভুক্তিপতি জয়সিংহ। দন্ডভুক্তি নগরী তখন ছিল মেদিনীপুরে। সোমবংশীয় কর্ণের (আ১১০০-১০ খ্রীঃ) রাজধানী ছিল গুহেশ্বরপাটক বা গুহদেবপাটক (কটক জেলার অন্তর্গত যাজপুর)।[১১] কিছু লিখিত উপাদান থেকে জানা যায় যে, ভৌম-কর সাম্রাজ্য ধ্বংসের সাথে সাথে দন্ডভুক্তি ভৌম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং কর্ণদেব কর্তৃক এই অঞ্চল পুণরুদ্ধার করার চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।

কলচুরিরাজা দ্বিতীয় পৃথ্বীদেবের কোনি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, রতনপুরের কলচুরিরা দন্ডভুক্তির শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পুরুষোত্তম, 'সর্বাধিকারী' উপাধিপ্রাপ্ত অন্যতম সেনানায়ক, প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দন্ডভুক্তি ও খিজ্জিংগ সাম্রাজ্য বহুবার পদানত করেছিলেন বলে অভিনন্দিত হয়েছেন। খুব সম্ভবতঃ চোড়গঙ্গ সোমবংশের কর্ণদেবকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন এবং সেই সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উড়িষ্যার সোমবংশীয় শাসনের অবসান ঘটান। ১১১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ কর আদায় করেন এবং মান্দারের (পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার গড় মন্দারন) রাজধানী ধ্বংস করেন। অবশ্য দন্ডভুক্তির উল্লেখ চোড়গঙ্গ অথবা তাঁর উত্তরাধিকারীদের কোন রেকর্ডে নেই।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দন্ডভুক্তি অঞ্চল মধ্যযুগের আদি পর্বের প্রায় সমস্ত সময়ব্যাপী বিভিন্ন শক্তির রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও তজ্জনিত বিশৃংখলার কেন্দ্র ছিল। তবু এরই মধ্যে কিভাবে দন্ডভুক্তি পূর্ব ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্প- সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

ইতিহাসবিমুখতা ও অজ্ঞতার ফলে দণ্ডভুক্তির প্রাচীন সংস্কৃতির বিশেষ কোন প্রামাণ্য উপাদান নেই। তবে অনুমিত হয়, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহ এখানে বাস করতো। দণ্ডভুক্তি ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মহামিলন মেলা। আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ বাহুল্য - বর্জিত ছিল। অঞ্চলটি অধিকাংশ সময় উৎকলের অন্তর্গত থাকায় ভাষায় লক্ষ্য করা যায় গ্রাম্য ওড়িষ্যা ভাষার বিশেষ প্রভাব।[১২]

একদা দাঁতন শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশেষ উন্নত ছিল। স্থাপত্য শিল্পে উড়িষ্যার প্রভাব পড়েছিল। তাই দাঁতনের বহু অঞ্চলে বহু শিখর ও পীঢ়াদেউলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপব সরসীকুমার সরস্বতী কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পাণ্ডুলিপি

থেকে (১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত) যেসব প্রাচীন মন্দিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করেছেন, তার মধ্যে প্রাচীন বাংলার দণ্ডভুক্তির যজ্ঞপিণ্ডি লোকনাথের একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে। সেটি প্রাচীন বাংলার প্রচলিত 'স্তূপশীর্ষভদ্র' রীতির বলে জানা যায়।[২১] উল্লেখ্য, বাংলার মন্দিরই যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দিরস্থাপত্যের মূল প্রেরণা। সমসাময়িক লিপিমালা ও সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার কোন কোন মন্দিরের সমৃদ্ধির বর্ণনা দৃষ্টিগোচর; এমন দুই-একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা যায় সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিচিত্রে এবং তক্ষণফলকে, যেমন রাঢ়া ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধমন্দির, বরেন্দ্রের তারামন্দির, সমতট, বরেন্দ্র, নালেন্দ্র, রাঢ়া এবং দণ্ডভুক্তির লোকনাথ মন্দির। এইসব মন্দিরের প্রতিকৃতির আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলার মন্দিরের মোটামুটি চারটি রূপ। যথা— (১) ভদ্র বা পীঢ়দেউল, (২) রেখ বা শিখর দেউল, (৩) স্তূপযুক্ত পীঢ় বা ভদ্র দেউল, (৪) শিখর যুক্ত পীঢ় বা ভদ্র দেউল। বিভিন্ন শৈলীর মন্দির নির্মাণ রীতি প্রচলিত ছিল। রীতি ও শৈলীর এই বিভিন্নতা ভূমি-নকশানির্ভর নয়, বস্তুতঃ, প্রত্যেকটি রীতিতেই ভূমি-নকশার যুক্তি ও বিন্যাস প্রায় একই ধরণের; এই বিভিন্নতা গর্ভগৃহের উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ বা চালের রূপ ও আকৃতি নির্ভর।[২২] দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দিরটি 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' শৈলীর এবং মাকড়াপাথরের নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থ এগার ফুট ছয় ইঞ্চি। সামনে একটি অনুচ্চ 'চারচালা' নাটমন্দির বর্তমান। গণ্ডী অংশ পাঁচটি 'পীঢ়' এর সমষ্টি এবং শীর্ষে 'আমলক' টি বেশ বড়ো।[২৩] দুটি মোষ বিশিষ্ট মন্দিরটির প্রবেশদ্বারও দুটি। দেউল বা স্তম্ভটি দেখতে প্যাগোডার মত ও চমৎকার। জগমোহনের উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়াল বান্ধায় রিফিলের দুটি যুগলমূর্তি। মন্দিরটির সঠিক নির্মাণকাল জানা যায়নি, দাঁতন থানার এলাকাধীন আর একটি মন্দির হল কেদার গ্রামের কেদার পাবকেশ্বর শিব মন্দির। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। খাঁটি উড়িষ্যা শৈলীর রেখ দেউলের অনুকরণে নির্মিত মূল মন্দিরটি। উড়িষ্যা মন্দিরের আদর্শ অনুযায়ী এক ক্ষুদ্র জগমোহন এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সঙ্গে প্রবেশ পথের উপরে রয়েছে কালো পাথরে খোদাই প্রায় সাড়ে চারফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এক সুন্দর নবগ্রহফলক। উড়িষ্যার মন্দিরের মতই মূল মন্দিরের তিন দিকের দেওয়ালে রয়েছে পাথরের লম্ফমান সিংহের মূর্তিভাস্কর্য। মন্দিরটি ঝামাপাথরের এবং মন্দিরের ছাদ ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্য অনুসারী ধাপযুক্ত লহরা পদ্ধতির। কেউ কেউ মনে করেন এটি খ্রীষ্টিয় সতের শতকে নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈঘ্যপ্রস্থে সাড়ে তের ফুট। জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সাড়ে ন'ফুট এবং উচ্চতায় মূল মন্দিরটি আনুমানিক চল্লিশ ফুট।[২৪]

দাঁতনের আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস হল বিদ্যাধর পুষ্করিণী। পুষ্করিণীটি দৈর্ঘ্যে ১৬০০ ফুট, প্রস্থে ১২০০ ফুট। রাজা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী বিদ্যাধরের আদেশে এটি তৈরী হয়েছিল। প্রবাদ, বিদ্যাধর দীঘি ও শরশঙ্কের ভেতর পাথরের তৈরী একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। পথটি সাড়ে সাত ফুট উঁচু ও সাড়ে চার ফুট চওড়া। দাঁতন বাজার থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে শরশঙ্ক দীঘি মেদিনীপুর জেলার ভেতর বৃহত্তম ও বাংলার বৃহত্তর দীঘিগুলির অন্যতম। লম্বায়

৫০০০ ফুট, চওড়ায় ২৫০০ ফুট, উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। মেদিনীপুরের ডেবরায় প্রাপ্ত একটি লিপিতে রাজা শশাঙ্ক এটি খনন করেছিলেন বলে কথিত (লিপিটির ঐতিহাসিক তথ্য যাচাই-এর অপেক্ষা রাখে)। অনেকে মনে করেন, শশাঙ্কের রাজত্বের সময় এই অঞ্চলে খরায় জলাভাবে বহু লোক মারা যায়, তাই তিনি তাঁর মায়ের কথায় রাজখরচে এই সরোবরটি খনন করেছিলেন। শরশঙ্ক নিয়ে একটি কৌতূহল-উদ্দীপক প্রবাদ প্রচলিত আছে। 'দ্বাপর যুগে কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের সারথি। গান্ধারীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অস্ত্র ধরবেন না, তবে বাজাবেন অভয় শঙ্খ। তাঁর এই শঙ্খের আওয়াজে মেতে উঠত পাণ্ডব সৈন্য। পাণ্ডবদের জয়ী করেছিল এই শঙ্খই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে পুত্রদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব চলে যান মহাপ্রস্থানের পথে। শ্রীকৃষ্ণ একা, নেই কোন' বন্ধু। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে শ্রীকৃষ্ণ একদিন আসেন একটি সরোবরের তীরে। সরোবরের তীরের অর্জুন গাছে উঠে বিশ্রাম নিতে থাকেন। অঞ্চলটি জরশবরদের দেশ। এক জরশবর সকাল থেকে কোন শিকার না পেয়ে ফিরে আসছিল। সে দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণের পা দু'খানি গাছের উপর দেখে শিকার মনে করে ছুঁড়লো বিষাক্ত তীর। তীর বিঁধলো পায়ে। শ্রীকৃষ্ণ গাছ থেকে অভয় শঙ্খ নিয়ে পড়ে গেলেন। ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাঁর দু'খানি পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বল্লেন— "দুঃখ করে কোন লাভ নেই, তুমি বরং দূরের ঐ শঙ্খটা তুলে নিয়ে এসো।" ব্যাধ শঙ্খ তুলতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ তুলে এনে ভাবলেন কি হবে আর এই শঙ্খের। এই বলে তিনি শঙ্খ বাজাতে শুরু করলেন। তার আওয়াজে চারদিক কেঁপে উঠল। এরপর তিনি শঙ্খটি সরোবরের গভীর জলে নিক্ষেপ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেই থেকে সরোবরের নাম হয় শরশঙ্খ। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন শবরেরা জমায়েত হয় পুকুর পাড়ের এক কোণে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শবদাহ হয়েছিল বলে তারা বিশ্বাস করে। এই উপলক্ষ্যে বর্তমানে একটি মেলাও বসে।[২৫] প্রবাদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে দুটি জিনিষ অনুমান করা যেতে পারে। এক, অঞ্চলটি প্রাচীনকালে শবরদের দেশ ছিল। দুই, শরশঙ্খ দীঘিটি শশাঙ্কের আমলে উৎখনিত নয়, উৎখনিত হয়েছে আরও প্রাচীনকালে। হয়ত মহাভারতের সময়কালে।

দাঁতন থানার মোঘলমারি গ্রামটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসিদ্ধ। দাঁতনের প্রায় দু'মাইল উত্তরে মোঘলমারিতে ইঁটের একটি ভগ্নস্তূপ আছে। তাকে শশীসেনার পাঠশালা বলে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, রাজা বিক্রমকেশরীর কন্যা শশীসেনা বা সখিসেনার সাথে অহিমাণিকের এখানে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। বর্ধমানের কবি ফকিররামের কাব্যে দু'জনের ভালবাসার কাহিনী বিধৃত।

আসলে, শরশঙ্ক দীঘি, বিদ্যাধর পুষ্করিণী ইত্যাদি বিশাল প্রাচীন দীঘি, গড় ও পুরাবস্তুগুলি ইঙ্গিত দেয় এখানকার বিলুপ্ত ঐশ্বর্যের। বৌদ্ধমূর্তিগুলি ও বিভিন্ন বৌদ্ধ নিদর্শন প্রমাণ করে এক সময় এই স্থান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। প্রাচীনকালেই এই

অঞ্চলে ঘটেছিল আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ।

অতীতে দণ্ডভুক্তি বা দাঁতনের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম ছিল না। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার প্রাচীন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রের মধ্যে একটি হল দণ্ডভুক্তি, অন্যটি হল তাম্রলিপ্ত। দণ্ডভুক্তি বাণিজ্যিক খ্যাতি লাভ করে মূলতঃ স্থলপথের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের সাথে দণ্ডভুক্তির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। যে পথ দিয়ে মহাবীর দক্ষিণরাঢ়ে এসেছিলেন ওই পথ দিয়েই বাণিজ্য সম্ভার উত্তরে মগধ, রাজগৃহ, ইত্যাদি অঞ্চলে যেত। আবার দণ্ডভুক্তির উত্তরে বা উত্তর পূর্বদিকে যে জনসংযোগটি ছিল তা জঙ্গল মহালের কিছুকাংশের মধ্য দিয়ে গিয়ে 'মিধুনপুর' বা মেদিনীপুর হয়ে একটি কর্ণসুবর্ণের দিকে ধাবিত হয়েছিল। দণ্ডভুক্তির উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র সমতটের দিকে ধাবিত হয়েছিল। দণ্ডভুক্তির উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যজাত সামগ্রী ছিল চন্দনকাঠ, কাজুবাদাম, শাঁখের তৈরী বিভিন্ন উপকরণ, রেশম, রেশমজাত দ্রব্য, বস্ত্র, শুকনো মিষ্টি, কার্বন, ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারত থেকে বস্ত্র আমদানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সময় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য সম্ভার দণ্ডভুক্তি হয়ে তাম্রলিপ্তে চালান যেত। সেখান থেকে বিদেশে। দণ্ডভুক্তির তৈরী শোলা শিল্পাদি, মিহি চাল, কাঠের তৈরী জিনিসপত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হত। দাঁতনে ছিল পণ্যসামগ্রী কেনাবেচার খোলা বাজার। স্থানীয় সামন্তাধিপতি সোমদত্ত বহিরাগত বণিকদেরজন্য একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করেছিলেন বলে কথিত হয়। দণ্ডভুক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল কুটীরশিল্পের। প্রাচীনকালের গরুর গাড়ী শিল্প আজও দাঁতনের স্থানে স্থানে বিদ্যমান। একদা দাঁতন চিনি শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল। তাছাড়া, কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্‌দা তাম্রপটে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তিমণ্ডলের অন্তর্গত। গ্রামটি দান করা হচ্ছে সমস্ত অধিকার সমেত ; যাঁকে দান করা হচ্ছে তিনিই এর সব কিছু ভোগ করবেন; বাস্তুক্ষেত্র, গর্ত, জলাধার, মার্গ (পথ), পতিত বা অনুর্বর জমি, আস্তাকুঁড় (আবর্জনার স্থান), লবণাকর, সহকার (আম) ও মধুক বৃক্ষের ফল ফুল, অন্যান্য গাছ গাছড়া, হাট, ঘাট, পাড় বা খেয়া ঘাট, ইত্যাদি সমস্তই তাঁর ভোগ্য। ধান্য ও অন্যান্য শস্য, আম্র-মধুক ছাড়া, এখানে আর একটি উৎপন্ন দ্রব্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা হল লবণ। মেদিনীপুর জেলার 'দান্তন' সমুদ্রতীরবর্তী। জোয়ার যখন আসে, তখন সমুদ্রতীরবর্তী অনেক স্থানই নোনা জলে ভেসে ডুবে যায়; বড় বড় গর্ত করে লোকে সেই জল ধরে রাখে, পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে লবণ তৈরী করে।[২২] দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চলে লবণ তৈরীর জন্য অনেক কূপ খনন করা হয়েছিল। এবং লবণের জন্য অনেক গ্রামবাসীকে কূপ খননের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। একাদশ শতকে রাম পালের লেখতে এবং দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার লেখতে এই দানের উল্লেখ দেখা যায়। ইর্‌দা তাম্রপট থেকে আরও জানা যায় যে, দণ্ডভুক্তি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মহুয়ার চাষ হতো। এই মহুয়া গাছের আয় দুপ্রকারের— খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়াজাত আসব হ'তে। এছাড়া, দণ্ডভুক্তির অধিবাসীরা গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নির্মাণ

করতো এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নানা উপকরণ যোগাত।

কিন্তু মধ্যযুগের প্রথম ভাগ থেকে দণ্ডভুক্তি তার সুখ্যাতি হারাতে থাকে। বাণিজ্যিক কেন্দ্রের পতন ঘটে। বণিকেরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়ে। ১৭৫৭ সালের দিকে দাঁতনের বেশ কিছু এলাকা হয়ে ওঠে চোর ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য। পথিকের সর্বস্ব অপহরণ করে তারা পালিয়ে যেত পাশাপাশি ময়ূরভঞ্জ বা নীলগিরি রাজাদের এলাকায়। এছাড়া যেখানে সেখানে জোর জুলুম করে তীর্থকর আদায় করার নামে তীর্থযাত্রীদের যথেষ্ট হয়রাণও করা হ'তো।[২৭]

দণ্ডভুক্তির প্রাচীন গৌরবসূর্য অস্তমিত। বর্তমানের দাঁতন তার কেবল স্মৃতিমাত্র। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনগোষ্ঠী, পুরাবস্তু, ভাষা ও সংস্কৃতি অঞ্চলটিকে একটি আঞ্চলিক বিশিষ্টতা দান করেছে। অঞ্চলটি প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের দ্বারা বার বার পদানত হয়েছে, মুসলমান ও ইংরেজ আক্রমণের তীব্র তাপদাহ সহ্য করেছে, অর্থসম্পদে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু কখনই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় নি। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

আজকের দাঁতন একটি ছোট শহর মাত্র। দাঁতনে রয়েছে থানা, ব্লক অফিস, রেলস্টেশন, কোর্টকাছারী, স্কুল, কলেজ, ইত্যাদি। আশার কথা, দাঁতনের কাছাকাছি অঞ্চলে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।[২৮] খনিজ তেল যদি উত্তোলিত করার সরকারী উদ্যোগ শুরু হয় তাহলে বলা যেতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে দাঁতন তিলোত্তমা নগরী হবে এবং তার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করবে।

চার

মেদিনীপুর জেলা এলাকার ঐতিহাসিক পরিলেখ ও তার বিভাজন প্রতিক্রিয়া

বর্তমানে মেদিনীপুর জেলাকে আমরা যে আকারে দেখি তা অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। মেদিনীপুরকে জেলা হিসাবে কে বা কখন প্রথম ব্যবহার করেছিল এবং তার আকারই বা তখন কেমন ছিল তা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল।
মুসলমান আমলে পশ্চিম ও দক্ষিণ হিজলী সহ প্রায় বর্তমান মেদিনীপুর জেলা অঞ্চল 'সরকার' জলেশ্বর নামে পরিচিত ছিল। সরকার জলেশ্বর আবার আঠাশটি 'মহলে' বিভক্ত ছিল। মোঘল সম্রাটকে বাৎসরিক ১,২৫১,৩১৮ টাকা রাজস্ব প্রদান করতো। এই 'সরকারে'র প্রধান শহর ছিল বর্তমান মেদিনীপুরের প্রতিবেশী জেলা বালাশোর। 'সরকার' জলেশ্বরের আঠাশটি মহল ছিল নিম্নরূপ।

(১) পিপলি শাহ বন্দর (বালাশোর জেলার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর), (২) বালিশাহী বা কালিন্দী বালিশাহী (দক্ষিণ হিজলিতে অবস্থিত), (৩) বানসডিহা বা হপ্ত-চৌর (৫ টি দুর্গ)। জলেশ্বর শহরের কাছাকাছি অবস্থিত, (৪) বালিকটি (বালাশোর জেলায়, (৫) বিরিপদা, (৬) ভোগরাই, (৭) বগড়ী(বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা সংলগ্ন), (৮) বাজার (মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত), (৯) ব্রাহ্মণভূম(উত্তর মেদিনীপুরের একটি রাজস্ব বিভাগ।) (১০) জলেশ্বর, (১১) তমলুক (রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত একটি বৃহৎ পরগনা), (১২) তরকুয়া, (১৩) শোরভূম, (১৪) রামনা ও (১৫) রাইন।[১] অনেকের ধারনা মুসলমান আমলের কোন সময় থেকে মেদিনীপুর জেলার উৎপত্তি হয়েছে। আর বারে বারে বিভিন্ন কারণে এর সীমারেখাও পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি ১৭৬০ সালে ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পরও এই জেলার সীমারেখা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব গোপন সন্ধির শর্তানুসারে ৬,১০২ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট চাকলা মেদিনীপুর ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করে। তখন হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক হুগলী জেলার অধীনে ছিল। পটাশপুর, কামারদিচাউর এবং ভোগরাই মারাঠা শাসনাধীন ছিল। ঘাটাল মহকুমা, গড়বেতা থানা, কেশপুর ও শালবনী থানার কিছু অংশ তখন বর্দ্ধমান জেলার অর্ন্তগত ছিল। বর্তমান মেদিনীপুরের বাকি অংশ, বালাশোরের কিছুকাংশ, সুবর্ণরেখার উত্তরাংশ, সিংভূমের ধলভূম মহকুমা, বরাভূম এবং মানভূম, মানভূমের জঙ্গল

মহল, বাঁকুড়ার ছাতনা ও অম্বিকানগর জঙ্গলমহল নিয়ে মেদিনীপুর জেলা গঠিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে হিজলী, মহিষাদল এবং তমলুক একজন সল্টএজেন্টের অধীন ছিল। অন্যদিকে সদর মহকুমার উত্তরের কিছুকাংশ সহ ঘাটাল মহকুমা বর্দ্ধমান জেলাভূক্ত হয়।[২]

তালিকা —১[৩]

আদেশ বর্ষ	জেলার এলাকা পরিবর্তন	মানচিত্র নির্দেশ (+) অথবা (–)			মন্তব্য পরিবর্তনের সূত্র ও কারণ
		রাজস্ব	দেওয়ানী	ফৌজদারী	
১৭৯৩	বর্দ্ধমান থেকে ৬টি জঙ্গল মহল বের করে মেদিনীপুরের সাথে যুক্ত করা হয়।	+৯	—	+ ৯	সীমান্ত উপজাতিদের আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য। গভর্নর জেনারেলের আদেশ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩
১৭৯৫	বর্দ্ধমান থেকে বগড়ী (থানা গড়বেতা) বিযুক্ত করে মেদিনীপুরের সাথে যুক্ত করা হয়।	—	+ ৮ (+মানচিত্র ক-এর১৭)	+৮ (+মানচিত্র ক-এর১৭)	প্রশাসনিক সুবিধা। ১৭৯৫ সালের ৩৬ নং রেগুলেশন।
১৮০০	পরগণা ব্রাহ্মণভূম, বগড়ীর অংশ বিশেষ বিযুক্ত না করে, চিতুয়া পরগণার অংশবিশেষ রূপনারায়ণের দক্ষিণস্থ তরফ দাসপুর হুগলী জেলা থেকে বিযুক্ত করা হয়।	—	+ ৭ (+১৩ +১৪ মানচিত্র ক-এর।)	+৭ (+১৩ + ১৪ মানচিত্র ক-এর।)	হুগলীতে অত্যধিক প্রশাসনিক কাজের চাপ। ২৭ শে নভেম্বর,১৮০০-র নির্দেশনামা।
১৮০১	বর্দ্ধমান থেকে বগড়ী (রাজস্ব) স্থানান্তরিত হয়।	+৮ (+১৭ মানচিত্র ক-এর	—	—	প্রশাসনিক সুবিধা। ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮০১ -এর নির্দেশনামা।
১৮০৩	মেদিনীপুর ম্যাজিস্ট্রেসীর সাথে যুক্ত হয় মারাঠা-দের ৩টি পরগণা; পটাশপুর, ভোগরাই এবং কামারদিচাউর।	+ ৪ + ৫	—	+ ৪ + ৫	বিজয়ের মাধ্যমে। ১৮০৫-র ১৩ এবং ১৪ নং রেগুলেশন দ্রষ্টব্য।

আদেশ বর্ষ	জেলার এলাকা পরিবর্তন	মানচিত্র নির্দেশ (+) অথবা (–)			মন্তব্য পরিবর্তনের সূত্র ও কারণ
		রাজস্ব	দেওয়ানী	ফৌজদারী	
১৮০৫	সাতটি জঙ্গল মহল (চাতনা, বরাভূম, মানভূম, শ্রীপুর, আমিনগর,সিমলাপাল, ভেলিয়াডিহি) জঙ্গল মহল জেলার সাথে যুক্ত করা হয়।	—	—	– ৯ – ১১	সীমান্তের বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং চোয়াড়দের আকস্মিক আক্রমণ। ১৮০৫ সালের ১৮ নং রেগুলেশন।
১৮০৬	৩ টি স্কুল মারাঠা পরগনা হিজলী সল্টএজেন্সীর সঙ্গে সুযুক্ত হয়।	–৪ –৫	—	–৪ –৫	প্রশাসনিক সুবিধা।
১৮০৯	জঙ্গল মহলের রাজস্ব সংগ্রহ যা এতদিন মেদিনীপুর ও বীরভূমে করা হচ্ছিল তা বর্দ্ধমানে স্থানান্তরিত করা হল এবং বাঁকুড়াতে সদর কার্য্যালয় করে একজন রেজিস্ট্রার টু দ্য ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।	–৯ –১১	—	—	ব্যয়সঙ্কোচ। ২৩ শে জানুয়ারী, ১৮০৯ -এর নির্দেশনামা।
১৮১৫ - ২৪	পরগণা বগড়ীকে একজন কমিশনারের অধীনে অস্থায়ীভাবে আনা হয়।	–৮ –৮ –৮	–৮ –৮ –৮	–৮ –৮ –৮	সীমান্ত উপজাতিদের অনুপ্রবেশের জন্য পরীক্ষা -মূলক ব্যবস্থা।
১৮১৫ - ২৯	একজন জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বাধীন দায়িত্ব দিয়ে দক্ষিণ মেদিনীপুরে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়।			–১ –২ –৩ –৪	ফৌজদারী ও পুলিশ প্রশাসনের উন্নতির জন্য। ২৯ শে মে, ১৮২৯-এর নির্দেশবলে অবলুপ্ত।

আদেশ বর্ষ	জেলার এলাকা পরিবর্তন	মানচিত্র নির্দেশ (+) অথবা (–)			মন্তব্য পরিবর্তনের সূত্র ও কারণ
		রাজস্ব	দেওয়ানী	ফৌজদারী	
১৮২৯	সারা জেলার জন্য একজন পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।	—	—	—	ফৌজদারী ও পুলিশ প্রশাসনের উন্নতির জন্য। ২৯ শে মে, ১৮২৯-এর নির্দেশবলে অবলুপ্ত।
১৮৩৩	ধলভূমকে সংযুক্ত করা হয় দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার এজেন্সীর সঙ্গে।	—	—	--১০	ফৌজদারী ও পুলিশ প্রশাসনের উন্নতির জন্য। ১৮৩৩ সালের ১৩ নং রেগুলেশন।
১৮৩৪	মেদিনীপুরের সঙ্গে হিজলীকে সংযুক্ত করা হয়।	+ ৩ +৪ +৫	+ ৩ +৪ +৫	+ ৩ +৪ +৫	প্রশাসনিক কাজের স্বল্পতা। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৩৪ এর নির্দেশনামা।
১৮৩৭	পরগণা ভোগরই, কামার্দিচাউর এবং শাভাগুারকে বালাশোরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।	--২ --৪	--২ --৪	--২ --৪	প্রশাসনিক সুবিধা। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭ সালের নির্দেশনামা।
১৮৭২	ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা হুগলী থেকে সরিয়ে মেদিনীপুর জেলার সাথে যুক্ত করা মানচিত্র হয়।	+৭ (+১৩ +১৪ ক-এর)			প্রশাসনিক সুবিধা। ১৭ ই জুন, ১৮৭২ সালের বিজ্ঞপ্তিপত্রানুসারে।

১৮৭২ সাল থেকে মেদিনীপুর জেলা মোটামুটিভাবে বর্তমান আয়তন লাভ করে। বর্তমানে বর্দ্ধমান বিভাগের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবাংলার সর্বাপেক্ষা

বৃহৎ ও জনবহুল জেলা। সমগ্র ভারত উপমহাদেশে জনসংখ্যার দিক থেকে এই জেলা প্রথম স্থানাধিকারী। মেদিনীপুর জেলার আয়তন ১৪,০৮১·০০ বর্গ কিলোমিটার এবং এর জনসংখ্যা ৮,৩৩১, ৯১২[৫]। আয়তনে ও জনসংখ্যার দিক থেকে এই জেলা ভারতের সাতটি ইউনিয়ন শাসিত রাজ্য ও নয়টি রাজ্যের সাথে তুলনীয়।[৬] আলোচনার সুবিধার্থে আবার উল্লেখ করা যেতে পারে যে- এই জেলার উত্তরে অবস্থিত বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা, উত্তর পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা, পূর্বে হাওড়া ও দক্ষিণ পূর্বে চব্বিশ পরগনা। (পূর্বের হুগলী ও তার শাখা নদী রূপনারায়ণ এই জেলাকে হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনা থেকে পৃথক করেছে) জেলার দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে উড়িষ্যার বালাশোর ও ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং বিহারের ছোটনাগপুরের সিংভূম ও মানভূম জেলা।[৮] ১৮৭২ সাল থেকে নতুন মহকুমা গঠন ও বিভিন্ন মহকুমার পরিবর্তন হলেও বর্তমান মেদিনীপুরের চতুঃসীমা প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে।

১৯০৬ সালে মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা ছিল ২৭,৮৯,১১৪ জন। এর আয়তন ছিল ৫,৪৪৫ বর্গ মাইল। ১৯০৬ সালের আগেথেকেই বৃটিশ সরকার মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের কথা মাঝে মাঝে উত্থাপন করতো। যেমন বর্তমানে মাঝে মাঝে বিভাজনের কথা শোনা যায় এবং তা অনেক কাল ধরেই। পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলা যা মেদিনীপুরের থেকে আয়তনে ও লোকসংখ্যায় অনেক কম স্বাধীনতার পরে বিভাজিত হয়েছে। কিন্তু মেদিনীপুর জেলা আজও অবিভাজিত রয়েছে। সে যা হোক, প্রথমে মেদিনীপুর জেলাকে দ্বিখন্ডিত করে হিজলী জেলা গঠন করা হবে বলে বৃটিশরা পরিকল্পনা করে। এই হিজলী বঙ্গোপসাগর উপকূল সংলগ্ন এক সময়ের সামুদ্রিক বন্দর। প্রশাসনিক কাজকর্মও চলেছে এখান থেকে। ইংরেজরা প্রস্তাবিত হিজলী জেলার সদর কার্য্যালয় হিসাবে কাঁথিকে নির্দিষ্ট করে। পরে এই পরিকল্পনা বাতিল করে খড়গপুর সংলগ্ন হিজলীকে নতুন জেলার সদর কার্য্যালয় করা মনস্থ করে। কিন্তু স্থানীয় জনগণ এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করায় ভারত সরকার সাময়িকভাবে মেদিনীপুর শহরেই নতুন জেলার সদর কার্য্যালয় খোলার প্রস্তাব দেয়।[৭] কিন্তু বাংলার বৃটিশ সরকার এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায় এবং নতুন জেলার জন্য হিজলী যাতে সদর কার্য্যালয় হয় তারজন্য জোরদার দাবী পেশ করে।[৮]

১৯০৬ সালের ৩০ শে জুন কার্লাইল একটি পত্রের মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু এই বিভাজনের মূল রূপকার (Engineer) ছিলেন বঙ্গ বিভাজনে লর্ড কার্জনের মূল পরামর্শদাতা বাংলার গর্ভনর এ্যান্ডরুজ ফ্রেজার।[৯] বাংলার বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারত সরকারের কাছে পরিকল্পনাটি ১৯০৬ সালে, পরে ১৯১১, ১৯১৩ এবং ১৯২১ সালে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়।

বঙ্গভঙ্গের মত মেদিনীপুর ভাঙ্গের জন্য প্রশাসনিক সুবিধার কথা তোলা হয়। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার যে বহুবার অঙ্গচ্ছেদ বা অঙ্গ সংযোজন হয়েছে তার কথাও বলা হয়। বলা হয় ৫,৪৪৫ বর্গ মাইল আয়তন ও ১৭,৮৯,১১৪ জনসংখ্যা

বিশিষ্ট বিশাল মেদিনীপুর জেলাকে কেবলমাত্র মেদিনীপুর শহর সদর দপ্তর থেকে ঠিকমত শাসন করা সম্ভব নয়। তাই শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে মেদিনীপুর বিভাজন একান্ত বাঞ্ছনীয়।[১০]

বিভাজনের পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ :

প্রস্তাবিত মেদিনীপুর জেলা	বর্গমাইল আয়তন	লোকসংখ্যা
১. মেদিনীপুর সদর মহকুমা (মেদিনীপুর, শালবনী,গড়বেতা, কেশপুর ও ডেবরা থানা সমন্বিত)।	১,০৭৯	৪,১৪,২৫৮
২. ঝাড়গ্রাম নামে একটি নতুন মহকুমা গঠন করা হবে যার মধ্যে থাকবে ঝাড়গ্রাম, বিনপুর ও গোপীবল্লভপুর অঞ্চল সমূহ।	১,২৩৭	৩,৭২,৭৯৩
৩. ঘাটাল মহকুমা যার মধ্যে থাকবে ঘাটাল চন্দ্রকোণা দাশপুর থানাসমূহ।	৩৭২	৩, ০১,৩৯৬
মোট	২,৬৮৮	১,০৮৮,৪৪৭

প্রস্তাবিত হিজলী জেলা	বর্গমাইল আয়তন	লোকসংখ্যা
১. হিজলী সদর মহকুমা যার মধ্যে থাকবে খড়্গপুর, সবং, নারায়ণগড় ও দাঁতন থানা সমূহ।	৯৫৪	৫,১৩,০২৯
২. কাঁথি মহকুমা (কাঁথি, এগরা, পটাশপুর, ভগবানপুর, খাজুরী ও রামনগর থানা)	৮৪৯	৬১৮,২২৩
৩. তমলুক মহকুমা য়ার মধ্যে থাকবে তমলুক, পাঁশকুঁড়া, মহিষাদল, সূতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানাগুলি।	৬৫৪	৬০১,৫০২
মোট	২,৪৫৭	১৭,৩২,৭৫৪

বাংলার বৃটিশ সরকারের মতে, প্রস্তাবিত বিভাজনে জেলা দুটির আয়তন যথাযথ (Suitable) হবে এবং অনেক প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করা সম্ভব হবে। তমলুক, কাঁথি ও ঘাটাল এই তিনটি মহকুমার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। আয়তন ও জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকছে এবং জেলার সদর কার্য্যালয়গুলি এমন জায়গায় থাকছে যেখান থেকে জেলার যে কোন প্রত্যন্ত

অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্যান্য জেলার তুলনায় প্রস্তাবিত হিজলী জেলা আটটি জেলার থেকে বড় থাকবে এবং নতুন মেদিনীপুর জেলা বারটি জেলার চেয়ে বড় থাকবে।

জনসংখ্যার বিচারে মেদিনীপুর জেলা আটটি অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বড় থাকবে এবং হিজলী জেলার লোকসংখ্যা আঠারোটি জেলার চেয়ে বেশী থাকবে।[১১] সংক্ষেপে দুটি জেলাই প্রায় একই আয়তনের হবে। মেদিনীপুর জেলার লোক সংখ্যা হবে দশ লক্ষের কিছু বেশী।

প্রস্তাবিত হিজলী জেলা গঠনের জন্য বৃটিশ সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার হিজলীতে আট হাজার জমি ক্রয় করে।[১২] নতুন জেলা গঠনের প্রারম্ভিক কাজের জন্য আট লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৩] খড়গপুর সংলগ্ন হিজলীতে কিছু প্রশাসনিক গৃহ নির্মাণ শুরু হয়।[১৪] বিশুদ্ধ পানীয় জল, আলো ও পাখার সাময়িক ব্যবস্থা করা হয় হিজলীতে।[১৫] হিজলীর ভিতরে ও আশে পাশে নতুন রাস্তা নির্মাণ শুরু হয় এবং সাময়িকভাবে একটি পুলিশ থানাও চালু হয়। নতুন জেলার জন্য একজন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। আলোচনার পরে ঠিক হয় আপাততঃ মেদিনীপুরের সিভিল সার্জেনই নতুন হিজলী জেলার মেডিক্যাল অফিসাররূপে কাজ করবেন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে হিজলী পরিভ্রমণ করবেন। এছাড়া, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের খড়গপুর হাসপাতালের ইউরোপীয় ডাক্তাররা সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।[১৬] এর ফলে প্রচুর আর্থিক সাশ্রয় হবে। প্রশাসনিক ভবনসমূহ নির্মাণের জন্য হিজলীর নিকটে ইঁট তৈরী শুরু হয়। ১৯১৯ সালের প্রাদেশিক বাজেটে নতুন জেলার গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয় এবং বাংলা সরকার এও আশা করে যে, ১৯১৯ সালের ১ লা এপ্রিলের মধ্যে নতুন হিজলী জেলা ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার পরিপূর্ণ প্রশাসনিক কাজ শুরু করা যাবে।[১৭] সংক্ষেপে, নতুন হিজলী জেলা চালু করার জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ভারত সচিব ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসের একটি চিঠির মাধ্যমে প্রস্তাবিত মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে।[১৮]

নতুনজেলার নামকরণ নিয়ে মতানৈক্য চলেছিল অনেকদিন ধরে তারও শেষ হল। কার্লাইলের প্রস্তাবকে সমর্থন করে গভর্ণর-ইন-কাউন্সিল। ঠিক হয় নতুন জেলার নাম হিজলীই হবে। এবং এই জেলার সদর শহর হবে হিজলী।[১৯] তবে বাংলা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী এ.ক্যাসেল বর্দ্ধমানের কমিশনারকে জানান যে, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমার প্রশাসনিক গৃহসমূহ অবিলম্বে সমাপ্ত করতে হবে। আর যথাসম্ভব কম খরচে সত্বর নতুন হিজলী জেলার সদর কার্য্যালয়ের কাজ শেষ করতে হবে। দেরী হলে টাকার অভাবে হয়তো আর কাজ করানো যাবে না। পরিকল্পনাটি মুলতুবী রাখতে হবে।[২০]

উল্লেখ্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বৃটিশ সরকার প্রচার করেছিল যে তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা এত জনবহুল ও আয়তনে এত বিশাল যে একজন জেলা শাসকের পক্ষে ঠিকমত শাসন

করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই জেলাটি বিভাজন করা জরুরী হয়ে পড়ছিল। আসলে প্রচারটি ছিল অসত্য। কারণ ১৮৭২ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল ছিল। বরং ১৯১১ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে জেলার জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ৩,৭৭৫ জন।[২১] তাছাড়া, এনড্রিউ ফ্রেজারের পূর্বে কোন ইংরেজ এ ধরনের প্রচন্ড অসুবিধার কথা বলে নি। বলা বাহুল্য, প্রাক বৃটিশ যুগে এলাকাটি সুশাসিত ছিল। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কোন শাসকই প্রশাসনিক সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। তবে মেদিনীপুরে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অত্যাচার ও অবিচারের শিকার হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে স্থানীয় জনগণ। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জেলা বিভাজন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একথা ঠিক নয়।

১৮৫৪ সালে হেনরী রিকেট মেদিনীপুর জেলার আয়তন ৫,০৩১ বর্গমাইল বলে উল্লেখ করেন। ১৭৬০ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত জেলার আয়তনের পরিবর্তন ছিল নিম্নরূপঃ

বৎসর	আয়তন (বর্গমাইল)	বৎসর	আয়তন (বর্গমাইল)
১৭৬০	৬,১০২	১৯০১	৫,১৮৬
১৮৭২	৫,০৮২	১৯১১	৫,১৮৬
১৮৮১	৫,০৮২	১৯২১	৫,০৫৫
১৮৯১	৫,১৪৫		

তাছাড়া, বহুদিন ধরে এই জেলা ছিল স্বল্পবসতি অঞ্চল। ১৮৭২ সালের আদমশুমার অনুযায়ী মেদিনীপুরে প্রত্যেক বর্গমাইলে জনঘনত্ব ছিল ৪৮৫ জন। আর ১৯০১ থেকে ১৯১০ মধ্যে এর জনঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ জনের সামান্য কিছু বেশী। দশকের পর দশক ধরে এই জেলার জনঘনত্ব প্রায় একই থেকেছে।[২২] অথচ এই জনসংখ্যা ও আয়তনের জন্য প্রশাসনিককোন অসুবিধার কথা জানা যায় নি, বিশেষতঃ ১৯০৫ সালের পূর্বে। সুতরাং প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করার জন্য নতুন হিজলী জেলা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল একথা সম্ভবত অসত্য।

মেদিনীপুরের জনগণ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে এই জেলার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করার জন্য এবং মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক শক্তিকে বিভাজিত করার জন্য এটি বৃটিশ সরকারের কূট পদক্ষেপ।[২৩] তাছাড়া, স্বদেশী আন্দোলন চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিভেদকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসছিল। মেদিনীপুর সত্যেন বোস, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, জ্ঞানেশ চন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, অরবিন্দ ঘোষ ইত্যাদি চরমপন্থীদের ঘাঁটি হয়েছিল। মেদিনীপুরের কৃষকরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেছিল। অথচ সারা বাংলায় এই আন্দোলনে মূলতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল। মেদিনীপুর জেলার জমিদাররা, বিশেষতঃ নাড়াজোল ও মুখবেড়িয়ার জমিদার স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। জেলার একমাত্র শিল্পাঞ্চল খড়গপুরের রেল

শ্রমিকরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে হরতাল করছিল ১৯০৬-৭ সাল থেকেই।[২০] মেদিনীপুরবাসীর বিদ্রোহী চরিত্র জেলাকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করেছিল। জেলায় বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। ১৭৬৭-'৮৩ সালের প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ, ১৮০০ সালের দ্বিতীয় চোয়াড় বা পাইক বিদ্রোহ, ১৮০৬-'১৬ সালে বগড়ীর নায়েক বিদ্রোহ বৃটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তুলেছিল।[২১] ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাড়গ্রাম, ঘাটশীলা, বীনপুর ইত্যাদি অঞ্চলের নায়েকরা অসামরিক বিদ্রোহ (Civilian revolt) সংঘটিত করেছিল। এই জনগণই ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল।[২২] বৃটিশ সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের মনে হয়েছিল মেদিনীপুর জেলাকে দ্বিখন্ডিত না করলে সরকার বিদ্রোহ ও সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। অন্ততঃ বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করতে পারবে না। অবিভক্ত মেদিনীপুর বিদ্রোহের স্থায়ী সমস্যার আধার। তাই এই জেলাবাসীর আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য প্রশাসনিক অজুহাত দেখিয়ে মেদিনীপুরকে বিভক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেছিল। বঙ্গভঙ্গের মত বিভাজন ও শাসন নীতিকেই এখানে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।[২৩]

মেদিনীপুরের জনগণ বৃটিশ সরকারের কূট অভিসন্ধি ধরে ফেলে। জনগণ অভিযোগ করে যে—যেভাবে মেদিনীপুরকে দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টা চলছে তাতে জেলাবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়গুল ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকে মেদিনীপুরবাসীর মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছে— তাকে একটি সরলরেখার দ্বারা দ্বিখন্ডিত করে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। অথচ বছরের পর বছর জেলার ঐক্য বা সংহতি অক্ষুন্ন রয়েছে। দিল্লী ও বাংলার বুকে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে আবার ধ্বংসও হয়েছে। কিন্তু মেদিনীপুরে সংহতি ও ঐক্য থেকেছে অটুট। জেলার জনগণ সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থেকেছে।[২৪] মহিষাদলের রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ তাই মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করে বলেছেন," The post history of Midnapore brings to light the fact that it has always been one of the best administered districts in Bengal." অনুরূপ মন্তব্য জেলার আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি করেছেন-—জেলা প্রশাসনের কাছে মতামত জ্ঞাপনের সময়।

জেলা বিভাজনের সুবিধা অসুবিধা কিংবা পক্ষে বা বিপক্ষের কথা বাদ দিলেও মেদিনীপুর বিভাজনের জন্য বৃটিশ স রকার যে সময়টিকে বেছে নিয়েছিলেন তা উপযোগী ছিল না। কারণ প্রথমত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এই জেলাবাসীকে মেদিনীপুর বিভাজনের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল। ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গরদ তাদের বলিষ্ঠতা দান করেছিল। আর ইউনিয়নবোর্ড বর্জন আন্দোলন তাদের ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের যা কিছু দুর্বলতাকে সবেগে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

মেদিনীপুর জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্য বাংলার শাসনসংক্রান্ত কমিটি একটি কার্যসূচী রচনা করেছিল এবং এরই প্রত্যুত্তরে অ্যানি বেসান্ত কংগ্রেসে যোগদান করে মেদিনীপুর পরিদর্শন করলেন এবং জেলাটিতে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শিবিরগুলিতে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে যে নীরবতা দেখা দিয়েছিল তা জনপ্রিয় বৃটিশবিরোধী, জেলা বিভাগ-বিরোধী এবং অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য কারিগরী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদান ও কৃষিকার্যের উদ্বৃত্ত মূলধনের সাহায্যে শহরাঞ্চলে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজে কংগ্রেস কর্মীদের উৎসাহিত করেছিল।[২৯]

১৯২০ সালে মেদিনীপুরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার নানা প্রান্তের মানুষ এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি হয়ে আসেন। সম্মেলন থেকে গান্ধীজী আহুত অসহযোগ আন্দোলনকে যেমন স্বাগত জানানো হল, তেমনি মেদিনীপুর বিভাজনের সরকারী পরিকল্পনাকে নিন্দা করা হ'ল।[৩০] তথাপি মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

কিন্তু নতুন জেলা গঠনের জন্য এ সময় আরও ৭,২৫,০০০ টাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টাকা বরাদ্দর বিষয়টি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ওঠে। কিন্তু ৫৮/৩২ ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। পরে গভর্ণর সরকারী অনুদানের বিষয়টি পুনরানয়ন করেন। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস গভর্ণর তথা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে। এবং অবিলম্বে যাতে পরিকল্পনাটি স্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত হয় তারজন্য সোচ্চার হয়। অন্যদিকে সরকার পক্ষ জেলা বিভাজনের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া বাড়তে থাকে। মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করার বৃটিশ পরিকল্পনাকে নিন্দা করার জন্য পরিবর্তনকামী তরুণসম্প্রদায় মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের বাধ্য করে। তারা স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে। শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ব্যাপক বৃটিশবিরোধী প্রচার শুরু করে যার ফলে মধ্যপন্থীদল ক্ষুণ্ণ হয়। সূতীবস্ত্র তৈরীর পরিকল্পনায় চরকার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে মেদিনীপুর বিভাগ বিরোধী আন্দোলন সৃষ্ট হয়। লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে নেতৃবৃন্দ জনগণের সান্নিধ্যলাভ করল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে গান্ধীজী এই আর্থনীতিক পরিকল্পনাগুলিকে যথার্থ রূপ দিয়েছিলেন।[৩১]

অনেক টালবাহানা, আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের পর বৃটিশ সরকার প্রথমে ঘোষণা করে যে প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে মুলতবী রাখা হল। শেষ পর্যন্ত সরকার বিতর্কিত পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়ায়।[৩২] ১৯২১ সালেই পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হয়। অন্ততঃ নতুন হিজলী মহকুমা গঠনের কথা তারা যে ভেবেছিল তা থেকেও তারা পিছু হটে। কেবল ১৯২২ সালের জানুয়ারীতে

আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের একাংশ নিয়ে ঝাড়গ্রাম মহকুমার সৃষ্টি করে। এই নতুন মহকুমাটি সৃষ্টি করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সরকারের। কারণ এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা বিগত প্রায় বিশ বছর ধরে জেলাপ্রশাসনের নিদ্রাকেড়ে নিয়েছিল— ইংরেজ সরকারের স্থায়ী সমস্যা ও আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং একথা বলা বোধকরি সঙ্গত হবে যে মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের পরিকল্পনা ছিল বাইরে প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাত। কিন্তু আসলে প্রশাসনিক অজুহাতে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী মেদিনীপুরকে বিভাজিত করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করতে চেয়েছিল ইংরেজ সরকার। স্বাভাবিকভাবেই জেলার জনগণ ইংরেজদের এই চক্রান্ত বুঝতে পারে এবং প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের এই হীন উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে।

মেদিনীপুর ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক রূপ পেয়েছিল জেলাবাসী, তৎসহ প্রদেশের জনগণের ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদির শ্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে জেলাবিভাজন কর্মধারার মধ্য দিয়ে। জেলায় ইংরেজদের ব্যবসা অত্যন্ত ক্ষতির কবলে পড়ে। তবে উল্লেখ্য এই যে মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের বিরূদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে জেলার সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। জেলার সদর কার্য্যালয় মেদিনীপুর শহর না হিজলী হওয়া যুক্তিসঙ্গত এ নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যথা ছিল না। যদিও অল্পসংখ্যক কৃষক জমিদারদের নির্দেশে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোথাও কোথাও প্রস্তাবিত বিভাজনের বিরূদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। পরিকল্পনার বিরূদ্ধে মূল বাধা এসেছিল প্রধানতঃ উকিল, জমিদার ব্যবসায়ী ইত্যাদির কাছ থেকে। কারণ মেদিনীপুরের কেরাণীবাবুদের ভয় ছিল তাদের চাকরী যাওয়ার কিংবা নতুন জেলায় বদলী হওয়ার। সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু জমিদারদের আশঙ্কা ছিল দুটি জেলা গঠন হলে তাদের দুটি জেলার জমিজমার দেখাশোনার জন্য পৃথক দালাল, উকিল ইত্যাদি নিয়োগ করতে হবে। তাতে তাদের খরচ বাড়বে। মেদিনীপুরের উকিলদের মনে হয়েছিলনতুন জেলা গঠিত হলে তাদের আয় কমে যাবে। মেদিনীপুর শহরের ব্যবসায়ীদেরও ভয় হয়েছিল তাদের লাভ কমে যাবে। শহরে পূর্বের মত লোক সমাগম হবে না। তাই জমিদার, উকিল, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মধ্যবিত্তরাই এই আন্দোলনে মূল ভূমিকা নিয়েছিল। সে যাই হোক জেলা বিভাজনকে কেন্দ্র করে জেলায় যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন চলেছিল তাতে মজবুত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। যদিও এই বিভাজনবিরোধী সংগ্রামে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়নি দরিদ্র কৃষক, খড়গপুরের রেল শ্রমিক তথা সাধারণ মেদিনীপুরবাসী।

পাঁচ

মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণি
ও
কৃষক বিদ্রোহ

পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজোদ্দৌলা চক্রান্তের স্বীকার হয়ে সিংহাসন হারালে কিছু কালের জন্য নবাব হয়েছিল মীরজাফর ও মীরকাশিম। নবাব মীরকাশিম মসনদে বসার বিনিময়ে, রাজকোষ শূন্য দেখে, নগদ টাকার পরিবর্তে ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে তিনটি জেলার রাজস্ব সংগ্রহ করার ভার ছেড়ে দেন তার একটি হল মেদিনীপুর। মুনাফাখোর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সর্বশক্তি নিয়োগ করল যেন-তেন প্রকারে যতটা বেশি সম্ভব রাজস্ব সংগ্রহ করতে । ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালে রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে আসার পর দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে তাদের শাসন ও শোষণকে আরও বলবৎ করতে চাইল। ১৭৬৬ সালেই ইংরেজরা ঘোষণা করল যে সারা মেদিনীপুর জেলায় যে সমস্ত ছোট বড় জমিদার আছে সবাইকে বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে হবে এবং এ সমস্ত জমিদারদের কোন প্রজাই আর নিষ্কর জমি ভোগ করতে পারবে না। তাদের সবাইকে রাজস্ব দিতে হবে। অথচ এ সমস্ত প্রজারা তাদের জমিদার কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বহুদিন ধরে নিষ্কর জমি ভোগ করে আসছিল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর জমিদারদের ও পাইকদের সামান্য অধিকারের অবলুপ্তি ঘটে। তার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ঘোষিত হল, যে সমস্ত জমিদার নির্দ্ধারিত রাজস্ব নির্দ্ধারিত দিনে দিতে পারবে না—তাদের জমিদারী এমন কি বাসগৃহও সূর্যাস্তের পর নিলামে তোলা হবে। এর ফলে বহু পুরানো জমিদার জমিদারী হারালো। তাদের সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের হস্তগত হল। এ সমস্ত জমিদারের প্রজারাও নিষ্কর জমি ভোগ দখলের অধিকার হারাল। কারণ অভ্যন্তরীন শাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিগ্রহণ করায় জমিদারদের পাইক রাখা নিষিদ্ধ হয় এবং সমস্ত জমিজমা কোম্পানীর অধিকারের অন্তর্ভূক্ত হয়। এর ফলে জঙ্গলমহালের স্থানীয় জমিদারেরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গঠিত হতে শুরু করল। বলপূর্বক সংগৃহীত রাজস্বে কাঁচামাল খরিদ করে বৃটেনের কলকারখানায় প্রেরণ করে কোম্পানীর কর্মচারীরা দু-দিক দিয়ে

লাভবান হলো। এক, তাদের স্বদেশের শিল্প বিপ্লব সংগঠনে ভারত থেকে প্রেরিত কাঁচামাল অত্যন্ত সহায়ক হলো; দুই, তাদের ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের পরিমাণ অকল্পনীয় হল। অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আদিম অধিবাসী, যাদের ব্রিটিশরা বলত অসভ্য, চোয়াড় প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ করল ইংরেজদের চরম শোষণ ও নির্যাতন। তাদের আজন্ম অধিকারের জমি কেড়ে নিয়ে ইংরেজরা চড়া রাজস্বে অন্য জমিদারের কাছে বিক্রি করে দিল। এর ফলে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার সাধারণ কৃষক তাদের 'পাইকান জমি' ও অন্যান্য জমি, ঘরবাড়ী হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সরল সাদামাটা কৃষকদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। শুধু কৃষকরা (চোয়াড়) নয়, ঐ সময় বিক্ষোভ গাঢ়তর হতে থাকে নাড়াজোল, রামগড়, ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম, লালগড়, শিলদা, জামবনী, গড়বেতার জমিদার তথা রাজা ও কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির মনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকবিদ্রোহের নেত্রী শিরোমণি ছিলেন মেদিনীপুর জমিদারীর শেষ রাজা অজিত সিংহের পত্নী এবং শিবায়ন কাব্য রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পৃষ্ঠপোষক, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জমিদার যশোবন্ত সিংহের পুত্রবধূ। অজিত সিংহের মৃত্যুর পর নিঃসন্তান বিধবা দুই রাণী যথাক্রমে রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণি মেদিনীপুর জমিদারীর অধিকারিণী হন। তাঁরা যৌথভাবে জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব দেন নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খানকে। উল্লেখ্য, বহুদিন নাড়াজোল মেদিনীপুর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। মেদিনীপুরের জমিদার বংশের অন্যতম আবাসস্থল ছিল নাড়াজোল। অন্য দুটি ছিল মেদিনীপুর শহরের অতি সন্নিকটে আবাসগড় ও মেদিনীপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে কর্ণগড়। মেদিনীপুরের জমিদাররা অধিকাংশ সময়ই কর্ণগড়ে থাকতে পছন্দ করতেন দুটি কারণে। এক, কর্ণগড়টি তাঁদের জমিদারীর প্রায় মধ্যস্থলে। দুই, অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে আবৃত হওয়ায় আত্মরক্ষার সুবিধা ছিল। তাই মেদিনীপুরের জমিদারই কর্ণগড়ের জমিদার রূপে সুবিদিত হতে থাকেন। এই কর্ণগড়েই রাণী ভবানীর মৃত্যু হয় (১৭৬০)। ফলে মেদিনীপুর জমিদারীর সমস্ত প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়ে শিরোমণির উপর। রাণী ভবানীর মৃত্যুর পর তাঁর অংশ মত জমিদারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হলেও শিরোমণির জমিদারী অটুট থাকে। তিনি পূর্বের মত নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খানের সাহায্য নিয়ে জমিদারী চালাতে থাকেন।[১] তখনকার দিনে বড় বড় জমিদারদের প্রজারা 'রাজা' বলে সম্বোধন করতো। মেদিনীপুরের প্রায় প্রত্যেক জমিদারকে রাজা বলা হতো। এই কারণে জমিদার পত্নী শিরোমণিও 'রাণী' রূপে সম্মানিতা হতে থাকেন।[২]

জঙ্গলমহালের নিম্নবর্ণের বিদ্রোহ, যা সাহেবদের ভাষায় চোয়াড় বিদ্রোহ বলে পরিচিত, জে. সি. প্রাইসের একটি রিপোর্টে উল্লিখিত। জে. সি. প্রাইস ছিলেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন পদস্থ কর্তা। তিনি মেদিনীপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার থাকা কালে চোয়াড় বিদ্রোহ সম্বন্ধে সরকারি কাগজপত্র ঘেঁটে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন। ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করা

হয়েছে যে—চোয়াড় বিদ্রোহের জন্য মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেব রাণী শিরোমণির গতিবিধি সন্দেহ- জনক মনে করছেন। তিনি নাড়াজোলের জমিদারের আত্মীয় চুনিলালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চোয়াড় বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে পারেন বলে সন্দেহ করা হয়। ফলে কালেক্টর সাহেব রাণীকে 'সংরক্ষিত ' করার জন্য একদল সিপাই পাঠানো দরকার বলে সুপারিশ করেন। কালেক্টর সাহেবের মতে, রাণীকে বাগে আনার এটিই ছিল অন্যতম পথ। রাণীকে চুনীলালের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে না রাখলে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। গোটা দেশে অশান্তি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা হয়। গুপ্তচর মারফৎ কালেক্টর সাহেব জানতে পারেন যে—চোয়াড়দের একটি বিরাট দল রাণী শিরোমণির আশ্রিত ছিল এবং তারা পারস্পরিক পরামর্শের জন্য রাণীর কেল্লায় গোপনে যাতায়াত করত। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য নাড়াজোল থেকে রাণীর কেল্লায় চারটি গরুর গাড়িতে করে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে আসা হয়। রাণীর কাজকর্ম সম্বন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভীর সন্দেহ দেখা যায়। রাণী শিরোমণি সহ জঙ্গলমহালের সমস্ত জমিদারকে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন কোন ভাবেই চোয়াড়দের আশ্রয় বা সাহায্য না করে। অন্যদিকে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয় চোয়াড়দের ঘর লুঠপাট করার জন্য। প্রয়োজন বোধ করলে তারা গুলি চালাতেও পারে। জঙ্গলমহালের চাষীদের এই সংকটময় মুহূর্তে কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি স্বয়ং এগিয়ে এলেন এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে।

রাণী শিরোমণির জন্ম ঠিক কোথায়, কোন গ্রামে বা বংশে তা জানা যায় নি। তবে সম্ভবতঃ তিনি জমিদার কন্যা ছিলেন না। কারণ তিনি জমিদার কন্যা হলে তাঁর বিদ্রোহের সময় তিনি অবশ্যই তাঁর পিত্রালয়ের সাহায্য পেতেন। এদিক থেকে মনে হয় ত্রিলোচন তাঁর পিত্রালয়ের কেউ। তিনি জমিদারীর মালিক হওয়ার পর তাই নাড়াজোলের আবাসগৃহ সহ জমিদারীর কিছু অংশ ত্রিলোচন খানকে ছেড়ে দেন। তিনি যখন বিদ্রোহের পরিচালনা করেছেন, বন্দী হয়েছেন তখন সব সময়েই নাড়াজোলের জমিদার ও তাঁদের আত্মীয়বর্গ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন।[৩] নাড়াজোলের জমিদার আনন্দলাল খানের একজন আত্মীয় চুনীলাল খান রাণীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবাদী আন্দোলনের সহকারী ছিলেন।[৪] চুনীলাল খান যদি তাঁর নিকট আত্মীয় না হতেন তাহলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য সমাজ তাঁকে সন্দেহ করতো। কিন্তু তা করেনি। পক্ষান্তরে শিরোমণিকে তারা তাদের মাথার মণির মতো রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় নাড়াজোলের জমিদাররা জাতিতে সদগোপ ছিলেন।[৫] গোষ্ঠী হিসেবে এঁরা মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক ছিলেন। সে কারণে অনুমান করা যেতে পারে রাণী শিরোমণি ছিলেন জাতিতে সদ্গোপ এবং কৃষক কন্যা। অধ্যাপক জে. সি. ঝা তাঁকে, কোন সুত্র নির্দেশ না করেই 'আধা উপজাতি'[৬] বলে যে আখ্যা দিয়েছেন তা অযৌক্তিক।

গ্রাম্য পরিবেশে লালিতপালিত শিরোমণি কর্মঠ, বুদ্ধিমতী ও অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তখনকার দিনের জমিদারদের আভিজাত্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল গ্রামে, বিশেষতঃ নিজের জমিদারী এলাকায় কোন সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতী দেখলে তাকে বিয়ে করে ঘরে আনা। অজিত সিংহও শিরোমণিকে

গ্রাম থেকে তুলে এনে রাণীর মর্যাদা দেন। রাণী হলেও কৃষক পরিবারের কন্যা শিরোমণি কৃষকদের দুঃখকষ্টের কথা ভোলেননি। তাদের সুখে দুঃখে সর্বদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রজাদের সন্তানবৎ লালনপালনের চেষ্টা করেছেন। রাণীর ব্যক্তিত্ব, মধুর বাক্য ও ব্যবহারের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি মাতৃরূপিনী ছিলেন।[৭]

ইংরেজরা রাণীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে। রাণীর জমিদারী হস্তগত করার জন্য নানা অছিলার আশ্রয় নেয়। ১৭৯৪ সালে রামগড়ের কালেক্টার অভিযোগ তুললো রাণী শিরোমণি ও তাঁর আত্মীয়বর্গ, প্রজাসাধারণ কেউই ইংরেজদের সাথে যথাযথ ও আশানুরূপ ব্যবহার করছে না, তাদের ব্যবসার ভীষণ ক্ষতি করছে। এই অজুহাতে কালেক্টার প্রথমেই আঘাত হানার জন্য ১৭৯৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি রাণীর জমিদারী পরিচালন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।[৮]

অবশ্য রাণী ইংরেজ বিদ্বেষী এই সন্দেহ ইংরেজদের বহুদিন থেকে ছিল এবং তার সঙ্গত কারণও ছিল। যেমন ১৭৮৪ সালের ৮ই জুলাই কর্ণগড়ে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দেয়— কর্ণগড়ের সীতারাম খান ও বনসুরাম (বাঞ্ছারাম) বক্সীর নেতৃত্বে। রাণী শিরোমণি এই বিদ্রোহীদের সমর্থন জানান। ইংরেজ কোম্পানী শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সৈন্য পাঠিয়ে সীতারাম ও বাঞ্ছারামকে বন্দী করে বিচারের জন্য মেদিনীপুরের ফৌজদারী কোর্টে পাঠিয়ে দেয় এবং একটি সরকারি নির্দেশনামায় রাণীকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে যদি তিনি আবার চোয়াড় জাতীয় অসভ্য মানুষদের বিদ্রোহে সাহায্য করেন তাহলে তাঁকে প্রাণদন্ড দেওয়া হতে পারে।[৯] ১৭৯০ সালে মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণির ১১৯৫ টাকা খাজনা বাকী পড়ায় তাঁর খাজনামুক্ত নানকর জমি ইংরেজ প্রশাসন ক্রোক করে নেয়।[১০] এইরূপ বহু অবিচার শিরোমণির উপর নেমে আসে। রাণীর ইংরেজ বিদ্বেষ চরমরূপ নেয় যখন ইংরেজরা তাঁর সন্তানবৎ প্রজাদের 'পাইকান' জমি কেড়ে নেয়। তিনি উপায়ান্তর না দেখে বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন।

অষ্টাদশ শতকের আশির দশক থেকে জঙ্গলমহালের আর্থিক সংকট চরমরূপ ধারণ করতে থাকে। ১৭৮৮ সালে লবনের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ১৭৮৯ সালে মারাঠা আক্রমণের ধাক্কা এবং ১৭৯১ সালে রাজা সুন্দরনারায়ণের অতিরিক্ত কর সংগ্রহ কৃষকদের চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেয়। তাছাড়া, তখন মেদিনীপুর জমিদারীর অধিকাংশ অঞ্চল ছিল জঙ্গলাবৃত ও অনুর্বর, তাই জনবিরল। যেটুকু চাষযোগ্য জমি তাদের ছিল তাতে ভালো ফসল ফলতো না, আয়ও বেশি হতো না। তাই চাষবাসে তারা মনোযোগীও তেমন ছিল না।[১১] সামরিক জীবন তারা বেশি পছন্দ করতো। টাকা পেলে ইংরেজদের হয়েও তাদের যুদ্ধ করতে আপত্তি ছিল না। তারা ইংরেজ কোম্পানীর হয়ে দাক্ষিণাত্য, মহীশূর, উত্তর ভারত ইত্যাদি অঞ্চলেও যুদ্ধ করতে গেছে।[১২] কিন্তু এদের স্বার্থে যখন ইংরেজরা ঘা দিয়েছে, তাদের নিষ্কর পাইকান জমি কেড়ে নিয়েছে, তারাও প্রত্যাঘাত হেনেছে। তাদের অতিপ্রিয় রাণীর জমিদারী কেড়ে নিলে তারা

আরো ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়েছে।

মেদিনীপুরের জমিদারীর অন্তর্গত পাইক-বরকন্দাজেরা ইংরেজদের চোখে ছিল অসভ্য, জংলী, চোয়াড়। আসলে এই পাইক বরকন্দাজেরা ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব কৃষক। বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা ছাড়া এদের মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ। পাইকের কাজ করতো ভূনজ্ (ভূমিজ), কুরমালি,কোড়া, মুন্ডারী, কুর্মী, বাগ্‌দী, মাঝি, লোধা, ইত্যাদি উপজাতিসমূহ। এরা বংশানুক্রমে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার শান্তিরক্ষক হিসেবে কিছু নিষ্কর জমি ভোগদখল করছিল। ১৭৯৩-৯৪ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেদিনীপুরের জমিদারী অঞ্চলে নতুন পাইক নিয়োগ করে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য।[১৩] পাইক বরকন্দাজদের সমস্ত পাইকান জমিতে ইংরেজরা খাজনা বন্দোবস্ত করে। নিষ্কর জমিতে যে সব ভূমিহীন কৃষকরা চাষবাস করে, তার কিছু অংশ পাইকদের দিয়ে বাকিটাতে নিজেদের সংসার চালাতো, এখন তারাও ভূমিহীন হয়ে পড়লো। নতুবা বেশি টাকা দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নিতে বাধ্য হল ও শহরস্থ মহাজনদের দালালের শরণাপন্ন হয়ে কৃষি-ক্রীতদাসে পরিণত হল। মন্বন্তর, বর্গীর আক্রমণ, রাজনৈতিক অত্যাচার, ইংরেজদের সমর্থনপুষ্ট বাবু মহাজনদের শোষণে নিস্পেষিত কৃষকসমাজ। তাই তাদের সমব্যথী রাণী ইংরেজদের অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন। তাঁর জমিদারীতে রতন সিং, রাম সিং, রঞ্জিত মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন সর্দার-তহশীলদারকে ইংরেজ সরকার যখন বরখাস্ত করলো, এমনকি তাদের কোন জমি বন্দোবস্ত দিতে অস্বীকার করলো, তখন ইংরেজ প্রেরিত নিষ্ঠুর খাজনা আদায়কারী রামমোহন রায়কে তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই সময় মেদিনীপুরের জমিদারীর অন্তর্গত কৃষক বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল তিনটি। এক, খাজনা বাকি পড়লে কৃষকদের জমি নিলাম হতো। দুই, নিষ্কর জমির খাজনা বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। তিন, পাইক বরকন্দাজদের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করে পরিবর্তে বহিরাগত দারোগা ও পুলিশদের স্থানীয় শান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করা হলো। তাদের শোষণের জন্য আবার একটি নতুন ট্যাক্স ধার্য করা হলো ১৭৯৩ সালের ২২ নং রেগুলেশন বলে। তার উপর জমিদারী এলাকায় ব্যাপক বে-আইনী বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। চাষীদের নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখার জন্য ইংরেজরা গোপনে বিনামূল্যে আফিম সরবরাহ করতে থাকে।[১৪] তবু ইংরেজদের লাভ হলো না। চাষীদের সুখ দুঃখের অংশীদার রাণী শিরোমণির জমিদারী বাজেয়াপ্ত হলে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মেদিনীপুরের জমিদারীর মধ্যে যারা বাস করতো তাদের অধিকাংশই ছিল পাইক। এরা জমিদারের হয়ে লড়াই করতো, বিনিময়ে কিছু নিষ্কর জমি ভোগ করতো। তাদের জীবন ধারণের উৎসসমূহ ইংরেজ কোম্পানি রুদ্ধ করে দিলে তারা সঙ্গতি সম্পন্ন, সুদখোর, ইংরেজ পদলেহনকারী ব্যক্তিদের বাড়িতে ডাকাতি ও লুঠপাট শুরু করল। ইংরেজ ও তাদের আশ্রিত ও সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের তারা প্রধান শত্রু রূপে চিহ্নিত করল। রাণী এইসব ডাকাতি বা লুঠপাট বন্ধ করার চেষ্টা না করে তাদের উৎসাহিত করতে থাকেন।[১৫]

রাণী শিরোমণি বিদ্রোহী হয়েছিলেন মূলতঃ কয়েকটি কারণে। এক, তাঁর জমিদারীর

ম্যানেজমেন্ট ইংরেজরা ১৭৯৪ সালে কেড়ে নেওয়ায় তিনি অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হন। দুই. রাণীর সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাথে ইংরেজদের মাখামাখি গলাগলি রাণীকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিপ্রায়ে এইসব চক্রান্তমূলক প্রচেষ্টা। সর্বোপরি তাঁর পিতৃপরিবার ও আত্মীয় সবাই কৃষক ছিল। ইংরেজদের নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে এখানকার কৃষক সম্প্রদায় দারুণ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়ে। সরকারকে খাজনা দিয়ে যা তাদের উদ্বৃত্ত থাকতো তাতে তাদের কয়েক মাসের ভরণপোষণ চলতো। তাছাড়া তাদের ওপর প্রতিনিয়ত চলতো ইংরেজ সেপাই, তহশীলদার, গোমস্তা ইত্যাদির নিত্য নিপীড়ন ও শোষণ। এসময় শুধু গরীব চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়নি, মাঝারি কৃষকেরাও হয়েছিল। আত্মীয়, পরিবার- পরিজনদের উপর ইংরেজদের শোষণ ও শাসন রাণীকে বিচলিত করে তুলেছিল। তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বপরিকল্পনায় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। আন্দোলনের সমস্ত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে রাণী শিরোমণি জঙ্গলমহাল থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা তারিফ করার মতো। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল নিজের জমিদারীর সমস্ত প্রজার সমর্থন অর্জন করা। প্রজাদের দুঃখকষ্টে তিনি পাশে এসে দাঁড়াতেন বলে গণ সমর্থন অর্জন করতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি। জঙ্গলমহালের বিশেষতঃ তাঁর জমিদারীর প্রায় সমস্ত উপজাতি সর্দারদের সাহায্যের আশ্বাস তিনি পেয়েছিলেন।[১৬] তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সাহায্য ও সমর্থন না পেলে তাঁর আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে ইংরেজ ও পার্শ্ববর্তী জমিদারদের মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে বিদ্রোহ শুরু করার পূর্বে তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদারদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক করেন। এ বৈঠকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেন— ইংরেজ কেন সবার শত্রু। শুধু তাই নয়— এই ইংরেজ বিরোধী গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি জমিদারদের আহ্বান করেন।[১৭] তাঁর নিজের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বৈঠকে পেশ করেন।

রাণী প্রথমাবধি ইংরেজ বিরোধী ছিলেন। সব সময়ই তিনি ইংরেজ বিরোধীদের সাহায্য করেছেন। যেমন ১৭৬৭ সালের নভেম্বর মাসে নাড়াজোলের জমিদার অযোধ্যারাম ইংরেজদের খাজনা দিতে অস্বীকার করলে কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি তাঁকে আশ্রয় দেন। এ সমস্ত কারণে তিনি প্রজাপ্রিয় ও জমিদারদের আস্থাভাজন ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির নিষ্কর জমির নিলাম ডাক শুরু হলে কোন পার্শ্ববর্তী জমিদার এমন কি কোন মহাজনও ঐ জমি নিলামে ডেকে নিতে এগিয়ে আসেননি। অবশ্য মহাজনেরা ভয়ে নিলামে অংশ নেয়নি।[১৮] ইংরেজদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ কৌশল হিসাবে তিনি গেরিলা পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ মেদিনীপুরের জমিদারীর অধিকাংশ অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলাবৃত। জঙ্গলের ভিতর থেকে তীর ধনুক নিয়ে অতর্কিতে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করে গা ঢাকা দেওয়া সহজ ছিল।[১৯] আবার কোন কোন সময় কৌশল প্রয়োগ করে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে

দিতেন। যারা ইংরেজকে সমর্থন করতো, সাহায্য করতো তাদের ঘর বাড়ি লুঠপাটের আদেশ দিতেন এবং অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কখনও তাদের মেরে রাস্তার ধারে গাছে তাদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন। রাণীর আদেশে বিদ্রোহী কৃষকরা লুণ্ঠনজাত সামগ্রী এনে ভাগাভাগি করে নিত।[২০] রাণী শিরোমণির নেতৃত্বে বিদ্রোহ এমন চরমরূপ ধারণ করেছিল যে ইংরেজরা তাদের পরিবার পরিজনদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছিল নিরাপত্তার কারণে। কারণ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন, চোয়াড়রা মেদিনীপুর শহর আক্রমণ করে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। জেলা কালেক্টরের একই রকম অভিমত। খবরটি জানাজানি হওয়ার পরেই বহুলোক মেদিনীপুর শহর ছেড়ে পালায়। সবচেয়ে ভয় পেয়েছে ধনীলোকেরা। তারা তাদের জায়গায় গরীবলোকেদের রাখবার চেষ্টা করছে। মেদিনীপুর শহরকে এই আতংক থেকে রক্ষা করার জন্য লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল ডার্নকে বিশেষ অনুরোধ করা হয়। কালেক্টার সাহেব শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেপাই মোতায়েন করেও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তিনি ডার্নকে জানান, তাঁর হেফাজতে রাখা কোষাগারটি যাতে অস্ত্রাগারে স্থানান্তরিত হয় নিরাপত্তার কারণে। কেননা, বিদ্রোহীরা নাকি মেদিনীপুর শহর আক্রমণের জন্য একেবারে প্রস্তুত। গ্রামের যে সব কৃষক ইংরেজদের আদেশ শিরোধার্য করেছিল তাদের গ্রাম ছেড়ে, সব ফেলে রেখে শহরে আসতে বাধ্য করল। ইংরেজদের পদলেহনকারী মহাজন ও সম্পন্ন কৃষকদের সম্পত্তি লুঠপাট হল, তাদের জমির ধান কেটে নিয়ে গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। বিদ্রোহী সর্দাররা এলাকার সমস্ত কৃষককে জানিয়ে দিল— কোনভাবেই ইংরেজদের বা তার প্রতিনিধিদের খাজনা দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাদের হত্যা করা হবে।[২১] এ হলো তাদের রাণী শিরোমণির আদেশ। সম্পন্ন কৃষক যারা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি তারা ঘর ছেড়ে শহরে পালিয়ে এল। চাষবাস বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। খাজনা আদায় করা ইংরেজদের আর সম্ভব হলো না। ইংরেজরা দারুণ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়লো। এমনকি মেদিনীপুর শহরের নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে পড়লো। অথচ ইংরেজরা তখনও সঠিক বুঝে উঠতে পারেনি যে এ সমস্ত বিদ্রোহ ও ক্ষয়ক্ষতির মূলে আছেন শিরোমণি। মেদিনীপুরের কালেক্টার তখনও আশা করেছিলেন যে রাণী শিরোমণি ও তাঁর সহযোগী নাড়াজোলের জমিদার আত্মীয় চুনীলাল খান এইসব জংলী চোয়াড় পাইকদের আয়ত্বে রাখতে না পেরে এদেরই হাতে শেষ হবে। কালেক্টার তাই আদেশ দিয়েছিলেন কর্ণগড়ের দুর্গ রক্ষার জন্য রাণী যে আবেদন করেছেন তাতে সাড়া দিয়ে এখনই যেন কোন সেপাই সেখানে না পাঠানো হয়। কারণ তাঁর মতে রাণী তখন বিপজ্জনক অবস্থায়।[২২] আসলে রাণী ইংরেজদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা কালেক্টার প্রথমে বুঝে উঠতে পারেন নি। কর্ণগড়, নাড়াজোল প্রভৃতি অঞ্চল দখলের জন্য যখন ইংরেজরা নতুন করে সৈন্য কলকাতা থেকে আমদানী করছিল তখন ঐ সৈন্যবাহিনীকে বিভাজিত করে, দুর্বল করে, অতর্কিতে জেলা প্রশাসনের মূলকেন্দ্র মেদিনীপুর শহর আক্রমণের পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন।

তাই তিনি জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন যে তিনিও পাইকদের বিদ্রোহে অতিষ্ঠ এবং তাঁরও সম্পত্তিও পাইকরা ডাকাতি করে নিয়েছে। এ অবস্থায় জেলা কালেক্টর যেন সেপাই পাঠিয়ে দুর্বৃত্ত পাইকদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। কিন্তু রাণীর দুর্ভাগ্য তাঁরই নায়েব যুগলচরণ কর্ণগড়ের রাজা হওয়ার আশায় সমস্ত বিষয় গোপনে ইংরেজদের জানিয়ে দেয় এবং আরও জানায় যে ইংরেজরা যদি রাণীকে সরিয়ে তাকে কর্ণগড়ের জমিদার করে তাহলে ইংরেজদের তিনি অনেক বেশি খাজনা দেবেন।[১১] রাণীর দেওয়ান যুগলচরণ ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও চক্রান্তকারী। বুদ্ধিমতী রাণী শিরোমণি দেওয়ান যুগলের সন্দেহজনক গতিবিধি, মতলব ও কার্য্যকলাপ উপলব্ধি করে তাকে তাঁর জমিদারী থেকে বহিস্কৃত করেন। তার স্থলে তিনি তাঁর আত্মীয় নাড়াজোলের ভূস্বামী চুনীলাল খানকে দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই চুনীলালই বিদ্রোহ পরিচালনার ব্যাপারে ভবিষ্যতে রাণীর দক্ষিণ হস্ত রূপে অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এবার সমস্ত বিষয় ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হলো। ইংরেজরা রাণীকেই সমস্ত গন্ডগোলের জন্য দায়ী করলো এবং কৌশলে রাণীকে দমন করার জন্য সচেষ্ট হলো। প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কমান্ডিং অফিসারকে আবাসগড় দখল করতে আদেশ দিলেন। কৃষক বিদ্রোহের কার্যস্থল আবাসগড়ে থাকতেন রাণীর সহযোগী চুনীলাল খান। আবাসগড় আক্রমণ করে ইংরেজ আগে রাণীর ডানহাত ভেঙ্গে দিতে চাইলো। কয়েকদিন পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাণী, চুনীলাল খান ও নরনারায়ণ বক্সীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে একদিকে কর্ণগড়ে অন্যদিকে আবাসগড়ে দ্বিমুখী আক্রমণ চালালেন। অতর্কিত আক্রমণে শিরোমণি আত্মগোপন করার সুযোগ পেলেন না। ইংরেজরা আবাসগড় ও কর্ণগড় দখল করে রাণীকে ও রাণীর সহযোগী সমর্থকদের বন্দী করে। ৩০০ জন কৃষক বিদ্রোহী তথা পাইক যারা কর্ণগড়ের জঙ্গলে অবস্থান করছিল তারা এই অকস্মাৎ আক্রমণে কোনক্রমে আত্মগোপন করে।[১৪] কর্ণগড় ও তার আশপাশ জনমানবহীন হয়ে পড়ে। সমস্ত গোলমালের জন্য ইংরেজরা রাণীকে দায়ী করে ১৭৯৯ সালের ৬ই এপ্রিল বন্দী করে। শিরোমণি, চুনীলাল খান, নুরু বক্সী প্রভৃতিকে দুর্গের অর্ডিনেন্স ডিভিসনে বন্দী করে রাখা হয়। কারুর সাথে বন্দী অবস্থায় রাণী সাক্ষাৎ করতে পারবেন না বলে আদেশ দেওয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজনে, ভারতীয় কোন বিশ্বস্ত পদস্থ কর্মচারীর উপস্থিতিতে, রাণী কয়েক মিনিটের জন্য কারো কারো সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। কারণ কথাবার্তার বিষয়বস্তু ঐ পদস্থ সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ইংরেজরা জানতে পারবে।[১৫]

রাণীকে আদালতে অভিযুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসন কেস সাজাতে থাকে। কর্ণগড়ে অনেক যুদ্ধাস্ত্র পাওয়া গেছে বলে তারা অভিযোগ তোলে। যেমন ২৭টি গাদা বন্দুক, ৪টি বিলাতি গাদা বন্দুক, ২৫টি তলোয়ার, ৪টি যুদ্ধ কুঠার, ৪টি বল্লম, ১০টি ক্ষুদ্র গোলাকার ঢাল, ৫টি বাঁশের ধনুক, ১৪টি ধনুকের তীর রাখার ক্ষুদ্র থলি, ৯টি ছোরা, ৪টি গুঁড়া বারুদের অস্ত্র এবং একটি রৌপ্য আবৃত ছোট তলোয়ার। এই যুদ্ধাস্ত্রগুলি রাণীর বিচারের দিন প্রমাণ হিসেবে পেশ করার জন্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী কর্ণগড় থেকে মেদিনীপুরে

নিয়ে আসে।[২৬] উল্লেখ্য, একটি বড় জমিদারের বাড়িতে উপরোক্ত যুদ্ধাস্ত্র মজুত রাখা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে এর চেয়ে অনেক বেশি যুদ্ধাস্ত্র অনেক ছোট ছোট জমিদারদের থাকতো। বস্তুতপক্ষে রাণী নিজের গড়ে বেশি যুদ্ধাস্ত্র মজুত রাখেননি। অধিকাংশ অস্ত্র বিদ্রোহী কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজদের বিরূদ্ধে লড়াই করবার জন্য।

প্রথমে ইংরেজরা রাণীকে কর্ণগড় দুর্গে ও নাড়াজোলের জমিদার চুনীলাল খান ও নরনারায়ন বক্সী দেওয়ানকে মেদিনীপুর জেলে বন্দী করে রাখে। কিছুদিন পরে এঁদের সবাইকে বিচারের জন্য কলকাতা পাঠিয়ে দেয়। ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে রাণীকে যাবজ্জীবন বন্দী রাখার আদেশ দেওয়া হয়। রাণী এই আদেশের বিরূদ্ধে আপীল করেও কোন সুবিচার পাননি। বিশাল সংখ্যক সেপাই কর্ণগড়, আবাসগড় ও নাড়াজোলে মোতায়েন করা হয়। ২০শে মে জেলায় ৫ কোম্পানি অতিরিক্ত সেপাই কলকাতা থেকে আনা হয় এবং কিছু সেপাইকে মূল উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে যেমন, আনন্দপুর, সৎপতি, কর্ণগড়, শালবনি, গোপীবল্লভপুর ও বলরামপুরে মোতায়েন করা হয়। সহযোগী হিসাবে থাকে সুবাদার, জমাদার, হাবিলদার, নায়েক প্রভৃতি যাদের মোট সংখ্যা ছিল (সেপাই সহ) ৩০৯ জন।[২৭]

রাণী শিরোমনির চূড়ান্ত বিচার মেদিনীপুরেই হয়। নাড়াজোলের জমিদার সীতারাম খানের পুত্র আনন্দলাল খানের মধ্যস্থতায় কোম্পানির সঙ্গে রাণীর মিটমাট হয়। বিচারে তিনি মুক্তি পান। চুনীলাল খান ও নরনারায়ন বক্সীকেও আবাসগড় দুর্গে কার্যতঃ নজরবন্দী করে রাখা হয়। (কর্ণগড় অঞ্চলে একটি জনশ্রুতি গড়ে উঠেছিল এই যে, সাধারণ কৃষকের অতিপ্রিয় রাণী শিরোমণিকে মৃত্যুদণ্ড দিলে মেদিনীপুরে বিদ্রোহের আগুন কখনও নিভবে না। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে ইংরেজরা রাণীকে আবাসগড় দূর্গে নজর বন্দিনী করে রাখে।) এখানেই রাণী জীবনের শেষ তের বছর কাটিয়ে এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরিচালনার জন্য তাঁর জমিদারি হারিয়ে ১৮১২ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাণী শিরোমণি যথার্থই ছিলেন রাণী। তিনি ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সাহসী ও প্রজাহিতৈষী। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মেদিনীপুর জমিদারীর অর্ধেক ভাগ তিনি পেয়েছিলেন। সাধারণ কৃষক প্রজাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে, বিদ্রোহে নেতৃত্ব না দিয়ে, আর পাঁচটা জমিদার গৃহিণীর মত তিনি আরামে বিলাসে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। গ্রামের সাধারণ পরিবেশে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করে তিনি কৃষকদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখেছেন, এমনকি নিজেও অনুভব করেছেন। তাই ধনী জমিদারের গৃহিণী হয়েও তিনি কৃষক প্রজাদের স্বার্থের কথা ভোলেন নি। প্রায় অশিক্ষিত এই রমণীর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তিনি দয়াদাক্ষিণ্য, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তার বলে প্রজাদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর মেলে একটি ঘটনা থেকে। তিনি যখন নিজামত আদালতের নির্দেশে কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে বিচারের জন্য আনীত হচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে বানগ্রাজ গ্রামে তাঁর শত শত প্রজা, শুভানুধ্যায়ী, এমনকি প্রাক্তন দেওয়ান এসে তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমবেদনা

জানিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ রাণী মুক্তি পেলেও কার্যতঃ তিনি ছিলেন বন্দিনী। রাণী শিরোমণিকে তাঁর সাহস, দৃঢ়তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বহু ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি যে পাইক বা কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন তার প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায় তাঁকে বন্দী করার পরেই বিদ্রোহ একেবারে দমিত না হলেও বিদ্রোহের তীব্রতা অনেক কমে যায়।[২৮] বিদ্রোহী কৃষক বাহিনী কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই সাময়িক ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা কৃষকবিদ্রোহের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে এবং তাদের অনেককে বন্দী করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কিন্তু বিদ্রোহীরা কিছুটা দমিত হলেও নিরুৎসাহিত হয়নি। তারা বিভিন্ন জায়গায় পূর্বের মত ইংরেজ ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৮০০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি আরনেস্ট, রেভেনিউ বোর্ডের সভাপতি কাউপারকে এক পত্র মারফৎ জনিয়েছিলেন যে চোয়াড় কৃষকেরা নতুন নিলামদার. জমিদারদের জমি আক্রমণ করা শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়ি লুঠপাট করছে কিংবা পুড়িয়ে দিচ্ছে। সুযোগ পেলেই ইংরেজদের লোককে হত্যা করছে। ভিখারীর ছদ্মবেশে অতর্কিতে মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করছে।[২৯]

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কৃষক পাইকদের খাজনা অনেকক্ষেত্রে মকুব করা হল। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নিষ্কর জমি নামমাত্র জমায় ফিরিয়ে দেওয়া হল এবং সর্বোপরি শান্তিরক্ষার ট্যাক্স মকুব করে সুপ্রাচীন জমিদারদের উপর স্থানীয় শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করা হলো। তারা হিন্দুযুগ থেকে যেসব ঘাটোয়ালী অধিকার ভোগ করে আসছিল তা সবই বলবৎ রাখা হল। রাজনৈতিক বন্দীদের অনেককেই ক্ষমা করা হল। তবু বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হল না। প্রথমে ১৮০৬, পরে ১৮৩২ সালে আবার জঙ্গলমহালের কৃষকেরা ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র সশস্ত্র প্রতিবাদ জানাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর জঙ্গলমহালের কৃষক বিদ্রোহ ও রাণী শিরোমণি দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। একে অপরের পরিপূরক। মেদিনীপুর জমিদারীর কৃষক বিদ্রোহ মানেই রাণী শিরোমণি, রাণী শিরোমণি মানেই কৃষক বিদ্রোহ। প্রায় নিরক্ষর এই কৃষক কন্যার কৃষক ও গরীব দুঃখীদের জন্য আত্মত্যাগ, বুদ্ধি ও কৌশল বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি শুধু নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন নি, নিম্নবর্গ অথবা অনগ্রসর ও দলিত সমাজের মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে তিনি আন্তরিকভাবে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ইংরেজদের হাতে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ছয়

উনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুরের শিক্ষার কিছু দিক

আদিমকাল থেকে মানুষ জ্ঞানান্বেষণে রত এবং তারই ফলশ্রুতি শিক্ষার বিস্তার। কালে কালে দেশে দেশে নানান শিক্ষা পদ্ধতির সূচনা ও বিস্তার ঘটলেও সর্বকালে সর্বদেশে শিক্ষার মূল নীতি কিন্তু অভিন্ন রয়েছে ভৌগোলিক সীমারেখার সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল অতিক্রম করে। ভারতের সর্বত্র সমহারে ও সমভাবে যেমন শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি তদ্রুপ বাংলাতেও। পশ্চিম বাংলার বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরে কি ভাবে ও কবে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল তারই অন্বেষণ বর্তমান প্রবন্ধের উপপাদ্য বিষয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে মেদিনীপুরে শিক্ষা বাংলাদেশের আর পাঁচটা জায়গার মত গুরুগৃহে অধ্যয়ন, পাঠশালা, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সাধারণতঃ বার্ষিক ব্যয় নির্বাহ করতেন রাজা ও ধনী লোকেরা। পাঠশালা ছাড়াও কীর্তন, কথকতা তর্জাগান, পাঁচালী প্রভৃতির দ্বারা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য বঙ্গের কয়েকটি প্রধান প্রধান জেলার রাজপুরুষগণকে ৪০টি প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী মেদিনীপুরের তদানীন্তন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. স্ট্রেচা (H.Strachey) গভর্নর জেনারেলের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা ফার্মিনজারের গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর মেদিনীপুরের ইতিহাস (প্রথম ভাগ) গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে চল্লিশটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নের ও তার উত্তরের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এই প্রশ্নোত্তর থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুরের শিক্ষাব্যবস্থা সহ সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল তার একটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

"প্রশ্ন . আপনার অধিকারভুক্ত প্রদেশের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের আইনের জ্ঞান কিরূপ ? তথায় হিন্দু বা মহম্মদীয় আইন শিক্ষা দিবার জন্য কোন স্কুল বা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর ঃ- এই জেলার লোকের আইন-জ্ঞান বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগের ন্যায়ই নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী বা কর্মের উমেদার ও উকিল ব্যতীত আইনের খবর বড় একটা কেহ রাখে না, রাখিবার আবশ্যকতাও বোধ করে না। [illegible] শিক্ষ

দিবার জন্য দেশের মধ্যে কোন স্কুল নাই বা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থাও নাই। তবে সামান্য বাঙলা লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশ শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটি স্কুল আছে। স্কুলের মাসিক বেতন এক আনা কি দুই-আনা মাত্র। যাহারা ঐ সকল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া থাকে তাহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা ঐ কার্যের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও সমাজে তাহাদের কোন সম্মান নাই; সমাজে তাহারা সাধারণ ভৃত্যবর্গের অল্প উপরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্কুলের কার্য্য দিনের বেলাতেই হয়। মুক্ত আকাশের তলে কিংবা কোন আচ্ছাদনের নিম্নে বসিয়া ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা ঐ সকল স্কুলে পড়ে না। গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পারসী ও আরবী ভাষা মৌলবীগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক মৌলবী নিজবাড়িতে বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। মেদিনীপুরে একটি মুসলমান কলেজ আছে। সেখানে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। কিন্তু সেখানেও মহম্মদীয় আইন শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই।"

প্রথাবহির্ভূত ভাবে সামাজিক ক্রমবিন্যাস ও ভাব আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল ধীরে এবং নীরবে। প্রাক ব্রিটিশ যুগে জনশিক্ষার ব্যবস্থা সারা মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান থাকলেও তার মানের কোন স্থিরতা ছিল না। আর আধুনিক আদর্শানুযায়ী ওই মান যে অত্যন্ত নীচু ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাঠশালার শিক্ষার আদর্শ নিতান্ত সংকীর্ণভাবে কার্যিক ছিল এবং মক্তবের কোরান শিক্ষাও ছিল, না বুঝে মুখস্থকরা নিরর্থক আচারের পর্যায়ে। সূত্র ও ধারা কণ্ঠস্থ করাই ছিল শিক্ষার প্রধান অংশ। তবে এই লৌকিক ও কার্যিক শিক্ষা সংকীর্ণ হলেও গ্রাম্য জীবনের অনেক অভাব পূরণ করতো। পাঠ্যক্রম ছিল পড়া, লিপি, চিঠি লেখা, প্রাথমিক গণিত ও হিসাব। কৃষি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত বা উভয় প্রকারেরই হিসাব শেখানো হত। পাঠ্য পুস্তক কম ছিল, এবং যেগুলি ছিল, সেগুলিও অনুপযুক্ত। যথা রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কাব্য ইত্যাদি। এই সময়কার হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষার তুলনা করলে দেখা যায় যে পাঠশালা ও টোলের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। কিন্তু মক্তব ও মাদ্রাসাগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত ছিল। পাঠশালার শিক্ষা লৌকিক ও মক্তবের শিক্ষা ছিল ধর্মপ্রভাবিত। তবে এসমস্ত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলা তথা ভারতের বহুকাল প্রয়োজন মিটিয়েছে।

ভারতে তথা বাংলায় বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত তার উৎপত্তি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। আঠার শতক পর্য্যন্ত যে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ইংরেজ শাসনে ক্রমশঃ অকেজো হয়ে পড়ে এবং তার স্থানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমশঃ প্রচলন হয়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার ইংল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞীর হাতে ন্যস্ত হয় এবং তখন থেকেই বৃটিশ অনুমোদিত শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে তথা বাংলায় স্থায়ী আসন নেয়।[১]

তবে এর অনেক আগে থেকেই ইংরেজদের এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করার ইচ্ছে ছিল। বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও কথোপকথনের জন্য প্রথমে অল্প সংখ্যক বাঙালী ইংরাজী

শেখার প্রয়োজন অনুভব করে। জমিদারী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষের চাকরি লাভের জন্য মোটামুটি ইংরেজীজ্ঞান আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, 'ইঁহারা নিজের অধ্যবসায়ে, কতকটা ইরেজ বা ইংরেজীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্যে ও সহায়তায়, এবং কতকটা কার্যব্যপদেশে ইংরেজী শিখিয়া যথেষ্ট সাংসারিক উন্নতি করিয়াছিলেন''[২] প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কোন বিদ্যালয়ে না পড়েও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর বেশ ভাল ইংরেজী শিখেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী ইংলণ্ডে লিবারেলিজম্ বা উদারপন্থি আদর্শের অভ্যুত্থানকাল। এ সময় বার্ক প্রভৃতির বক্তৃতায় দাসত্ব ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছিল। দরিদ্রের শিক্ষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল। সরকার কর্তৃক জনশিক্ষার দায়িত্ব স্বীকৃত না হলেও ধর্মসম্প্রদায় ও অন্যান্য লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লোকশিক্ষার আয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সব আন্দোলনের প্রভাব বৃটিশ কোম্পানীর ভারতীয় নীতির উপরও পড়েছিল। চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩) ছিলেন এই প্রভাবের বার্তাবহ স্বরূপ। পরে নানা ঘাত প্রতিঘাত, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতে একটি স্থায়ী আসন করে নেয়। ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য কিছু কলেজ ও স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮৩৫ সালে মেদিনীপুরে "ইংলিশ একাডেমি" স্থাপিত হয়।[৩] সমসাময়িক কালে কিছু জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তি এগিয়ে আসেন মেদিনীপুরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। মাত্র ১৮জন ছাত্র নিয়ে ১৮৩৪ সালের নভেম্বর মাসে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যালয়টি সরকারের হাতে অর্পিত হয়। এ সময় বিদ্যালয় তহবিলে দু-হাজার টাকা মজুত ছিল। ১৮৩৪ সালে এফ্. টীড্ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ছাত্রদের মাসিক মাহিনা ছিল চার আনা অর্থাৎ বর্তমানের ২৫ পয়সা। ১৮৫০ সালে এই মাহিনা বেড়ে একটাকা হয়।[৪] বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলটি গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজা ১৫০০ টাকা দান করেন, মহিষাদলের রাজাও ভাল পরিমাণ অর্থ দান করেন। এই স্কুলে তখন বাঙালী ও ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর ছাত্রই পড়ত। এটি ছিল পুরাদস্তুর ইংরাজী স্কুল, শিক্ষাসচিব লর্ড মেকলের ঘোষণার অনুরূপ। এই স্কুলটি উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দিকে হায়ার ক্লাস স্কুল নামে পরিচিত হয়।

স্কুলটির পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের হাতে, কিন্তু স্কুলটির ব্যয়ভার বহন করত মূলতঃ অভিভাবকেরা। যেমন-সরকারী অনুদান (বার্ষিক) ছিল 269 আর ছাত্রদের কাছে মাহিনা বাবদ সংগৃহীত হতো £493.10s, 0d. এই স্কুলের মাসমাহিনা খুব বেশি ছিল বলে কেবল বিত্তশালী পরিবারের সন্তান সন্ততিরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। ১৮৭১-৭২ সালের শিক্ষাবর্ষে এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৪৬ জন। কিন্তু ছাত্রদের দৈনিক উপস্থিতির গড় সংখ্যা ছিল ১৯২ জন।[৫] প্রত্যহ পঞ্চাশের অধিক গড় ছাত্রের অনুপস্থিতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে এবং অনুমান করা যেতে পারে তৎকালীন সময়ে সরকারী স্কুলে ছাত্রদের উপস্থিতিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে

দেখা হতো না।

মেদিনীপুর জেলায় এসময় আরো তিনটি হায়ার ক্লাস স্কুল ছিল যথা-মেদিনীপুরে (শহরে) আরও একটি। বাকি দুটি তমলুক ও মহিষাদলে। মেদিনীপুর শহরে যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি বর্তমানের মেদিনীপুর টাউন স্কুল। এই স্কুলটি ১৮৮৩ সালের ৩রা জানুয়ারী বর্তমান হরি সিনেমার গৃহে বিদ্যোৎসাহী কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি বর্তমান বিদ্যালয় গৃহের গোল বারান্দাযুক্ত দ্বিতল বাড়িটি দান করেন। প্রত্যেক বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রকে কার্ত্তিকচন্দ্র বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের দান ও সৎকার্য্যে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিদ্যালয়ে 'দরিদ্র ভাণ্ডারে'র ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ অর্থে ও শহরের বিশিষ্ট ক[illegible]দের সহায়তায় (৩রা জানুয়ারী) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে অন্ধ, খঞ্জ ও দরিদ্রগণকে বস্ত্র, শীতবস্ত্র ও চাল দেওয়া হত।[৮] এই স্কুলেরও পঠনপাঠনের মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা। এই স্কুলটি প্রথমে কোন সরকারী সাহায্য গ্রহণ করতো না। স্কুল প্রতিষ্ঠার অনেক পরে ১৯৫৯ সাল থেকে স্কুলটি সরকারী সাহায্যের আওতায় এসে পড়ে।[৮] স্কুলটির প্রধান আয় ছিল ছাত্রদের বেতন। বাকিটা পূরিত হত স্থানীয় জনদরদী বিদ্যানুরাগী বিত্তশালীদের দানে। এই স্কুলে সরকারী ইংরাজী স্কুলের তুলনায় অধিকতর দরিদ্র ছাত্ররা পড়তো। শিক্ষকদের মাইনে ও পাঠদানের মান সরকারী ইংরাজী স্কুলের তুলনায় অনেক কম ছিল।[৮] তবে এই স্কুলটির স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই স্কুলের অনেক ছাত্র দেশকে পরাধীনতার শৃঙখল থেকে মুক্ত করার জন্য অকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। মৃগেন দত্ত, অনাথ পাঞ্জা, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী প্রমূখ তার প্রকৃষ্ট উদাহরন। যে সব বীর ছাত্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল তারা হলো বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম বোমাশিল্পী ও শ্রী অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো, বেঙ্গল ভলেনটিয়ার্স ফোর্সের নেতা নরেন্দ্রনাথ দাস। অনুশীলন সমিতির নেতা বীরেন্দ্রনাথ দাস, ফনি দাস, রাধারমন চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি।[৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে তমলুক মহকুমায় দুটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। একটি তমলুকে। অপরটি মহিষাদলে। মহিষাদল উচ্চ ইংরাজী স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহিষাদলের রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ। তাই পরবর্তীকালে এই স্কুলটি মহিষাদল রাজ স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। স্কুলটির প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি জনশ্রুতি আছে। সেটি হল - লছমন প্রসাদ গর্গের ভগিনী ও ভগিনীপতি মহিষাদলে অবস্থানকালে একটি পুত্র সন্তান লাভ করে। এই নবজাতকের নাম দেওয়া হয় শিবচন্দ্র (মিশ্র)। রাজা লছমন প্রসাদ তাঁর এই নবজাতক ভাগ্নেকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাকে আদর করে ডাকতেন গুড়ুম বলে। এই শিববাবু বা গুড়ুমবাবুর লেখাপড়ার সুবিধার জন্য এবং তাকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য লছমন প্রসাদ গর্গ একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। প্রথমে মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপে স্কুলটির ক্লাস হতো। পরে হিজলী টাইডল ক্যানেলের পাড়ে একটি দোতলা পাকাবাড়িতে স্কুলটি

স্থানান্তরিত হয় - যেটি পুরাতন লাল স্কুল বাড়ি নামে পরিচিত। তখনকার দিনে মহিষাদল রাজপরিবারের মধ্যে একমাত্র রাজা লছমন প্রসাদ গর্গই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। সে কারনে তাঁর ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগও ছিল। [১০] মহিষাদলের রাজা রামনাথের পোষ্যপুত্র লছমনপ্রসাদ সাহসী, দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনিই প্রথম মহিষাদল অঞ্চলে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্ররা যাতে বিনা খরচায় থেকে খেয়ে পড়াশুনা করতে পারে সেজন্য রাজবাড়িতেই ঐ সমস্ত ছাত্রদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সেকালে এই স্কুলটি ছিল চতুর্থ। কিন্তু অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রথম ও একমাত্র।[১১] শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, সমগ্র বঙ্গে এটিই ছিল খুব সম্ভবতঃ এক মাত্র অবৈতনিক ইংরাজী শিক্ষালয়। লছমন প্রসাদের পুত্র স্বল্পায়ু ঈশ্বর প্রসাদ গর্গ পিতার নির্মিত ও পরিচালিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টির উন্নতিকল্পে নতুন গৃহ নির্মান ও ছাত্রাবাস নির্মান করেন। ঈশ্বর প্রসাদের সময় ১৮৭৪ সালে রাজ হাইস্কুলটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় রূপে সরকারী অনুমোদন লাভ করে।[১২] সম্ভবতঃ ১৮৬৮-৬৯ সালের দিকে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হান্টারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৮৭১-৭২ সালে মহিষাদল ইংরাজী স্কুল থেকে কোন ছাত্রই ইউনিভারসিটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে নি। কারণ স্কুলটি সবেমাত্র ২/৩ বৎসর শুরু হওয়ায় ছাত্ররা এই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পায় নি।[১৩]

তমলুক হায়ার ক্লাস স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন মহাত্মা হামিল্টন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার স্থানীয় বৃটিশ কর্মচারীদের সহায়তায়। এই স্কুলটি ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয় নামেও পরিচিত ছিল। হামিল্টন প্রায়ই স্কুলে এসে সস্নেহে ছাত্রদের কাছে ডেকে বিদ্যালাভে উৎসাহ দিতেন। বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য তিনি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তমলুকে আনতেন। [১৪] ১৮৬৪ সালের ভয়াবহ ঝড় ও বন্যায় ইংরাজী স্কুলটি একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উদারাশয় ও বিমলমনা জনৈক যাদববাবুর অকল্পনীয় চেষ্টা ও যত্নে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত অর্থের সমপরিমান অর্থ তৎকালীন স্কুল ইনস্পেক্টার এইচ. এল. হারিসন সাহেব সরকারী তহবিল থেকে সাহায্য করেন। স্কুলটির জন্য একটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়। এই কারণে হামিলটন সাহেব উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেও যাদববাবুই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।[১৫] এই স্কুলটি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ভাবে অর্থ সংগৃহীত হতো। কয়েকটি পদ্ধতি অভিনব ও আশ্চর্যজনক ছিল। স্কুলটির অন্যতম প্রধান আয় ছিল ছাত্রদের মাস মাইনে। যতটাকা ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে বাবদ সংগৃহীত হতো, তত টাকা ইংরাজ সরকার অনুদান দিত। সবথেকে বেশি অর্থ সংগৃহীত হতো স্থানীয় জনসাধারণের দান থেকে। যেহেতু স্কুলটি একজন সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে কারণে প্রতিষ্ঠা বৎসর থেকেই সরকারী স্বীকৃতি ও আর্থিক অনুদান লাভ করেছিল জেলার দ্বিতীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুল হিসাবে। ১৮৭১-৭২ সালে এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৬ জন। দৈনিক উপস্থিতির গড় হার ছিল ৫০ জন। স্কুলটি

নির্মানের সময় স্থানীয় ঠিকাদাররা অর্থসহ বিভিন্ন সাহায্য করে। এছাড়া স্কুলের আয় বৃদ্ধির জন্য বছর বছর একটু একটু করে টিউশন ফি বাড়ানো হত। স্কুলের সঞ্চিত অর্থ চড়াসুদে ব্যবসায়ীদের, এমনকি রাজাকেও ধার দেওয়া হতো। এর জন্য স্কুল কিছু না কিছু বন্ধক রাখতো। ছোট ছোট দোকানীরাও সুদে স্কুলের কাছে ধার নিত। তাছাড়া, স্টাম্প পেপার স্কুলের টাকায় কিনে বেশি দামে বিক্রি করে স্কুল লাভ করতো। এ সমস্ত কাজের তদারকি করার দায়িত্ব থাকত হয় কোন শিক্ষকের উপর অথবা পরিচালন কমিটির কোন সদস্যের উপর। স্কুলে ছাত্রদের অনুপস্থিতি স্কুলের আয় বৃদ্ধির কারণ হতো বলে ছাত্রদের কাছে স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাওয়া হতো না। মোটকথা - তৎকালীন পরিচালক সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল স্কুলটির আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধিকরা- ছাত্রদের শিক্ষাদানের মান উন্নত করা নয়। একারণেই দেখা যায় ১৮৭১-৭২ সালে তমলুক ইংরাজী স্কুল থেকে ইউনিভারসিটি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সমস্ত ছাত্র অকৃতকার্য্য হয়।[১৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দিকে মেদিনীপুর জেলায় যে চারটি ইংরাজী স্কুল ছিল তাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫২৩ জন। এর মধ্যে হিন্দুছাত্র ছিল ৪৯১ জন, মুসলমান ২৭ জন ও ক্রিশ্চান ৫জন। স্কুলে সবথেকে বেশি ছাত্র এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেনী থেকে ৪৬৩ জন। এছাড়া উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেনী থেকে ১৫ জন এবং নিম্নশ্রেনী থেকে ৪৫ জন।[১৭] মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল ও তমলুক হামিলটন্ স্কুল ইংরাজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থানীয় বাঙালীরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। মেদিনীপুর টাউনস্কুল ও মহিষাদল রাজ স্কুলটি সম্পূর্ণভাবে বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। "বাংলার জনসাধারণের আগ্রহে ও হিন্দুপ্রধানদের উদ্দেশ্যেই ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। আর এই শিক্ষা যে কেরানীকুল তৈরী করবার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়নি, তৎকালে ইউরোপীয় প্রথায় যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা ও ভাবনার ভিত্তিতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিভাগের অনুশীলন দ্বারা মানসিক উন্নতি এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মশক্তির নব নব উদ্দীপনাই যে এর আদর্শ ছিল তৎকালের নূতন প্রণালীতে শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দের চিন্তা ও কার্যধারা আলোচনা করলেই তা বেশ বোঝা যাবে।"[১৮]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত পারসিক ভাষা ছিল কোর্টের ভাষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ইংরাজী ভাষার খুব একটা কদর ছিল না মেদিনীপুর জেলায়। ১৮৪৪ সালে সরকার একটি প্রস্তাব নিয়েছিল যে ইংরাজী জানা ব্যক্তিকে সরকারী কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কোর্ট, কাছারিতে ধীরে ধীরে পারসিক ভাষা অন্তর্হিত হতে থাকলে, তার জায়গা দখল করতে থাকে ইংরাজী। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষায় বেশি আগ্রহী হয়। গ্রামে বা শহরের যে সব জায়গায় ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল সে সব জায়গা শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর বলে বিবেচিত হতে থাকল। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে গ্রামেও ইংরাজী শিক্ষার কদর বাড়ল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। জেলার প্রায় প্রত্যেক জমিদার তার জমিদারীর মধ্যে একটি করে ইংরাজী স্কুল খুলতে শুরু করল মূলতঃ আভিজাত্যের প্রতীক

রূপে। এই সময় ছেলেদের ইংরাজী স্কুলে পড়ানোর মূল কারণ ছিল পরিবারের আয় বৃদ্ধি ঘটানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভ তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত মর্যাদাকর বলে বিবেচিত হত। তখন এন্ট্রান্স পাশ করা যে কোন যুবকের বিয়ের বাজারে অত্যন্ত চড়া দর ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে তো কথাই নেই।[১৯] এসময় ধীরে ধীরে সংস্কৃতের কদর কমছিল। যদিও ব্রাহ্মনদের কাছে জীবিকার প্রয়োজনে তখনও সংস্কৃত শিক্ষার চাহিদা ছিল। তবে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মন সন্তানরাও সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে ইংরাজী পাঠ শুরু করে। মুসলমানদের মধ্যেও ক্রমশঃ কমে আসছিল গতানুগতিক শিক্ষার প্রভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের দিকে মেদিনীপুর জেলায় আরও কয়েকটি ইংরাজী উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কন্টাই হাইস্কুল, গড়বেতা হাইস্কুল, বীরসিংহ ভগবতী হাইস্কুল, ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাইস্কুল প্রভৃতি। কাঁথি মহকুমার বুকে জন্ম নেয় প্রথম বিদ্যালয় (অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল) ১৮৫৭ সালের ২০শে মার্চ। শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ও সল্টএজেন্ট জি. ডব্লিউ. বেলী সাহেবের সহায়তায় এবং বেলী সাহেবের বাংলোতেই ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয় রূপে কাঁথি হাইস্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ সালের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁথিতে আসেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু নিষ্কর সরকারী জমি বিদ্যালয়টি লাভ করে। ভার্নাকুলার এবং অ্যাংলো-ভার্নাকুলার-দুটি বিভাগ নিয়ে স্কুলটি চালু হয়। ভার্নাকুলার বিভাগের মাইনে ছিল মাসিক ২ আনা এবং আংলো-ভার্নাকুলার বিভাগের ৮ আনা। সে সময় যে কোন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম বয়স ছিল ষোল। অথচ বর্তমানে ষোলর মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্র মাধ্যমিক পাশ করে। সপ্তাহের কোন নির্দিষ্ট দিনে পালাক্রমে স্কুল পরিচালক সমিতির সদস্যদের বিদ্যালয় পরিদর্শন ছিল বাধ্যতামূলক। নিয়মভঙ্গ কারী সদস্যকে কৈফিয়ত তলব করা হতো। আর রেকর্ড বুকে লিপিবদ্ধ তাদের মন্তব্য আলোচিত হতো পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে। পরিচালন সমিতির মধ্যে এধরনের দায়বদ্ধতা ও শৃংখলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের উপরও বর্তেছিল। অযোগ্যতার জন্য শিক্ষককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো। শিক্ষকের অধিকাংশ ছুটিই ছিল ছিল বিনাবেতনের। ছাত্রকে টুপি পরিয়ে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।[২০]

শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সুখনচরণ চন্দ্র সম্পাদক। স্কুলের ব্যয় নির্বাহ হতো পরিচালক সমিতির সদস্যদের চাঁদা, স্থানীয় জনগণের দান এবং ছাত্রদের বেতনে। বিদ্যালয়ের করণিকের কাজ প্রধান শিক্ষককেই করতে হতো। স্কুলে দু-জন মালী ছিল। মাইনে ছিল ৫ টাকা ৮ আনা। বিদ্যালয়ের দু-জন মালীর মধ্যে একজনের শুধু কাজ ছিল চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে ঘোরাঘুরি করা। ছাত্রদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান করা হতো। ১৮৬৪ সালের দিকে স্থানীয় চাঁদা আদায়ের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ডি. পি. আই. বাংলা বিভাগ বন্ধ করার আদেশ দেন। এবং এই বছরেই বিদ্যালয়টি মিড্‌ল ইংলিশ স্কুল হিসাবে উন্নীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বছরই প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে খড়ের

চালার এই বিদ্যালয়টির প্রভূত ক্ষতি হয়। অস্থায়ী ভাবে লবণ বণিকের একটি ঘরে উঠে আসে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়টি মেরামতের জন্য স্থানীয় মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সরকারও ৭৫ টাকা অনুদান দেয়। এসময় অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলগুলিতে মাসিব আনুমানিক কত ব্যয় হতো তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই বিদ্যালয়ের ৭ই আগষ্টের বিবরণী থেকে। যেমন- কাঁথি স্কুলে ১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে চাঁদা বাবদ আয় হয় ৫০৯ টাকা ৮ আনা এবং বেতন বাবদ ৩৬ টাকা। এবং ঐ মাসের ব্যয়ের হিসাব হল-হেডমাস্টার (ভারপ্রাপ্ত) ৫০ টাকা, সেকেণ্ড মাস্টার ২০ টাকা, পণ্ডিত ২০ টাকা, ২ জন চাকর ৫ টাকা ৮ আনা। কন্টিনজেন্সি ২ টাকা। মোট ব্যয় ৯৭ টাকা ৮ আনা। ১৮৭৪ সালের সাইক্লোনে আবার বিদ্যালয়টির বিশেষ ক্ষতি হয়। তবু স্থানীয় লোকের সহযোগিতায় স্কুলটি টিকে থাকে। ১৮৮১ সালে বিদ্যালয়টি হায়ার ক্লাস ইংলিশ স্কুল রূপে পরিবর্তিত হয়। এ বছর স্কুলের ছাত্র চন্দ্রমোহন পুরকাইৎ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন।[২১] এর পর থেকেই বিদ্যালয়টি কাঁথি মহকুমা অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

গড়বেতা হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ সালের ২ রা মার্চ। এই স্কুলের প্রথম হেড্ পণ্ডিত ছিলেন পূর্ণচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী। তাঁর মাসিক মাইনে ছিল ১৫ টাকা। সেকেণ্ড মাষ্টারের মাসিক মাইনে ছিল ২০ টাকা এবং থার্ড মাষ্টারের ১৭ টাকা।[২২] গড়বেতা হাইস্কুলের কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাইস্কুল। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সালের ১ লা জানুযারী। বিদ্যাসাগরকে সম্মানিত করতে এবং স্থানীয় অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বালিকা বিদ্যালয়টি হল মেদিনীপুর মিশন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৬৫ সালে একজন মিশনারী শ্রীমতি ব্যাচেলার মানব সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু সংখ্যক রাখাল বালক আর কিছু সংখ্যক কাঠ কুড়ানী মেয়ে নিয়ে তাঁর আবাসেই শুরু করেন পঠনপাঠনের কাজ। দরিদ্র, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধেই নিহিত ছিল এই প্রতিষ্ঠানের সুপ্ত বীজ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় নিয়মিত পঠনপাঠন। এই বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে।[২৩]

হান্টারের বিবরণ থেকে জানতে পারি—মেদিনীপুর জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দিকে হায়ার ক্লাস স্কুল ছাড়া আরো ছ-ধরনের স্কুল ছিল। যথা (১) মিড্‌ল ক্লাস ইংলিশ স্কুল (২) মিড্‌ল ক্লাস ভার্নাকুলার স্কুল, (৩) প্রাইমারী স্কুল, (৪) নর্মাল স্কুল, (৫) গার্লস স্কুল ও (৬) অপরিদর্শিত দেশীয় স্কুল (Uninspected Indigeneous School)।

সারা মেদিনীপুর জেলায় সরকারী মিড্‌ল ক্লাস ইংলিশ স্কুল কোথাও ছিল না। তবে বে-সরকারী এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কিছু স্কুল ছিল। প্রায় ১৬টি। এর মধ্যে ৪টি বেশ ভাল, ৭টি সুন্দর (Fair) ৪টি মাঝারি এবং ১টি নিম্নমানের। এই নিম্নমানের স্কুলটি অবস্থিত ছিল মংলাপোতায়। আর্থিক দিক থেকে এই স্কুলটি ছিল বিপর্যস্ত। আরো দুটি স্কুল যথা ছাত্রগঞ্জ মিড্‌লক্লাস ইংলিশ স্কুল ও কাদরা মিড্‌লক্লাস ইংলিশ স্কুলের আর্থিক কাঠামো বেশ নিম্নমানের

ছিল। কিন্তু গড়বেতা মহকুমার অন্যান্য স্কুলগুলিও আর্থিক ও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে নিম্নতর হয়ে পড়ে। ছাত্রগঞ্জ স্কুলের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ার কারণ ছাত্রগঞ্জ থেকে জমিদারী স্থানান্তর ও মহকুমা শাসকের অবহেলা। ঝাড়গ্রামে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ভাল স্কুল স্থাপিত হয়। স্কুলটির অর্থাভাব ছিল না। তবে ভাল শিক্ষক পাওয়ার সমস্যা ছিল। জঙ্গলের মাঝে শিক্ষকতা করতে এবং থাকতে অনেকে চাইতো না। কারণ-ঝাড়গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ভাল ছিল না বল্লেই চলে। ঝাড়গ্রামের তখনকার রাজা অশিক্ষিত হলেও তাঁর করণিক, পোষ্যব্যক্তি ও চাকরবাকরদের সন্তান সন্ততিকে ঐ স্কুলে পাঠ গ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা দিতেন। কোন কোন সময় (প্রয়োজনে) বাধ্য করতেন। তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের মোড়লদের ডেকে তিনি ঐ সব অঞ্চলের বালক বালিকাদের ঝাড়গ্রাম মিড্‌ল ক্লাস ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতেন। গ্রামের ছাত্ররা যাতে বিদ্যার্জন করতে পারে সেজন্য তিনি ঝাড়গ্রামে ছাত্রাবাস নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি নিজের নাতিকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে রাজার ছেলে, প্রজার ছেলে, সাঁওতাল ছেলে এসব বিভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সমস্ত ধর্ম ও বর্ণের ছাত্রের ছিল সমমর্যাদা ও সমসুযোগ।[২৭] ঝাড়গ্রাম স্কুল ছাড়া অন্য যে সমস্ত স্কুল একজন মাত্র ব্যক্তির বদান্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল সেগুলি হল মংলাপোতা, সরবারিয়া,রংগুয়া এবং নারায়ণগড় মিড্‌ল ক্লাস ইংলিশ স্কুল। গড়বেতা, বালিহারপুর ও দাঁতন স্কুল গুলির প্রধান আয় ছিল ছাত্রদের কাছ থেকে সংগৃহীত মাইনে ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক দান। সত্তরের দশকের দিকে এ সমস্ত স্কুলগুলিতে হিন্দু ছাত্র ছিল ৮২৬ জন, মুসলমান ৩০ জন এবং ক্রিশ্চান ৮ জন, ৬টি ছাত্র ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের, ৪৮৩টি ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের এবং ৩৭৫ টি ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারের।

উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দিকে মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৩৩টি মিড্‌ল ক্লাস ভার্নাকুলার স্কুল ছিল। ৭টি সরকারী, বাকি ২৬টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। সরকারী স্কুলগুলির মধ্যে ৪টি খুব ভাল চলত। আদর্শ স্কুল রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। জেলার দক্ষিণে ও সদর শহরে অবস্থিত স্কুলগুলি উন্নত মানের ছিল। জেলার পশ্চিমের ২টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ভাল ছিল না। কারণ এই সময় পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষার আগ্রহ তেমন ছিল না। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক স্কুলে শিক্ষার পরিকাঠামো ভাল ছিল। এগুলির আর্থিক অবস্থাও খারাপ ছিল না। পাথরা ও গোবর্দ্ধনপুর স্কুলের যথেষ্ট সুনাম ছিল। মহাপাল ও তিলোনতোপারা স্কুলের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন জনৈক ব্যক্তি। বাকি স্কুলগুলিতে মধ্যবিত্তরা সমবেত ভাবে আর্থিক সাহায্য ও পরিচালনা করত। সত্তরের দশকে এ সমস্ত স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ১৬৪২ জন। এর মধ্যে হিন্দু ১৫৯৫ জন, আর মুসলমান ৪৭ জন। ছাত্রদের মধ্যে আর্থিক বিভাজন করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক— ৮৫২ জন। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ২ জন এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ৭৮৮ জন। মেধাবী ছাত্ররা এইসব স্কুল থেকে

স্কলারশিপ পেত। স্কলারশিপ ছিল দু-ধরণের। একটি চার বছর মেয়াদী। অন্যটি একবছরের জন্য। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল থেকে ৫টি ছাত্র চার বছর মেয়াদী ও ৪টি ছাত্র এক বছর মেয়াদী স্কলারশিপ পেত। স্কলারশিপগুলি দিত সরকার। কোন কারণে কোন স্কুলের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে ঐ স্কুলের সরকারী অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হত।গরীবদের শিক্ষালাভের সুযোগ তখনকার সময় ছিলনা বল্লেই চলে। সে কারণে নিরক্ষর কিশোর ও যুবকরা পিতৃপুরুষের পেশা গ্রহণ করত।[২১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলায় মেয়েদের পড়ার সুযোগ যে ছিল না তা নয়। তবে তা প্রয়োজনের তুলানায় ছিল খুবই কম। সারা জেলায় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩টি। মেদিনীপুর শহর, তমলুক ও চাঁদপুরে। মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭২ জন। এরমধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর ৬০ জন এবং নিম্নবিত্ত শ্রেনীর ১২ জন। এই জেলায় শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এরা অনাথ বালিকাদের জন্য মেদিনীপুর শহরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। (মেদিনীপুর মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই উক্ত হয়েছে।) ব্যাপটিষ্ট মিশনের সদস্য সদস্যারা মেদিনীপুর শহরের ৭৮ জন মহিলাকে শিক্ষা দিতে শুরু করে। কয়েকজন শিক্ষালাভে পারদর্শিতা দেখায়। এই মিশনের একজন ছাত্রী ইংলন্ডের চার্চে যোগদান করায় কিছুটা আতংকের সৃষ্টি হয়। পরিণামে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা হ্রাসও পায়। পূর্বে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাইনে নির্ধারিত হত ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে। পরে এই নিয়মের পরিবর্তন হয় এবং যে সব ছাত্রী তালপাতায় অন্ততঃ লিখতে পারে এবং সহজ ও সরল বাক্য পড়তে পারে তাদের সংখ্যার অনুপাতেই সরকার কিছুটা আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে।[২২] জেলায় স্ত্রী শিক্ষা.সম্বন্ধীয় চেতনা এ সময় বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা লেখা হয়। ঐ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন অগ্রণী হলেও তাঁর প্রচেষ্টা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই অধিক প্রযুক্ত হয়েছিল। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এ সময় মিশনারীদের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। কারণ সরকার ও জনসাধারণের মিশনারীদের ওপর বিশ্বাস ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পর অনেক ইংরেজের ধারণা হয় যে মিশনারীদের কার্যকলাপ বিপজ্জনক। এইজন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারানীর ঘোষনায় ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার কথা বিশেষ করে বলা হয় এবং তারপর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ নীতির প্রয়োগে কড়াকড়ি বেড়ে যায়। তাই সরকার প্রত্যেক স্কুলের লাইব্রেরীতে একটি করে বাইবেল রাখার ব্যবস্থার বেশি অগ্রসর হতে রাজি হয় নি। সরকারী সাহায্যনীতির ফলে এ সময় ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের পরিবর্তে ভারতীয় প্রচেষ্টাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু এর ফল সর্বাংশে শুভ হয়নি। অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাছাড়া স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহের ফলে এমন সমস্ত স্কুল গড়ে উঠেছিল যেগুলি সরকারী সাহায্য বা অনুমোদন টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারছিল না। ভাল শিক্ষকের অভাব, অনভিজ্ঞতা ও আর্থিক দুর্দশার জন্য বেশ কিছু

মাধ্যমিক স্কুলের মান অনেকাংশে নিম্নগামী হয়েছিল।[১০]

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজীর সমর্থন করা হলেও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। তাতে অ্যাংলো ভার্নাকুলার ও ইংরেজী এই দুই প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলা হয়েছিল যে অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলের মান স্বভাবতঃই নিচু হলেও উভয় প্রকারের বিদ্যালয়ের মানের পার্থক্য নিরসনের চেষ্টা করা হবে। কিন্তু বাংলা দেশে বাংলা ভাষার ব্যবহারে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। মাতৃভাষা ভাল করে শেখাবার আগে, প্রথম থেকে, তার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা একটি বিষয়রূপে শেখানো হতো। অ্যাংলো ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষায় পড়ানো হতো এবং সপ্তম শ্রেনী থেকে বাংলা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় ইংরাজীতে পড়ানো হতো। ১৮৬১ সাল পর্যন্ত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল, অংক ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বাংলা ভাষাতে দেওয়ার বিকল্প ছিল। কিন্তু ১৮৬১ সালের পর সব প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতে লিখতে বলা হল। এরপর আর অ্যাংলো ভার্নাকুলার বিদ্যালয়গুলির আত্মরক্ষার উপায় রইলো না।[১১]

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত কোম্পানী কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত পরীক্ষামূলকভাবে চলছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে "জীবনের প্রত্যেক স্তরে উপযোগী প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী শিক্ষা" এবং "যাদের নিজব্যয়ে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা নেই" তাদের শিক্ষার উল্লেখ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশকে পরিকল্পনার স্বাধীনতা দিয়ে , আদর্শস্বরূপ মি: টমসনের পদ্ধতির উদাহরণ দিয়ে, দেশজ বিদ্যালয়গুলিকে বিচক্ষণ পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা সাধারন্যের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অধিক মনোনিবেশের সুযোগ ছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সরকারী দৃষ্টি উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে অধিক নিবদ্ধ থাকায় এই শিক্ষা আশানুরূপ অগ্রসর হয়নি। ১৮৫৯ সালের পরে ভূমিকরের ১/২% থেকে ৭১/২% পর্যন্ত অনুপাতে ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষাকর বসানোর চেষ্টা করা হয়। ১৮৭৩-৭৪ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসে এবং তার রিপোর্টে ভূমিকরের উপর যেকোন নতুন কর স্থাপনের বিরোধিতা করা হয়। এইভাবে বাংলার সরকার সাহায্যনীতির দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করতে বাধ্য হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দিকে কয়েকধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সরকারী প্রাথমিক স্কুল , বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল ও মিশন পরিচালিত প্রাথমিক স্কুল। কয়েকটি নৈশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলাভাষা, বিদ্যালয়ের গৃহ ও আসবাব প্রভৃতি যতদূর সম্ভব সুলভ ও সরল ছিল। গ্রাম্য ও পশ্চাদপদ অঞ্চলে স্কুলের ছুটি ও ক্লাস বসার সময় স্থানীয় প্রয়োজনানুযায়ী নির্ণীত হত। কিছু দরিদ্র ছাত্রে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ ছিল। সারাদিন যারা জীবিকার জন্য কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের জন্য জেলায় চারটি নৈশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। একটি মেদিনীপুর শহরে, আরেকটি পরমানন্দপুরে বাকি দুটি স্থানের নাম জানা

যায়নি। মেদিনীপুরের আদিবাসী এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের মূল কৃতিত্বের অধিকারী আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন। এরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে ৪২ টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করে। এই প্রাথমিক স্কুলগুলিই পাঠশালা নামে সাধারণভাবে পরিচিত ছিল। পাঠশালাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের ভাল হাতের লেখা শেখানো, দলিল ও চিঠি লিখতে ও পড়তে শেখানো, মৌখিক হিসাব ও কিছু নীতি কথা শেখানো। এ সমস্ত পাঠশালায় নিম্নশ্রেনীর ছাত্ররাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোট ৫৬৭১ জন ছাত্রের মধ্যে হিন্দু ৪৭৮৯ জন, মুসলমান১৯৩ জন এবং ক্রিশ্চান / সাঁওতাল ৬৮৯ জন।[২২]

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কিছু নর্মাল স্কুল খোলা হয়েছিল। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল নর্মাল স্কুলে প্রশিক্ষণ না নিয়ে কেউ কোন স্কুলের ভা এপ্রাপ্ত শিক্ষক হতে পারবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলায় দুটি নর্মাল স্কুল ছিল। একটি সরকারী, অন্যটি কিঞ্চিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। সরকার বেসরকারী স্কুলের তুলনায় সরকারী স্কুলে দ্বিগুণ খরচা করতো। আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশনের চেষ্টায় সাঁওতালদের মধ্যে এ সময় ভাল শিক্ষার বিস্তার হয়। একজন সাঁওতাল শিক্ষক ট্রেনিং- এ বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। সে কারণে তিনি স্কুল পরিদর্শকের পদে উন্নীত হন। নর্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হয়েকেউ অকৃতকার্য্য হত না বল্লেই চলে। প্রত্যেক ছাত্রই কিছুটা করে সরকারী বৃত্তি পেত। ১৮৭১-৭২ সালে জেলার নর্মাল স্কুলের ৫১ জন ছাত্রের মধ্যে ৫০ জন পাশ করে।[২৩]

১৮৭২ সালে ছোটলাট জর্জ ক্যাম্বেল দেশজ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে জনশিক্ষার প্রচার কল্পে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করেন। সাধারণ গুরু মহাশয় শ্রেনীর পন্ডিতদের ওপর দেশের লোকের অধিক আস্থা দেখে তিনি তাদের দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থন করতেন এবং বেশি শিক্ষা পেলে গ্রামের লোকেরা পিতৃ কর্ম ছেড়ে দেবে বলে মনে করতেন। তাই দোকানদার ও তালুকদার, মোড়ল , ছুতোর, তাঁতি, কামার, মাঝি, জেলে প্রভৃতি সাধারণ লোকের স্বার্থরক্ষার উপযোগী সামান্য লেখাপড়ার চেয়ে উচ্চমানের শিক্ষার দরকার নেই বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে শিক্ষার মান নীচু করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে - যারা বাস্তবিক কৃতিত্ব দেখাতে পারবে তাদের বৃত্তির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার মান নীচু ও ব্যয় কম হওয়ায় অনেক বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যের অধীন হয়, কিন্তু শিক্ষকদের সরকারী ভাতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদনুপাতে তাদের বেতন কমিয়ে দিতে থাকেন। এই দুর্নীতি দূর করার জন্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মি: এইচ. এল. হ্যারিসন তাঁর জেলায় পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি, পুরস্কার ও সাহায্যদানের যে নীতির প্রর্বতন করেন, ১৮৭৩ সালে ছোট লাটের আদেশে সেই নীতি বঙ্গ দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়। এই নিয়মে ১৮৭৩ সাল থেকে সমগ্র বাংলাদেশে বৎসরে দুটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নেওয়া হত। একটি সাবসেন্টার পরীক্ষা, অন্যটি সেন্ট্রাল পরীক্ষা। সাবসেন্টার পরীক্ষা মানে লেখাপড়া

ও অংকের পরীক্ষা এবং অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে জমিদারী ও মহাজনী হিসেব, শ্রুতিলিপি ও ব্যাখ্যার পরীক্ষা। পরীক্ষা পাশের দুটো শ্রেনী ছিল। শিক্ষক প্রথম শ্রেনীতে পাশ করা প্রত্যেক ছাত্রে জন্য একটাকা ও দ্বিতীয় শ্রেনীতে পাশ করা প্রত্যেক ছাত্রে জন্য আট আনা পুরষ্কার পেত। আরও কয়েকটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করে শিক্ষকদের আয় বৃদ্ধির দ্বারা উৎসাহিত করা হত। আর সেন্ট্রাল পরীক্ষার ফল অনুসারে ছাত্রদের পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়া হত। তার জন্য উপরিউক্ত বিষয় সমূহের গভীরতর জ্ঞান চাওয়া হত। তাছাড়া জমি জরীপের পরীক্ষাও ছিল।[৩১] মেদিনীপুর জেলায় এসময় কিছু অপরিদর্শিত দেশজ স্কুল ছিল। অপরিদর্শিত মানে সরকার কর্তৃক স্কুলগুলি পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এগুলি বেসরকারী স্কুল নামেও পরিচিত ছিল। জেলায় দেশজ স্কুল ছিল ১,৭২৯ টি। আর ছাত্র ছিল১৯.১৭৪ জন। অর্থাৎ গড়ে স্কুল প্রতি ১১ জনের মত। স্কুলগুলি চলত স্থানীয় জমিদার ও জনসাধারনের সাহায্যে। স্কুলগুলির প্রধান কাজ ছিল শিশুদের প্রাথমিক কার্য্যকরী জ্ঞান দান। সরকারের সাথে এ সমস্ত স্কুলগুলির কোন সম্পর্ক ছিল না। সরকার এই সমস্ত স্কুলের খোঁজ খবর নিলে জনগ ণ শঙ্কিত হত। কারণ তাদের ধারণা ছিল সরকার হয় এ সমস্ত স্কুলে কর ধার্য্য করবে নতুবা স্কুল বন্ধ করার আদেশ দেবে। স্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে কোনরূপ কর দেওয়ার ক্ষমতাই ছিল না। কোন দেশজ স্কুলে ২০/২৫ জন ছাত্র পড়লেই তাকে বড় স্কুল বলা হত। জেলার সবচেয়ে বড় দেশজ স্কুলটি ছিল মেদিনীপুর (সদর) থানায়। ১০/১১ ছাত্র নিয়ে মাঝারি স্কুলগুলি ছিল দাসপুর, পটাশপুর, গড়বেতা, তমলুক ও মসলন্দপুরে অবস্থিত। সবথেকে ছোট দেশজ স্কুল গুলি ছিল গোপীবল্লভপুর ও ঝাড়গ্রামে(ঝাড়গাঁও)— শিক্ষক প্রতি ৫/৬ জন ছাত্র। সাধারণতঃ একটি স্কুলে একজন শিক্ষক থাকতেন। আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশজ স্কুলগুলি ছিল রঘুনাথপুর,কন্টাই, এগরা, সুতাহাটি, দাঁতন, ভগবানপুর ও নারায়নগড়ে অবস্থিত। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— মেদিনীপুর জেলে বন্দীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক নিয়োগ করা হতো বন্দীদের মধ্য থেকে। পঠন পাঠনের সময় নির্দ্ধারিত ছিল প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা। সেন্ট্রাল জেলে ৫০ জনের এবং ডিস্ট্রিক্ট জেলে ৩০ জনের পড়ার সুযোগ ছিল।[৩২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল থেকে বিভিন্ন জেলায় সদর কার্যালয় ও মহকুমা কার্যালয়কে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট শহর গড়ে উঠতে থাকে। এই নবগঠিত মহকুমা শহরগুলি প্রশাসন,ব্যবসা ও শিক্ষা দীক্ষার কর্মস্থল হয়ে উঠতে থাকে। মফস্বলের কিছুকাংশেও কিছু বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। তবে এ সময় বিভিন্ন জেলায় সংস্কৃতির নবচেতনার প্রেরণা এসেছিল কলকাতা থেকে। মেদিনীপুরে শিক্ষা সংস্কৃতির জোয়ার নিয়ে আসেন মূলতঃ দুজন— বিদ্যাসাগর ও রাজ নারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ, যিনি কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে আসীন ছিলেন ১৮৫১ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি এক বিশেষ অনুরাগ এনে দিয়েছিলেন।[৩৩] রাজনারায়ণ বসু ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় শিক্ষা কেবল কলকাতাকেন্দ্রিক থাকলো না-তা হলো গণমুখী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুরে যে

শিক্ষা বিস্তার হয়েছিল তার সিংহভাগ কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের। অথচ বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে কতজন মেদিনীপুরবাসী তথা স্বদেশবাসী সম্পূর্ণ সচেতন তা সংশয়ের অপেক্ষা রাখে। তাই যদুনাথ সরকার দুঃখ করে বলেছেন," এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজিও ভোগ করিতেছে, যদিও তাহারা তাহাদের দাতার নাম জানে না।"[৩১]

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট বঙ্গীয় শিক্ষাকাউন্সিলকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি খসড়া প্রস্তুত করতে বলেন। ওই পত্রের উত্তরের সঙ্গে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত একটি পরিকল্পনা পাঠিয়ে দেন। উক্ত পরিকল্পনায় সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষার মান সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে শুধু সামান্য বাংলা লেখাপড়া আর অংক শেখালেই চলবে না; শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন চরিত, পাটীগনিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানএবং শরীরতত্ত্ব শেখানোর প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকরূপে তিনি কতকগুলি বইয়ের নাম করেছিলেন এবং আরো উপযুক্ত পুস্তকসমূহেরও প্রণয়নেরএকটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন।বিদ্যালয়গুলিতে তিন থেকে পাঁচটি করে শ্রেনী থাকে বলে তিনি অন্তত: দু-জন করে শিক্ষক রাখার কথা বলেছিলেন। গুণ ও উপযোগিতা অনুসারে সাধারন পন্ডিতদের অন্যূন ৩০ অথবা ২৫ অথবা ২০ টাকা এবং হেড পন্ডিতের ৫০ টাকা বেতন দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। আরও প্রস্তাব করেছিলেন যে, যে সমস্ত জায়গায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেখানেই এগুলি স্থাপন করতে হবে। কেননা ইংরাজি স্কুল কলেজের আশেপাশে বাংলা শিক্ষার আদর হবে না।দেশবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য হার্ডিঞ্জনীতির পুনর্ঘোষণার সুপারিশ করেছিলেন। এইরকম আরো কিছু সুপারিশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয়নি।

বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়সমূহের সরকারী ইন্সপেক্টার নিযুক্ত হয়ে ১৮৫৫ সালের ২২শে আগস্ট থেকে ১৮৫৬ সালের ১৪ই জানুয়ারীর মধ্যে স্থাপন করেছিলেন ২০টি আদর্শ বিদ্যালয়। এর মধ্যে ৬টি বিদ্যালয় ছিল মেদিনীপুর জেলায়; ক্ষীরপাই(১৮৫৫, ১ নভেম্বর), গোপালনগর (১৮৫৫, ১অক্টোবর), বাসুদেবপুর (১৮৫৫,১ অক্টোবর), মালঞ্চ (১৮৫৫, ১ নভেম্বর), প্রতাপপুর (১৮৫৫, ১৭ ডিসেম্বর) ও জক্‌পুরে (১৮৫৬,১৪ ই জানুয়ারী)।[৩২]

ইন্সপেক্টর পদে নিয়োজিত থাকার সময়ে বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। সার্কেল- সিষ্টেমের[৩৩] অধীনে তিনি ছেলেদের মতো মেয়েদের জন্যও বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকেন। তখনকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আংশিক স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় উদ্যমের অভাববশতঃ বিদ্যাসাগর সেগুলির জন্য পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় জেলায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী ডাঙ্গাবন্ধে। একই বৎসর আরো কয়েকটি জায়গায় বিদ্যালয় খোলা হয়। যথা-১০ই মে বদনগঞ্জে, ১৫ই মে শান্তিপুরে, ১৬ই মার্চ রামজীবনপুরে এবং ১ লা

এপ্রিল বীরসিংহে। কিন্তু সরকার স্কুলগুলিকে কোন আর্থিক সাহায্য দিতে সম্মত হল না। কারণ এক, স্কুলগুলি শুরু করার আগে সরকারের অনুমতি নেওয়া হয়নি। দুই, বিদ্যাসাগর নিজের গ্রামেই কেন স্কুল খুলেছেন, তিন, বীরসিংহ, কুরান ও উদয়গঞ্জ এই স্কুলগুলি কাছাকাছি স্থাপিত হয়েছে। একটি স্কুল থেকে আরেকটি স্কুলের দূরত্ব এক মাইলের কম।[৬৭] অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর, বিশেষতঃ পদত্যাগের হুমকির পর তিনি সরকারের কাছ থেকে উদয়গঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১৪ টাকা এবং বীরসিংহ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১২ টাকা ১৮৬২সালের জুন মাসে মঞ্জুর করান।[৬৮]

মেদিনীপুর জেলায় জনশিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের দান অতুলনীয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট মেদিনীপুর শহরের বুকে এক বিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করে 'বঙ্গ বিদ্যালয়' বা 'বাংলা স্কুল' নামে। এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঋষি রাজনারায়ণ বসু দীর্ঘদিন এই বিদ্যালয়টির পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। পরে এক সময় এই স্কুলটির নাম হয় হার্ডিঞ্জ এম. ই. স্কুল। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী এই বিদ্যালয়টি 'বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ' নামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের বালকদের শিক্ষার সুবিধার্থে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর নিজগ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বীরসিংহে স্কুল স্থাপনের সময় নিজে কোদাল নিয়ে মাটি কেটেছেন, জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন, নিজে অর্থদান করেছেন, অর্থ সংগ্রহ করেছেন। স্কুলবাড়ি তৈরী করেছেন। সরকারী স্বীকৃতিলাভ ও আর্থিক অনুদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ, ক্ষেত্র বিশেষে চাপ দিয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা বিফল হয়নি। আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার বছর তিনেক বাদে দেখা গেল ছাত্রেরা লেখাপড়ায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, সর্বত্র এই বিদ্যালয়গুলি সমাদৃত হচ্ছে।[৬৯] বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বীরসিংহের বিদ্যালয়টি সম্ভবতঃ ১৮৭৫ সালে প্রবল ঝড় ও ব্যাপক ম্যালেরিয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৭০] ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ ই এপ্রিল তিনি এই বিদ্যালয়ের পুন: প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় জননীর নামে এই বিদ্যালয়ের নাম দেন বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি ইনস্পেক্টার অব স্কুলস (সাউথ বেঙ্গল) লজ সাহেব পরিদর্শন করে একটি সুন্দর রির্পোট দেন। রির্পোটে বলা হয়েছে বীরসিংহের স্কুলটি মূলতঃ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রেরই কীর্ত্তি, স্কুল গৃহ নির্মাণকালে তিনি স্থানীয় জনগণের সাহায্য নিয়েছেন সত্য। তবে স্কুল পরিচালনার অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনি নিজেই জোগান দিয়েছেন। অথবা তিনি নিজের একক প্রচেষ্টাতে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। ছ-সাতজন শিক্ষককে মাস মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই স্কুলের ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত। বিনামুল্যে পাঠ্যবই পেত। সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা জাগে এই ভেবে যে, প্রায় ৩০ জন গরীব ছাত্র নিখরচায় তাঁর বাড়িতে থাকা খাওয়া করে পড়াশুনা করত। এসব ছাত্রদের পরনের বস্ত্র ও চিকিৎসার খরচ বিদ্যাসাগর নিজে বহন করতেন। যে সমস্ত গরীব ছাত্র তাঁর বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতো

তারা বিদ্যাসাগরের পরিবারের সদস্যদের মতই থাকতো। এই স্কুলে সংস্কৃত ছিল প্রধান বিষয়। সহকারী ভাষা হিসেবে এই স্কুলে নিম্নশ্রেনীতে বাংলা ও উচ্চশ্রেনীগুলিতে ইংরাজী পঠিত হত। স্কুলটির আটটি শ্রেণী ছিল। ১৬০ জন ছাত্রের নাম বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল। লজ সাহেবের বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিন ১১৮ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল।[১১]

এই প্রসঙ্গে স্কুলটি সম্বন্ধে একটি মামলার কথা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য একটি উইল করে যান। বিদ্যাসাগর উইলে তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে "যথেচ্ছচারিতা ও কুপথগামিতার" জন্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯২ সালে নারায়ণ চন্দ্রের পুত্র প্যারিমোহন ও শাশুড়ী সারদাদেবী হাইকোর্টে উইলের বৈধতা সম্পর্কে অভিযোগ আনেন এবং আদালতের রায়ে নারায়ণ চন্দ্র সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু সম্পত্তির অধিকার পেলে উইলে উল্লিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি নির্দিষ্টহারে বৃত্তি ও মাসোহারা দেওয়ার আইনানুগ দায়িত্ব নারায়ণ চন্দ্রের উপরই বর্তেছিল। কিন্তু নারায়ণ চন্দ্র সম্পত্তির মালিক হওয়ার পর বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক অনুদান বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়, এই অনুদান বন্ধ করার জন্য যাতে তিনি আইনের কোপে না পড়েন সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ঠাকুরদাস ইনস্টিটিউশন' নাম রাখেন। জনসাধারনের ক্ষোভে ও বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায়১৮৯৬ সালের ২০শে মে স্কুলটি পুনরায় 'ভগবতী বিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়। ১৮৯৯ সালে ইংরেজ সরকার স্কুলটির পরিচালনার ভার নারায়ণচন্দ্রের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘাটালের এস.ডি.ও.-র হাতে দেন।[৪১]

বিদ্যাসাগর শুধু বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন নি, তিনি প্রায় একই সময় স্থাপন করেন নাইট স্কুল বা রাখাল বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল পরিদর্শক এইচ.এল. হ্যারিসন বালিকা বিদ্যালয়টি সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছেন, " The best aided girls' school in my division is at Beersing, the home of Baboo Eshwar Chandra Vidyasagar whose daughter is the most forward girl I have met with in any of the aided school." বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম ডিভিশনের আর এক স্কুল পরিদর্শক আর.এল. মার্টিন তাঁর ১৮৭০-৭১ সালের রিপোর্টে এই বীরসিংহ বিদ্যালয়টির শিক্ষাদানের উৎকর্ষতা ও সুপরিচালনার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন," The well known pundit suppots a school at his native village Beersingha, the senior pupils of which, as a rule, compete at the vernacular competitive examination. There is a very good instuctive staff kept and the school is excellently managed. It supplies a good and useful education to a large number of boys".[৪২]

তবে দু:খের বিষয় হ্যালিডে সাহেবের সহানুভূতি সত্বেও বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়গুলি উঠে যায় মূলত:সরকার ও আমলাতন্ত্রের বিমুখতায়। বাংলা ভাষার মধ্যদিয়ে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের প্রয়াসও প্রায় ব্যর্থ হয়ে যায় দুটি কারণে -এক, হ্যালিডের পরে (১৮৬২) কোন সরকারী অফিসারই সেকাজে বিশেষ উৎসাহবোধ করে নি। বরং নতুন শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়কগণ আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিতেই শিক্ষাচালনা চাইতো, শিক্ষার প্রসার চাইতো না। অন্যদিকে শুধু বাংলা শিখে চাকরির বাজারে যখন কারও কোন বিশেষ সুবিধা হল না তখন বাঙালী ভদ্রলোকেরাও গ্রামে বা শহরে বাংলা স্কুলের উপর বিমুখই হতে থাকল। বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল জাতীয় জীবনকে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় বা সভ্যতায় সমুন্নত করে তোলা। অন্যদিকে বাঙালী ভদ্রলোকের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পদ, মান ও সুযোগ সুবিধার জন্য ইংরাজী শিক্ষা। ভদ্রশ্রেণী ছাড়িয়ে, নিম্নতর শ্রেণীতে যথার্থ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে, ভদ্রশ্রেণীর পক্ষে চাকরির ভাগীদার অনেক জুটে যাবে- ভদ্রশ্রেণীর এ ধরনের শঙ্কাও ছিল। বাংলায় শিক্ষা না হলেও ভদ্রলোকদের আপত্তি নেই, জনশিক্ষা বাড়লেই বরং ভদ্রলোকদের বিপদ বাড়তে পারে। তাদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে। এভাবেই জনশিক্ষার প্রয়াস অন্যান্য জেলার মত মেদিনীপুর জেলাতেও খর্বিত হয়।[৪৪]

উনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলাতে একমাত্র টেকনিক্যাল স্কুল ছিল মহিষাদলে। নাম 'মহিষাদল টেক্‌নিক্যাল স্কুল'। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৫ সাল। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান হিসাবে সংগৃহীত হয়েছিল। স্থানীয় শিক্ষাপ্রিয় জনগণ ও প্রধানত: মহিষাদলের রাজার কাছ থেকে। স্কুলটির বাৎসরিক আয়ের মূল উৎস ছিল উক্ত পাঁচ হাজার টাকার কিছুকাংশের বিনিয়োগজাত লভ্যাংশ, প্রাদেশিক রাজস্ব তহবিল থেকে এবং জেলা তহবিল থেকে অনুদান। স্কুলটি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এফিলিয়েশন পেয়েছিল। স্কুলটিতে 'Sub-overseer's standard'পর্যন্ত পড়ানো হতো। শিক্ষাক্রমের প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ষের পাঠ্যক্রম ছিল যথাক্রমে ছুতার শিল্প ও ধাতু শিল্প। ১৯০০-০১ সালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। কারিগর ও শ্রমজীবী শ্রেণীর কোন সন্তান বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল না। এই স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্র আসতো মেদিনীপুর কলেজ থেকে। মেদিনীপুর কলেজে যারা 'বি-কোর্স'[৪৫] নিয়ে পড়তো, তারাই ঐ কোর্সের 'টেকনিক্যাল অংশ' পড়ার জন্য এই স্কুলে আসতো। কেউ কেউ এই স্কুলটিকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অর্ন্তগত একটি টেকনিক্যাল স্কুল বলা অপেক্ষা 'Feeder school' বলা সঙ্গত মনে করতো। তবে ১৯০৫ সালে এই স্কুলটির অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ এই স্কুলটির এফিলিয়েশন বাতিল করার সুপারিশ করেছিলেন। অবশেষে স্কুলটিকে রক্ষা করার জন্য একটি 'কড়া কমিটি' (Strong Committee) গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্য করা হয় ডিসট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার, পি. ডাব্লিউ. ই-র এক্‌স্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের চিফ্ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে।[৪৬] স্কুলটি সম্পর্কে

Mr. J.G. Cumming, I.C.S. লিখেছিলেন,"The school does not, and is not, likely to turn out men who will become practical mechanics. The system of apprenticeships for the Kharagpur Railway Workshops gives an opening to any passed pupil who wishes to obtain practical and remunerative employment, but every applicant must remember that there is far more drudgery to be undergone in a commercial workshop than in the workshop attached to an academical institution."[৪৮]

জেলার প্রথম কলেজ মেদিনীপুর কলেজ,প্রতিষ্ঠিত হয়১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। মতান্তরে ১লা ফেব্রুয়ারী। কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৭৩সালের ৩০ শে জানুয়ারীতে কলেজটি শতবর্ষ অতিক্রম করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। এই কলেজটির উদ্ভব মেদিনীপুর জিলা স্কুলের (বর্তমান কলিজিয়েট স্কুলের) শাখা হিসেবে। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত এর কোন পৃথক সত্ত্বা ছিল না। সরকারী জিলা স্কুলের সঙ্গেই এফ.এ (First Arts) ক্লাস শুরু হয়। কলেজ বিভাগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা একই পরিচালকমন্ডলীর অধীনে পরিচালিত হত।[৪৯] তৎকালের অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত এই স্কুল শিক্ষা বিভাগ (Director of Public Instruction) ও একটি জেলা স্কুল কমিটির দ্বারা পরিচালিত হত। পৃথকভাবে মেদিনীপুর কলেজ নাম দেওয়া হয়েছে ১৮৭৮ সালের ২৪শে মে। ১৮৮৭ সালের ১লা জুলাই থেকে বিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনার ভার মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটির হাতে অর্পণ করা হয়।[৫০] ১৯২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও কলেজ হিসাবে দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা করে। ১৯২৪ সালের ২০শে আগষ্ট সরকার আবার মিউনিসিপ্যালিটির হাত থেকে দুটি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।[৫১]

মেদিনীপুর জিলা স্কুলের মধ্যেই ১৮৭৩ সালে একটি আইন বিভাগ খোলা হয়। এবং আইনের একজন অধ্যাপকও নিয়োগ করা হয়। ফার্স্ট আর্টস বা প্রথম কলা শ্রেনী (পরবর্তীকালের ইন্টারমিডিয়েট) পাশ করার পর যাতে ছাত্ররা উচ্চতর ওকালতি পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। দেশে উকিল মোক্তারের তখন যথেষ্ট অভাব। এই ওকালতি (Higher Grade Pleadership) পরীক্ষা পাশ করলে তখন জজকোর্টে উকিল হওয়া যেত। পরে ১৮৯২ সালে এই কলেজ ও স্কুলের সঙ্গে বি.এল. ক্লাসও খোলা হয়েছিল কিছু কালের জন্য। তখন এই ল-কলেজ বিভাগের পৃথক কোন সত্ত্বা ছিল না। জিলা স্কুল হিসাবে সেসময় শিক্ষা বিভাগের জেলা কমিটি এই প্রতিষ্ঠানের তদন্ত করতেন।[৫২] খড়্গপুর থানার জকপুর গ্রামের কার্তিক চন্দ্র মিত্র প্রথম এম.এ এবং প্রথম পি.আর.এস। ইনি বি.এল. পাশ করে কলিজিয়েট স্কুলের কলেজ বিভাগের আইন (Law) ক্লাসের অধ্যাপক ছিলেন কিছুকাল।

১৮৭৪সালে কলেজ-ক্লাসের ছাত্ররা যাতে সরকারী বৃত্তি পায় সেজন্য শিক্ষা বিভাগের

জেলা কমিটির নিকট একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু প্রস্তাবটি নাকচহয়ে যায় তিনটি কারণে। কলেজের স্থিতিশীলতার অনিশ্চয়তা আছে। কোন ছাত্রই তখনও এফ.এ. পরীক্ষা দেয়নি এবং কেবলমাত্র মেদিনীপুরের ছাত্রদের মধ্যে কোন পৃথক বৃত্তির সৃষ্টি করলে তাতে বৃত্তির মর্যাদা লঘু হবে। ১৮৭৪ সালে মেদিনীপুর কলেজ থেকে ছাত্ররা প্রথম এফ.এ পরীক্ষা দেয় এবং চন্দ্রশেখর সরকার নামে এক ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এসময় এফ.এ. পরীক্ষার কোর্সটি ছিল নিম্নরূপ।

i) Languages

ii) History

iii) Mathematics- Pure and Mixed

iv)Logic

v) One of the following to be selected by the candidate:

a) Psychology

b) The Chemistry of the Metalloids

I- LANGUAGES

English, and one of the following languages:

Greek, Hebrew, Latin, Arabic, Sanskrit, Persian

দুটি শিক্ষাবর্ষ ধরে এই কোর্সটি পড়ানো হত। বর্ষশুরু হতো মে মাসে এবং শেষ হত জুন মাসে। এফ.এ পরীক্ষার সময়সূচী ও ফলপ্রকাশের দিনক্ষণ শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভেই জানিয়ে দেওয়া হত। নির্দিষ্ট ছিল, প্রত্যেক বৎসরের ডিসেম্বরের প্রথম সোমবার পরীক্ষা শুরু হবে এবং ঐ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে যেদিন পরীক্ষা শেষ হবে তার পরের চতুর্থ সোমবার সকালে।[৭৩] উল্লেখ্য, ১৮৭৭ সালের পূর্বে এন্টার্স ও এফ.এ. পরীক্ষা মেদিনীপুরে হত না- কলকাতায় হত। এসময় কলেজের ছাত্রদের মাসিক মাইনে ছিল ছ-টাকা।

প্রথম থেকে মেদিনীপুর কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ, কেবল ফার্স্ট আর্টস ক্লাসই ছিল। জিলা স্কুলের নাম ঠিক কবে থেকে 'কলেজিয়েট স্কুল' হয় তা সঠিকভাবে বলা যায়না। তবে জেলা কমিটির অধিবেশনের১৮৮২ সালের ২রা জানুয়ারীর কার্য্যবিবরণীতে 'কলেজিয়েট স্কুল' উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অনুমান করা হয় ১৮৮২ সালের ২রা জানুয়ারীতেই মেদিনীপুর জিলা স্কুলের নাম 'কলিজিয়েট স্কুলে' রূপান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে কলেজ বিভাগের জন্য পৃথক অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হয়। নতুন অধ্যক্ষ হলেন আর. এল.মৈত্র। স্কুল ও কলেজ বিভাগের পৃথক সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হল। কলেজের জন্য দুটি আলাদা নতুন কক্ষ নির্মিত হল। দুটি নতুন অধ্যাপকের পদও সৃষ্টি হল। মেদিনীপুর কলেজ স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে নব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধান শিক্ষক অভয়চরণ বসু হলেন তৃতীয় অধ্যাপক।[৭৪]

মেদিনীপুর জেলায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে কলেজিয়েট স্কুল ও মেদিনীপুর কলেজের দান অপরিসীম। শুধু তাই নয়, এই প্রতিষ্ঠান দুটি জন্ম দিয়েছে বহু কৃতি ছাত্রের। কলেজিয়েট স্কুলের যে সমস্ত ছাত্র বিভিন্ন পেশায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পূর্তবিভাগের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার অঘোরনাথ দত্ত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সূর্যকুমার অগস্তী, কটক র‍্যাভেনশা কলেজের অধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ মজুমদার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্যার আবদার রহিম, মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব কমিশনার ও কেমব্রিজের র‍্যাংলার বীরেন্দ্রনাথ ও আরও অনেকে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে মেদিনীপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র শহীদ সত্যেন(১৮৮২-১৯০৮) ও শহীদ ক্ষুদিরাম (১৮৮৯-১৯০৮) তো আজ কিংবদন্তী। এছাড়াও রয়েছে বহু বীর ও শহীদ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মেদিনীপুরে যে জমিদার গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাকে মূলতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক বহিরাগত জমিদার, দুই স্থানীয় জমিদার। উত্তর পশ্চিম ভারত, পশ্চিম ভারত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কেউ কেউ এসে জমিদারী কিনে মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং ইংরাজীবিদ্যা আয়ত্ব করে ভিন্ন পেশাও অবলম্বন করে। যেমন পশ্চিম ভারত থেকে আগত ঠাকুর দয়াল অগস্তীর পরিবার গড়বেতা অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ঠাকুর দয়াল নিজে গড়বেতা কোর্টে মোক্তারিতে বিশেষ খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করে। তার পুত্র সূর্যকুমার অগস্তী (এম. এ পি. আর. এস. আই. সি. এস.) জেলার স্বনামধন্য ম্যাজিস্ট্রেট্। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অনেকে এসে ছোট অথবা বড় জমিদারীও কেনে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করে ওকালতি ও শিক্ষকতা করতে শুরু করে। জেলার বনেদি পুরানো জমিদারও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও বিস্তারে পিছিয়ে ছিল না। জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল। জমিদার সন্তানরা কলেজী পরীক্ষা শেষ করে শিক্ষকতা করার চেয়ে ওকালতি করাকেই অধিক সঙ্গত বিবেচনা করত। কারণ ওকালতিতে রোজগার তখন ঢের বেশি। ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেদিনীপুর জেলা থেকে উনিশ জন স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে। এই উনিশ জনের মধ্যে কেবল তিনজন শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিল। ওকালতিতে তখন অর্থ ও সম্মান দুটোই ছিল। তবে শিক্ষকতায় তখন অর্থাভাব থাকলেও সামাজিক মর্যাদার জন্য কেউ কেউ ওকালতি না করে পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছিল। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত এম.এ.বি.এল ডিগ্রিধারী হয়েও শিক্ষকতা শুরু করেন। এসময় মেদিনীপুর জেলায় তিনটি স্থানে আদালত ছিল—মেদিনীপুর শহর, ঘাটাল ও তমলুক। আইন পাশ করার পর অধিকাংশের বাসনা ছিল জেলার সদর শহর মেদিনীপুরে প্রাক্টিশ করার।[৩৩] মেদিনীপুর জেলার ঘোড়ামারা গ্রামের সুরাবর্দী পরিবার শিক্ষায় দীক্ষায় বিশেষ উন্নতিলাভ করে বিভিন্ন

পেশায় নিযুক্ত হয়ে মেদিনীপুরের সম্মান বৃদ্ধি করেছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে উনিশ শতক মেদিনীপুরের জনগণের কাছে আশা-নিরাশার শতক। এই শতকে মেদিনীপুরে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়েছে। ছাপানো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় শিক্ষাদান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাজগতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাকে পরিব্যাপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এই শতকেই মেদিনীপুরবাসী পাশ্চাত্যশিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়ে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের মন্ত্র ও আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর শপথ নেয়। তবুও সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়- মেদিনীপুরবাসীর চাহিদার তুলনায় বৃটিশ শিক্ষার আয়োজন খুবই অপ্রতুল ছিল। সাম্রাজ্যবাদ "সকলের জন্য শিক্ষা" এ নীতি কোনদিন গ্রহণ করেনি,ক্রমপ্রসারী সুপরিকল্পিত শিক্ষার আয়োজনও তেমন করে নি। মেদিনীপুর জেলায় 'শিক্ষিত সম্প্রদায়' গড়ে তোলার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিল তা ছিল একান্তভাবেই "সাহিত্যিক" ও "কেতাবী"। বাস্তববর্জিত ও যান্ত্রিক। ইংরাজ-প্রচলিত শিক্ষায় শুধু সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, ইতিহাস- এক কথায় সাহিত্যিক ও কেতাবী বিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সমাজ বিবর্তনের তত্ত্বকথা, কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মেদিনীপুর জেলাবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে ইংরাজ সরকার উদাসীন থেকেছে মাত্র। মেদিনীপুরের বিশাল জনগণের দিকে তাকিয়ে কারিগরি বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয় কিছুই স্থাপন করে নি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে বাধা না দিলেও এর উন্নতির জন্য কিছুই করে নি বল্লেই চলে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকারী বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী আর্থিক অনুদান ছিল অতি নগণ্য। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়ায় জাতীয় মানবিক শক্তি ও অর্থের প্রভূত অপচয় হয়েছে। ইংরাজীতে কাঁচা থাকার ফলে কত ছাত্র যে পরবর্ত্তী জীবনে অকৃতকার্য্য হয়েছে তার হিসেব নেই। তা ছাড়া, দেশীয় ভাষাগুলিও পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সুযোগ পায়নি। ইংরেজ শাসকরা মেদিনীপুরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেটুকু শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিল তা ছিল একান্তভাবে পক্ষপাতপূর্ণ। এ ব্যবস্থায় "জনসাধারণ" বলতে যাদের বোঝায় তারা শিক্ষার সুযোগ বিশেষ কিছুই পায়নি। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষানীতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সামাজিক বৈষম্যের বিজাতীয় গণতন্ত্রবিরোধী চেহারা। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে শুধু সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরাই প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারত। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাও বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত সন্তানদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, একমাত্র বিদ্যাসাগর বাদে, মেদিনীপুরের নিম্নবিত্ত পরিবারের বিশেষতঃ শ্রমিক কৃষক পরিবারের সন্তানেরা আসেনি বললেই হয়।

সাত

মেদিনীপুর জেলায় প্রথম শ্রমিক আন্দোলন (১৯০৬)

মেদিনীপুর জেলা প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি প্রধান। এই জেলা থেকে শিল্প সৃষ্টি ও তার চর্চা যে হয় নি তা নয়, তবে তা ছিল মূলতঃ কুটিরশিল্পকেন্দ্রিক। কুটির শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণী ছিল, আর ছিল কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত বিপুল শ্রমিক তথা কৃষি মজুর। এ সমস্ত শ্রমিক বা মজুররা ছিল অসংগঠিত ও মালিকশ্রেণীর নিত্য শাসন ও শোষণের শিকার। ইউরোপে যে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয় তা মূলতঃ শিল্প বিপ্লব সৃষ্ট কলকারখানাকে কেন্দ্র করেই। ভারতে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে পরে ও ধীরে। মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর রেল ওয়ার্কশপ স্থাপিত হওয়ার পর জেলায় জন্ম নেয় আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী। এই শ্রমিকশ্রেণী ছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশ।

ভারতীয় রেল ইতিহাসে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের (বি.এন.আর) আবির্ভাব ইস্ট ইন্ডিয়া ও গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের অনেক পরে— উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের সাথে ভারত সরকারের স্টেট ইন কাউন্সিলের সচিবের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ১৮৮৭ সালের ৯ই মার্চ। এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু হয় ১৮৮৭ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে। মোটামুটিভাবে কাজ শেষ হয় ১৮৯৭-৯৮ সালে। ১৯০১ সালে নাগপুরের সাথে, ভায়া খড়্গপুর, কলকাতা যুক্ত হয়। ১৯০৪ সালের মধ্যে খড়্গপুর একটি বড় রেলওয়ে জংশন স্টেশনে রূপান্তরিত হয়। এই সময় থেকে ওয়ার্কশপেও কাজ শুরু হয়। আর খড়্গপুরকে করা হয় বি.এন.আর এর লোকো, ক্যারেজ ও ওয়াগন বিভাগের মূল কেন্দ্র স্থল।[১] খড়্গপুরের ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য বিভাগে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। কৃষি প্রধান মেদিনীপুর জেলায় আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।

খড়্গপুরের রেলশ্রমিকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যায় ছিল স্থানীয় লোক। অধিকাংশ ছিল দুর্ভিক্ষ কবলিত ও প্লেগ সংক্রামিত অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও বিহারের। পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশেরও কিছু শ্রমিক ছিল।[২] খড়্গপুরে স্থানীয় শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ারও কয়েকটি কারণ ছিল। যেমন, এক, স্থানীয় লোকেরা কৃষিকাজ করাকে অধিক লাভজনক ও সম্মানের বিবেচনা করত। দুই, খড়্গপুরে রেলজংশন ও ওয়ার্কশপ স্থাপনের ফলে বহু জঙ্গল- আদিবাসীর জীবিকা বিপন্ন হয়েছিল। তাই বি.এন.আরকে তারা শত্রু হিসাবে দেখত। তিন, মেদিনীপুরের উত্তরাংশের ইউরোপীয় জমিদাররা চাইত না স্থানীয় লোক রেল কোম্পানীতে কাজ করুক। কারণ, তাতে তাদের মজুরের বা শ্রমিকের অভাব দেখা দিতে পারে। চাষবাস ও জঙ্গল কাটার জন্য সস্তায়

স্থানীয় সাঁওতাল ও অন্যান্য নীচু সম্প্রদায়ের মজুর পাওয়া যাবে না।[৮] সর্বোপরি, এই অঞ্চল একদা খয়রা, পাইক, চোয়াড় প্রভৃতি বিদ্রোহ নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে।[৯] তাই ব্রিটিশ মালিকানাধীন বি.এন.আর. কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়কে রেল শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে, বহিরাগত শ্রমিকরা বাড়ি কম যাবে। রেলের কোয়ার্টারেই থাকবে। তাদের অনুপস্থিতির হার কম হবে। বেশি করে কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। স্থানীয় শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম মজুরীতে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী, জাতি ও প্রদেশের শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি গড়ে উঠতে অনেক বিলম্ব হবে। হয়ত আদৌ ঐক্য গড়ে উঠবে না। জাতিগত বিভাজন নীতি প্রয়োগ করলে আরও সুফল ফলতে পারে।

সুতরাং, প্রথমাবধি ব্রিটিশ মালিকানাধীন বি. এন. আরের অতিরিক্ত মুনাফালাভের আকাঙ্খা প্রবল ছিল। অথচ এই কোম্পানীর আর্থিক ঝুঁকির কোন প্রশ্ন ছিল না। তাদের বিনিয়োগের শতকরা চারভাগ লভ্যাংশ সরকার কর্তৃক সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।[৯] তথাপি, অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙ্খা কোম্পানীর দিন দিন বাড়তে থাকে। ফলে শুরু থেকেই কোম্পানী অশিক্ষিত ও অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের উপর চরম শোষণ ও অত্যাচার চালাতে থাকে। এরই বিরুদ্ধে সমস্ত হিসেবনিকেশ উল্টে দিয়ে খড়্গপুর ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকরা ১৯০৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট শুরু করে।

এই ধর্মঘট তথা শ্রমিক আন্দোলনের অনেক কারণ ছিল। যেমন, প্রথমাবধি বি. এন. আরের দরিদ্র রেলশ্রমিকদের চাকরির ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা ছিল না। শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল হয় আংশিক সময়ের কিংবা সম্পূর্ণ অস্থায়ী। যেমন — গ্যাংম্যান, মেট্, কেবিনম্যান, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে দু-একজন ছাড়া সবাই ছিল আংশিক সময়ের কিংবা অস্থায়ী।[৮] যে কোন মুহূর্তে চাকরি হারানোর ভয় তাদের ছিল। দুই, শ্রমিকদের জন্য নির্মিত বাসগৃহগুলি আদৌ বাসোপযোগী ছিল না। কোয়ার্টারগুলিতে ছিল না পানীয় জলের ব্যবস্থা অথবা শৌচাগার। বস্তি সংলগ্ন বহিরস্থ জলকলের সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আয়তনেও কোয়ার্টারগুলি ছিল অত্যন্ত ছোট।[৫] তিন, 'সর্দার'দের দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও শোষণ শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বি. এন. আরের শ্রমিকরা মাস মাইনের একটি অংশমাত্র পেত। বাকি টাকা তাদের 'সর্দার' জোর করে নিয়ে নিত। সুতরাং কাজ করে যে টাকা তারা হাতে পেত তাতে জীবনধারণ অসম্ভব ছিল। তাছাড়া তারা জানতে পারছিল যে একই কাজ করে অন্য রেল কোম্পানীর শ্রমিকরা অনেক বেশী মাইনে পায়। চার, শ্রমিকদের ছুটির আইনবিধি ছিল অত্যন্ত আঁটোসাঁটো ও কঠোর। 'প্রিভিলেজ লীভ' তাদের জন্য কালেভদ্রে অনুমোদন করা হতো। প্রায় প্রত্যেকটি ভারতীয় শ্রমিককে কাজের নির্ধারিত সময়সীমার চেয়ে অনেক বেশী সময় ধরে কাজ করতে হতো। ছুটির দিন ওয়ার্কশপে এসে মেশিন পরিষ্কার করতে

হতো। ফলে অসুস্থ শ্রমিকের তালিকা দিন দিন বাড়ত।[৮] পাঁচ, শ্রমিকদের উপর অনেক সময় অকারণে, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হতো। এর বিরূদ্ধে শ্রমিকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অধিকার ছিল না।[৯] ছয়, ইউরোপীয় অফিসারদের জাতিগত বৈষম্য ও অবিচারমূলক আচরণের শিকার হত রেলশ্রমিকেরা, তবে খড়্গাপুরের রেলশ্রমিকের আন্দোলনের মূল ও আশু কারণ ছিল খড়্গাপুরের বাজারে চালগমের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি। অবশ্য তখন সারা মেদিনীপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। জেলায় অধিকাংশ কৃষক অর্ধাহারে কিংবা অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল। জেলায় বিভিন্ন জায়গায় এ কারণে খাদ্যসামগ্রী লুঠ পাট হচ্ছিল। চালের দোকান, চালের নৌকা, চালের গাড়ী লুঠ হয়, ঘাটাল পাঁশকুড়া ও খড়্গপুরে, বিশেষতঃ মালঞ্চতে। খাদ্যাভাবে খড়্গপুরেই হাজারখানেক শ্রমিক কিংবা শ্রমিক পরিবারের সদস্যের মৃত্যু হয়। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে খড়্গপুরের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম এত বেড়ে যায় যে, সাধারণ শ্রমিকের দুবেলা আহারের সংস্থান করা ছিল অসম্ভব।[১০] তার উপর, দুর্ভিক্ষকবলিত গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনরা কাজের আশায় শহরে এসে তাদের আর্থিক দুরবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলে। উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপায়ান্তর না দেখে খড়্গপুরের প্রায় দশ হাজার রেলশ্রমিক সম্মিলিতভাবে কলকাতায় অবস্থানকারী এজেন্টের কাছে বিভাগীয় প্রধানদের মাধ্যমে মাইনে বাড়ানোর দাবি জানায়।[১১]

শ্রমিকদের দাবিপত্রের উত্তর দিতে এজেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপ করে। অন্যদিকে, শ্রমিকেরাও মাইনে বাড়ানোর দাবিতে খড়্গাপুরের চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বেইলীর কাছে ডেপুটেশন দিতে থাকে। প্রত্যুত্তরে বেইলী জানায়, এজেন্টের নির্দেশ না পেলে তার করণীয় কিছু নেই। এমতাবস্থায়, শ্রমিকেরা উপায়ান্তর না দেখে ১৯০৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১২]

১৯০৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সকালে 'ক্যারিজ বিল্ডিং বিভাগ' -এর ঠিকাদার ও তাদের লোকজনেরা 'কন্ট্রাক্ট রেট'-এর বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাজে আসা বন্ধ করে। খড়্গাপুর ওয়ার্কশপের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বেইলী ঠিকাদারদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, প্রাতরাশের পর তিনি তাদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবেন। ফলে ঠিকাদাররা কাজে ফিরে এলেও দৈনিক মজুরী পাওয়া কিছু পাঞ্জাবী ছুতোর কাজে যোগ দিল না। বেইলী ঠিকাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে নতুনহারে একটি ঠিকা চুক্তি করে। সন্তুষ্ট ঠিকাদাররা জানালো তাদের সমস্ত মিস্ত্রি পরের দিন কাজে যোগদান করবে। কিন্তু শ্রমিকেরা সন্ধ্যায় একটি বিশাল জমায়েত করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা পরের দিন কেউ কাজে যোগদান করবে না। কোন শ্রমিক করলে, সে যদি হিন্দু হয় তাহলে তাকে গরুর মাংস, আর মুসলমান হলে শুয়োরের মাংস উপহার দেওয়া হবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে খড়্গপুর ওয়ার্কশপের প্রায় চারহাজারের বেশী শ্রমিক কর্মবিরতি

করে। ক্রমশঃ রেলওয়ে পয়েন্টম্যান, লাইন্সম্যান, শান্টার, জমাদার প্রভৃতি আরো প্রায় ৫,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়।[১৬] তবে ওয়ার্কশপের ৫,০০০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৭৫০ জন শ্রমিক কাজে যোগ দিতে যায়। ধর্মঘটরত শ্রমিকরা তাদের কাজে যোগ না দেওয়ার জন্য চিৎকার করে বলতে থাকে। ওয়ার্কশপে যাওয়ার রাস্তাগুলিতে বিশেষতঃ রেলওয়ে ব্রিজের উপর কিছু ছুতোর লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।[১১] উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বেইলীকে আক্রমণ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু ওয়ার্কশপ ম্যানেজার কের (Kerr)-এর প্রচেষ্টায় বেইলী রক্ষা পায়। কিন্তু কের নিজেই আক্রান্ত হন। কোনক্রমে পালিয়ে মান বাঁচান।[১২] কিছুক্ষণের মধ্যে ক্ষুধার্ত শ্রমিকরা খড়্গপুরের সবচেয়ে বড় বাজার 'গোলবাজারের' দোকানপাট লুঠপাট করার চেষ্টা করে। একজন 'ইউরেস্যান' পথচারীকে তাড়া করে। নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে 'তার' পাঠিয়ে ডেকে এনে আন্দোলনে সামিল করার চেষ্টা করে। রাস্তায় 'টুপিওয়ালা' দেখলেই তাড়া করতে আরম্ভ করে।[১৬]

বেইলী সমস্ত ঘটনা এজেন্ট ও মেদিনীপুরের জেলাশাসককে জানিয়ে অবিলম্বে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের আবেদন জানায়। এজেন্ট জানায়, খিদিরপুর ও শালিমারের শ্রমিক বিক্ষোভ নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাই তার পক্ষে খড়্গপুরে আসা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, যে সমস্ত শ্রমিক সকাল আটটায় কাজে এসেছিল তাদের ধর্মঘটকারীরা ভয় দেখায় ও বাড়ি ফিরে যেতে বলে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে অফিসের 'বাবু'রা কাজে আসা নিরাপদ নয় বলে ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানায়।[১৮] এই অবস্থায় বেইলী কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মেদিনীপুরের জেলা শাসককে পুলিশ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে।[১৯]

একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও ৫০ জন বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রেন মেদিনীপুর থেকে খড়্গপুরে আসে। ম্যাজিস্ট্রেট গোলবাজার ও স্টেশন এলাকা পরিদর্শন করে। এরই মধ্যে দুজন পাঞ্জাবী ছুতোর সর্দার পুলিশের ভয় উপেক্ষা করে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে একটি আবেদনপত্র জমা দেয়। তারা দাবি করে, বেইলী ও কের-কে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং কের-এর জায়গায় ওল্ডফিল্ডকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট অবস্থা সবেজমিনে পরীক্ষা করে মেদিনীপুর ফিরে যায় এবং একজন অফিসারসহ আরো ৫০ জন লাঠিধারী পুলিশ পাঠায়। রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ওঠে, কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।[২০] স্টেশনে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও হাজার হাজার শ্রমিক শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে। লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ ধাওয়া করলে সামান্য গোলমালের সৃষ্টি হয়। কিছু শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তথাপি, সারা রাত অবস্থা শান্তই থাকে।[২১]

৫ই সেপ্টেম্বর সকালে বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকরা বেইলীর সাথে সাক্ষাৎ করে জানায় যে, বেলা ১২ টায় সময় অধিকাংশ শ্রমিক কাজে যোগদান করতে ইচ্ছুক, যদি ওয়ার্কশপ খোলা রাখা হয়। বেলা ১২ টার সময় ওয়ার্কশপ খোলার ও কাজে যোগদানের জন্য সংকেতবাঁশি বাজানোও হয়। কিন্তু বিশালসংখ্যক শ্রমিক রেলব্রিজ ও ওয়ার্কশপমুখী রাস্তাগুলিতে দাঁড়িয়ে

থাকে। তথাপি প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক কাজে যোগদান করে। অন্যদিকে, মেদিনীপুরের জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট বর্ধমানের কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মঘটকারীদের সাথে কথা বলে[২২] এবং তারা জানতে পারে যে, শ্রমিকদের বিক্ষোভের মূল কারণ হল স্থানীয় বাজারে চাল ও গমের অগ্নিমূল্য। বি.এন. আর-এর এজেন্ট ম্যানসনেরও ধারণা, চালগমের অত্যধিক দামই শ্রমিক অসন্তোষের মূল কারণ।[২৩] যাই হোক, ৫ই সেপ্টেম্বর বর্ধমানের কমিশনার ধর্মঘটকারীদের এই বলে আশ্বস্ত করে যে, শ্রমিকদের দাবিগুলি পুনর্বিবেচনা করা হবে। কাজে যোগদানে ইচ্ছুক শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, যদি তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতা করে। প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক মিছিল করে গিয়ে বেইলীকে তাদের আবেদনপত্র জমা দেয়। বেইলী রেল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে শ্রমিক প্রতিনিধিদের জানায় যে, যদিও রেল কর্তৃপক্ষ 'শস্যভাতা' দিতে পারবে না, তবুও স্থানীয় বাজারে চালগমের মূল্য যাতে হ্রাস পায় তার জন্য প্রাইভেট ব্যবস্থা নেবে। বাকি সব অভিযোগগুলি বিভিন্ন বিভাগ সংশ্লিষ্ট। তাই ওই অভিযোগগুলির প্রতিকার বিভিন্ন বিভাগ মারফৎ আন্তরিকতার সঙ্গে সুবিবেচনা করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর শ্রমিকরা ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে কাজে যোগদানে সম্মত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর হুগলী থেকে আগত মিলিটারী পুলিশ স্বস্থানে ফিরে যায়।[২৪]

৭ই সেপ্টেম্বর শ্রমিকরা কাজে যোগদান করায় এজেন্ট ম্যানসন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায় যে, এক, কিছু শ্রমিকের নতুন বেতনহার ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে এবং আরও কিছু শ্রমিকের নতুন বেতনহার ঘোষণা করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। দুই, যে সমস্ত শ্রমিক ইতিমধ্যেই কিছু ছুটি অর্জন করেছে তাদের যাতে সহজে ছুটি দেওয়া যায় তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ 'রিলিভিং হ্যান্ডের' ব্যবস্থা করবে। তিন, একনাগাড়ে কোন শ্রমিককে অতিরিক্ত কাজ করানোর দৃষ্টান্ত কোন বিভাগে থাকলে এবং তা জেলার পদস্থ অফিসারের গোচরে আনলে তার প্রতিকার করা হবে। তবে, সমস্ত কর্মচারীর জন্য কাজের নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা বেঁধে দেওয়া যাবে না। কারণ, কিছু ক্ষেত্রে 'কর্তব্যরত থাকা' মানে একনাগাড়ে কাজ করা নয়। চার, কোয়ার্টারগুলি শ্রমিকদের বসবাসের অনুপযোগী নয়। রেলকোম্পানী তার শ্রমিককে এমন কোন কোয়ার্টার দিতে পারবে না যেখানে শ্রমিকের বাবা, মা, সমস্ত ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি বাস করতে পারবে। তবে যে সমস্ত কোয়ার্টারগুলির অসুবিধা বা ত্রুটি যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হবে, সেগুলি যথাসম্ভব মেরামত বা উন্নত করা হবে। পাঁচ, যদি কোন শ্রমিক মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে কাজে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে 'মেডিক্যাল লিভ' না নিয়ে 'প্রিভিলেজ লিভ' -ও নিতে পারে অবশ্য যদি তার এই ছুটি পাওনা থাকে। ছয়, যে সমস্ত শ্রমিক ১০ বছরের কম সময় কাজ করছে তাদের বিভাগীয় প্রধান অনুমোদন করলে এজেন্ট তাদেরও বোনাস দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে। সাত, যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী মাসে ৩০ টাকা থেকে ৯৯ টাকা মাইনে পায় তদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের 'পাশ' বছরে একবার অনুমোদন

করা হবে। তবে 'ফ্রি পাশের' সুযোগ পরিবারের সমস্ত সদস্যকে এবং পরিবারের মুখাপেক্ষী ব্যক্তি বা ভৃত্যকে প্রদান করা হবে না। 'ফ্রি পাশে'র সুযোগ পাবে কর্মচারীর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পরিবারের দুজন নির্ভরশীল সদস্য। তাছাড়া, কলেজে পড়াশুনার জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কর্মচারীর একটি ছেলে একটি বিশেষ পথে যাতায়াতের জন্য ফ্রি পাশ পাবে। আট, ট্রাফিক বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীদের নতুন বেতনহার ও ইনক্রিমেন্ট বি.এন.আর কোম্পানী ঘোষণা করে।[২৬]

ধর্মঘটের দিনগুলিতে শ্রমিকরা মূলতঃ শান্তিপূর্ণই ছিল। আবেদন নিবেদন করা ও ডেপুটেশন দেওয়ার মধ্যেই তাদের আন্দোলন চলেছিল। কেবল কোন ইউরোপিয়ান স্থানীয় বাজার থেকে উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য কিনলে তাদের ভয় দেখাত, তাড়া করত, কখনো গায়ে হাত তুলতো না। তাছাড়া, গোলবাজার লুঠের ঘটনা রেলকর্তৃপক্ষের রটনামাত্র।[২৬]

আন্দোলন পরিচালনায় শ্রমিকদের ধর্মীয় হাতিয়ার ব্যবহারের দিকটি বিশেষ লক্ষণীয়। খড়গপুরে থাকাকালীন বর্ধমানের কমিশনার তদন্ত করে জানতে পারে যে, শ্রমিকদের ভয় দেখানোর জন্য গরু ও শুয়োরের কাঁচা মাংস ও হাড় (২/৩ ঝুড়ি পরিমাণ) শ্রমিকবস্তী এলাকায় ও ওয়ার্কশপ যাওয়ার রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এগুলি ময়লা নিষ্কাশন করা ঠেলাগাড়ি দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।[২৭] আসলে ধর্মীয় ব্যাপারটি হুমকি বলেই মনে হয়। কারণ, ধর্মঘট চলাকালীন (৫ই সেপ্টেম্বর) যে ৭৫০ জন শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছিল তাদের গরু/শুয়োরের মাংস খাওয়ানো বা উপহার দেওয়ার কোথাও কোন নজির নেই।

বেশ কিছু উচ্চপদস্থ ভারতীয় রেলকর্মচারী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল।মেদিনীপুরের জেলাশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মন্মথকৃষ্ণ দেবও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ৫ই সেপ্টেম্বর যে সমস্ত শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য জেলাশাসকের এজলাসে রেলকর্তৃপক্ষ পাঠায়, তাদের চরম দুর্দশা ও হতাশার কথা শুনে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সঠিক তথ্যপ্রমাণ না থাকায় জেলাশাসক তাদের বেকসুর খালাস করে দেয়।[২৮] রেলকর্তৃপক্ষ জেলাশাসককে তার প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে শ্রমিকদের কাজে যোগদান করানোর জন্য খড়গপুরে আসতে অনুরোধ করে একটি বিশেষ ট্রেন পাঠায়। কিন্তু জেলাশাসক মন্মথকৃষ্ণ দেব এ কারণে খড়গপুরে আসতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। কারণ, শ্রমিক আন্দোলনে প্রশাসনিক প্রভাব প্রয়োগ করা তার কাছে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়নি। জেলাশাসকের এই সিদ্ধান্ত ছিল ঘটনা উপযোগী ও বুদ্ধিজনপ্রসূত। নতুবা সমস্যা আরো জটিল হতো।[২৯]

এই রেলশ্রমিক আন্দোলনের যা কিছু ব্যর্থতা তার জন্য দায়ী ছিল অসংগঠিত নেতৃত্ব ও শ্রমিক সংগঠনের অভাব। সুযোগ্য নেতৃত্ব থাকলে এই আন্দোলন হয়ত আরও সফল হতো। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মন্তব্য অনুযায়ী, খড়গপুরের আন্দোলন পরিচালনার জন্য ঘোষ অথবা প্রেমতোষ বোস কিংবা অন্য কোন নেতার প্রয়োজন ছিল।[৩০] অবশ্য এই আন্দোলনে মহিলা ও ছাত্রের কোন ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে, শ্রমিক শ্রেণীর সহধর্মিণীরা আত্মত্যাগ না

করলে এই আন্দোলন আদৌ সফল হত কিনা সন্দেহ।

মেদিনীপুর জেলায় এ সময় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার চলছিল। মেদিনীপুর সংলগ্ন খড়গপুরের শ্রমিক আন্দোলনে স্বদেশীদের নেতৃত্ব প্রদান প্রত্যাশিত ছিল। স্বরাষ্ট্র সচিব রিজ্‌লের সর্বদা আশঙ্কা ছিল, স্বদেশী আন্দোলনের মজবুত ঘাঁটি মেদিনীপুর শহর খড়গপুরের শ্রমিক আন্দোলনে অবশ্যই সহায়তা করবে। তাই রেল কর্তৃপক্ষ বার বার ভারতীয়দের সতর্ক করেছেন ঃ "If the Swadeshi agitators really desired to good of their fellow-countrymen, they should do all in their power to encourage works like those at Kharagpur and Jamalpur which give employment to thousands of natives....." [৩১] সম্ভবতঃ খড়গপুর রেল শ্রমিকরা স্বদেশীদের রেল আন্দোলনে সংযুক্ত করতে চায়নি। কারণ, তারা দেখেছে স্বদেশীরা পারস্পরিক নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সমসাময়িক ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের শ্রমিক আন্দোলনের কী ক্ষতি করেছে। তাছাড়া খড়গপুরের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করেছে প্রধানতঃ অবাঙালী শ্রমিকরা, যাদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের অংশীদার হওয়ার অনীহাও ছিল। অথচ শ্রমিক ও স্বদেশীদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটলে সামগ্রিক ঘটনা অন্য খাতে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

তাছাড়া, এই আন্দোলনে উচ্চতর বেতন কাঠামো, শস্যভাতা প্রভৃতি দাবি ছাড়া তেমন কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও নেতৃত্ব ছিল না। আন্দোলন সফল করার জন্য শ্রমিক কর্তৃক ধর্মীয় হাতিয়ারের প্রয়োগ সুবিবেচনা প্রসূত ছিল না।

তবু এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শ্রমিকসংহতি এনেছিল। তাদের শ্রেণীগত সচেতনতা ও মনোবল বৃদ্ধি করেছিল। সর্বোপরি, ১৯০৬ সালের খড়গপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার যথা, মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, কলাইকুন্ডা, দাঁতন প্রভৃতি স্থানের শ্রমিক আন্দোলন ছিল মেদিনীপুর জেলার প্রথম শ্রমিক আন্দোলন; সমগ্র বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রমিক আন্দোলন ও পরবর্তী রেলশ্রমিক আন্দোলনের দিশারী।

আট

স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজ

রাজনীতি এমন একটি বস্তু যার এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। এই শক্তির টানে ছাত্র-সমাজ প্রাণ উৎসর্গ করে। ফলস্বরূপ রচিত হয় ইতিহাস। আজ বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ ছাত্রসমাজ। বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি লগ্নে একবিংশ শতাব্দীর আহ্বান আজ প্রতিটি মানুষের কাছে এক নতুন পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষমান। আর এই পদক্ষেপে ছাত্রদের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ছাত্রসমাজের উত্থান নতুন করে পুনর্মূল্যায়ণের অপেক্ষা রাখে। ছাত্রসমাজের রাজনীতিতে সক্রিয় পদক্ষেপের উৎস জানতে হলে ইতিহাসের মূল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছাত্রসমাজের অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতের ছাত্রআন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য আধুনিক যুগের ইতিহাসেই সীমিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ছাত্র কতটা রাজনীতি সচেতন ছিল তা তথ্যাভাবে আজও অজ্ঞাত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মেদিনীপুর জেলার দু-একটি স্থানে ইংরেজী শেখার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। কারণ, লর্ড হার্ডিন্‌জের ঘোষণামত ইংরেজী শিখলেই চাকরী। তখন ইংরেজী শেখার জন্য জেলায় দুটি ভাল স্কুল। একটি কলিজিয়েট স্কুল। অন্যটি মিশনারী স্কুল। কলিজিয়েট স্কুলটি তখন সরকার পরিচালনাধীন। হেডমাষ্টার ইংরেজ। বড় বড় সরকারি কর্ম্মচারীদের ছেলেরা, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, জমিদার প্রভৃতি ধনীর ছেলেরা সেখানে পড়ে। বাঙালী অভিভাবকদের উদ্দেশ্য ছেলেদের ইংরেজ ঘেঁষা করা। ইংরেজ ও ইংরেজীর চরম ভক্ত করে তোলা। অন্যদিকে মিশনারী স্কুলটি প্রথমে ছিল স্কুলবাজারে—পরে উঠে যায় মিঞাবাজারের জোড়া মসজিদের কাছে। এই স্কুলটি ছাত্রদের বিনা পয়সায় পড়াতো। উদ্দেশ্য বাঙালী ছাত্রদের খৃষ্টান করা। এই দুইপ্রভাব থেকে শহরের ছেলেদের মুক্ত করে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য শহরের শিক্ষাদরদী মানুষের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ১৮৮৩ সালে মেদিনীপুর টাউন স্কুল। এক্ষেত্রে মেদিনীপুরের নব জাগৃতির অগ্রদূত ঋষি রাজনারায়ণ বসুর অবদান কম ছিল না। টাউন স্কুলটি ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনগণের চাঁদায় চলত। এই স্কুলে ছাত্রদের শেখানো হতো শরীর শিক্ষা জনসেবা, হাতের কাজ ও চরিত্র গঠন। প্রত্যেক ছাত্রের গীতার কর্মযোগ মুখস্থ করা ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। প্রতি শনিবার ধর্মীয় ক্লাস হতো। এরকম

শিক্ষার ফলে স্কুলের ভিতর গোপনে গোপনে এমন একদল তরুণ গড়ে উঠলো যারা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়াণ হয়ে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। জন্মলগ্ন থেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একটা স্বাদেশিকতার পরিবেশ গড়ে ওঠে।[১] ভারত তথা বাংলার ছাত্র আন্দোলনের কথা আমরা পাই নব্যবঙ্গ যুগে, মূলতঃ ডিরোজিওর অনুগামী হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্রের কর্ম প্রচেষ্টায়। কিন্তু মেদিনীপুর জেলায় ছাত্র আন্দোলনের সূচনা বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্ন থেকে, বিশেষতঃ বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই প্রথম জেলার ছাত্রসমাজ অন্ততঃ আংশিক দলবদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তারা কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের প্রভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, সে প্রশ্ন ভিন্ন। শুধু সত্য এই যে, তারা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক মঞ্চে এক শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

কুখ্যাত লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদ বাঙ্গালীর ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের উপর যে আঘাত হেনেছিল, তাতে মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ মুহ্যমান হওয়া দূরে থাক' এক অভূত-পূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তি নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপকৌশলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে মেদিনীপুরের 'বেইলী হলে' আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় সহস্রাধিক ছাত্র শপথ গ্রহণ করেছিল এই মর্মে যে, বঙ্গভঙ্গ যতদিন না রদ হয় ততদিন পর্যন্ত তারা কোন আনন্দোৎসবে যোগদান করবে না। তারা বিপ্লবী যজ্ঞের অন্যতম হোতা সত্যেন্দ্র নাথ বসুর নেতৃত্বে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে স্বদেশী আন্দোলনেব সূচনা করে । বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও সর্বপ্রকার স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ে তারা জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু, গতিকৃষ্ণ বাগ প্রভৃতিদের আলোচনায় প্রভাবিত হয়। তবে তারা কেবল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করে সন্তুষ্ট থাকেনি, ছাত্রসমাজের স্বার্থ রক্ষার দিকেও নজর দিয়েছিল। গরীব ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মেদিনীপুর শহরে 'ছাত্র ভাণ্ডার' স্থাপন এরই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গরীব সহপাঠীদের প্রতি তাদের এই সমব্যথী মনোভাব ছাত্রআন্দোলনকে নতুন মাত্রা ও মর্য্যাদা দিয়েছিল। তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরূদ্ধে লড়াই-ই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের ছাত্ররা খালি গায়ে, খালি পায়ে, প্রবল বৃষ্টির মধ্যে এক বিরাট শোভাযাত্রা করে সারা মেদিনীপুর শহর পরিভ্রমণ করে। মেদিনীপুর শহরে ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ব্যাপক বিস্তৃত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত-এই আশঙ্কায় জেলাশাসক কর্তৃপক্ষ শোভাযাত্রার অনুমতি দিতে অসম্মতছিলেন। শুধু প্যারীলাল ঘোষ শোভাযাত্রার সমস্ত দায়িত্ব নিজে নেওয়ায় পুলিশ অনুমতি দেয়। ছাত্রদের শোভাযাত্রা ও সমবেত জাতীয় সঙ্গীত শহরবাসীকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে। দাঁতন, ক্ষীরপাই, মহিষাদল, ঘাটাল, কাঁথি, প্রভৃতি অপরাপর বহু শহরে ও গ্রামে ছাত্রদের অনুরূপ শোভাযাত্রা বের হয়।[২] মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে অশৌচ পালন করে।

এ সময় মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরণ ছিল ভারতের

জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ। ছাত্ররা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত অহিংস ও সহিংস ভাবে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ছিল আন্তরিক সম্প্রীতি। তাই স্বদেশী প্রচারে হিন্দু ছাত্ররা মুসলমানদের ঈদ্ উৎসবকে কাজে লাগাতো। যেমন —তখন স্থানীয় ঈদ্ উপলক্ষে মেদিনীপুরে প্রতিবছর কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে এক বিশাল জনসভা ও উৎসব হতো। ছাত্ররা পাঁচটি বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ঐ জনসমাজের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে, উপস্থিত জনগণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতো। শুধু মেদিনীপুর শহরে নয়, ক্ষীরপাই, দাঁতন, পাঁচরোল, ঘাটাল, মহিষাদল, কাঁথি, মীরগোদা, ব্যবর্ত্তার হাট প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৫] ১৬ ই অক্টোবর মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কংসাবতী নদীতে অতি প্রত্যুষে সমবেত ভাবে স্নান সেরে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। তাদের প্রধান ব্রত হয় বাংলা ও বাঙ্গালীর ঐক্য রক্ষা।[৭]

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুরের বিলাতী দ্রব্য বিক্রয়কারী বড় বড় দোকানদাররা আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে। তারা এজন্য ছাত্রদের দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করে। কারণ, দোকানগুলির সামনেই ছাত্ররা প্রধানতঃ পিকেটিং করতো। কিন্তু, আনন্দের কথা, ব্যবসায়ীরা মামলা চালাতে পারল না উকিলের অভাবে। বিশাল অংকের টাকার লোভ প্রত্যাখ্যান করে মেদিনীপুর কোর্টের সমস্ত উকিল ছাত্রদের পক্ষ নেয়। অবশেষে ব্যবসায়ীরা এক হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ দিয়ে এবং ছাত্রদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে মামলার নিষ্পত্তি করে।[৫] জয় হয় স্বাদেশিকতার, জয় হয় ছাত্রদের। এই ঘটনার পর মেদিনীপুরের বড়বাজারের কোন দোকানদার প্রকাশ্যে বিলাতী দ্রব্য বিক্রী করতে সাহস করেনি। মেদিনীপুরের ছাত্রদের অশ্রুজল মিশ্রিত স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ়তায় স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপকতা ও সফলতা লাভ করে।

মেদিনীপুরের এই ছাত্রআন্দোলন যদিও ছিল শান্ত অহিংস প্রকৃতির, তবুও মাঝে মাঝে এই তরুণ গোষ্ঠী হিংস্র হয়ে উঠতো। তাদের মধ্যে যারা ছিল সক্রিয় তারা বিপ্লবী দলগুলি বলিষ্ঠ করার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে রইল। বৃটিশের কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে যারা সরব ছিল তারাই পরবর্ত্তীকালে বিপ্লবী নামে পরিচিত হল।[৬] মেদিনীপুরের কত ছাত্র যে 'অনুশীলন', 'যুগান্তর' ইত্যাদি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল তার হিসেব পাওয়া দুষ্কর। কারণ, গোপনে চলতো তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। পুলিশের গুলিতে হত বিপ্লবী ছাত্রদের সংখ্যা হিসেব বহির্ভূত। এই যুব ছাত্রসমাজ ব্যায়ামাগার ও আখড়াতে নানা প্রকার ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, ইত্যাদি শিখতো ও শেখাতো। মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র ও গুপ্ত সমিতির সক্রিয় সদস্য মাত্র ১৮ বছরের কিশোর ক্ষুদিরাম এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি ছিলেন মেদিনীপুরে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের একজন প্রথম সারির সৈনিক। স্বাধীনতার বেদীতে তাঁর ও অন্যান্য বিপ্লবীদের আত্মবলি ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৭] হেম কানুনগো এই সময় চিত্রকলা বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারিসে গিয়ে বোমা তৈরীর কৌশল শিখে আসেন।

১৯১১ সালে সরকার যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নাকচ করে দেয়, তখন ছাত্র আন্দোলনের

এই অধ্যায়টি তখনকার মত শেষ হয়ে যায়। এরপর ১৯১১-১৮ সাল পর্য্যন্ত এই ছাত্রআন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে এলেও ছাত্ররা মাঝে মধ্যেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। তবে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মেদিনীপুরের ছাত্রআন্দোলন নবজীবন লাভ করে।

অসহযোগ আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি না থাকা সত্ত্বেও মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ যে সাহস ও দায়িত্বের সাথে নিজেদের পরিচালনা করেছিল তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে টাউন স্কুলের ছাত্রদের দান অতুলনীয়। মেদিনীপুর শহরে প্রথমে কোন আন্দোলন হয়নি। পরে টাউন স্কুলের কয়েকজন ছাত্র যথা শচীন মাইতি, পূর্ণ চক্রবর্তী, নগেন সেন, মৃত্যুঞ্জয় জানা প্রভৃতির চেষ্টায় শহরে প্রাচীন নেতাগণ এই আন্দোলনে যোগ দেন। প্রবীন নেতা মন্মথনাথ দাস মন্তব্য করেছিলেন,—' এই সব ছাত্র তাঁকে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে প্রেরণা দিয়েছিল।'—মেদিনীপুর ভেকুটিয়া গ্রামের নবীন চন্দ্র পাল এবং মনুচক গ্রামের গোরাচাঁদ গিরি কলিকাতা সাউথ সুবারবান কলেজের (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) বি. এ পরীক্ষায় ফি জমা দিয়েও আন্দোলনে যোগদান করার জন্য আর পরীক্ষা দেননি।[৮] জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মেদিনীপুর জেলার বহু স্কুলে ও মেদিনীপুর কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়।[৯] মেদিনীপুরে ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছে। সমগ্র মেদিনীপুরে তখন ছাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। তবুও তারা ছাত্রদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করে। অবশ্য একথাও ঠিক, যথেষ্ট মাত্রায় রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব সত্যিই সে সময় ছাত্রীদের মধ্যে দেখা যায়।

মেদিনীপুরে বিপ্লবের প্রথম পর্য্যায়ে যে ভ্রূক্ষেপহীন আত্মোৎসর্গের চিন্তা যুব ছাত্রদলকে অস্থির আকাঙ্খায় বিচলিত করে তুলেছিল পুনরায় তারই ছায়াপাত দেখা দিয়েছিল ১৯২৪ সাল থেকে মেদিনীপুরের যুবচিত্তে। এ সময় মেদিনীপুর শহরের স্কুলগুলিতে 'বয়েজ স্কাউটস্' দলভুক্ত ছাত্রদের 'ঈশ্বর, রাজা ও দেশের প্রতি আনুগত্য' প্রকাশ করে শপথ বাক্য পাঠ করতে হত। ছাত্রদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বিদেশী রাজা কি দেশ অপেক্ষা অগ্রগণ্য? নিশ্চয় নয়। তাই তারা প্রতিবাদ করে। শাস্তি পায়।[১০] আসলে ১৯২১ সাল থেকে সমগ্র দেশে বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলাতে ত্যাগ ও দুঃখবরণের যে প্রবাহ মানুষের প্রাণকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল তা এই সব যুবমনে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিল। এই প্রাণতরঙ্গে উচ্ছল যুবমন কোন বন্ধন স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না। স্বাধীনতার অমৃত স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য এরা উন্মুখ ছিল। একদিন মেদিনীপুরের ৫টি কিশোর ছাত্র (পরিমল কুমার রায়, পুলিন বিহারী মাইতি, বীরেন্দ্রনাথ মাঝি, সন্তোষ কুমার মিশ্র ও হরিপদ ভৌমিক) একত্রে গীতা হাতে শপথ নিল দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা জীবন তুচ্ছ করবে। এদের সমবেত চিন্তা প্রকাশ্য রূপ ধারন করল টাউন স্কুলের "মিলন মন্দির" প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এদের সঙ্গে যুক্ত হল উৎসাহী ছাত্র প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠি। কিছু দিনের মধ্যে এদের প্রচেষ্টায় গঠিত হল মেদিনীপুর যুব সংঘ।

প্রফুল্ল কুমারের সম্পাদনায় ''পরশু' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হল। ছাত্রদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কুমার দেবেন্দ্র লাল খান ও শহীদ সত্যেনের অন্যতম ভাই ডাঃ সুবোধ কুমার বসু। কলকাতার যুব আন্দোলনের নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হল। গঠিত হল ''মেদিনীপুর যুব সমিতি'।[১১]

১৯২৮ সালে বি. ভি. গ্রুপের দীনেশ চন্দ্র গুপ্ত মেদিনীপুরে এসে মেদিনীপুর কলেজের ছাত্ররূপে স্বীয় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকেন। দীনেশ অদ্ভুত মানুষ। মানুষ চেনার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। বিপ্লবী দল গঠন করা সহজ কাজ নয়। সবাই দল গঠন করতে পারে না। তিনি তখনকার মেদিনীপুরের ছাত্রনেতা প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ্ এ স্থাপন করে পরিমল কুমার রায়, ফণীভূষণ কুণ্ডু, হরিপদ ভৌমিক প্রভৃতি ছাত্রদের নিয়ে বেঙ্গল ভল্যানটিয়ার্স্ দলের মেদিনীপুর শাখার পত্তন করেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অমরনাথ চ্যাটার্জ্জী, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নরেন দাস, বিজয় মঙ্গল ও সুধীর পট্টনায়েক দলে আসে। এরা সবাই টাউন স্কুলের ছাত্র। পরিমল ছিল দলের নেতা। হরিপদকে কাঁথিতে পাঠান হয়। দলের সংগঠন তৈরীর জন্য। হরিপদ কাঁথি কলেজে ভর্তি হয়ে একটি শক্তিশালী শাখা তৈরী করে। ফণী কুণ্ডু হয় এ্যাক্শান স্কোয়াড়ের নেতা।

১৯২৮ সালে ভারতে সাইমন কমিশনের আগমনের প্রতিবাদে সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। প্রফুল্ল কুমারের নেতৃত্বে মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্ররা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স এই প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগদান করে। বিপ্লবী দল গঠনে অমর, ব্রজকিশোর ও কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র ক্ষিতিপ্রসন্নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অমর ও ব্রজকিশোর নিজেদের চরিত্রবলে এত বলীয়ান ছিল যে, যে কোন ছাত্র তাদের সামনে এলে তাদের এরা বিপ্লবী বানিয়ে ছাড়ত। ব্রজকিশোর একটি ছোট পুস্তিকা লিখছিল। How to recruit a revolutionary এই পুস্তিকাটিতে যা লেখা ছিল তা প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক বিপ্লবের ও বিপ্লবীর গীতা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই পুস্তিকায় ছিল সঠিক বিপ্লবী তৈরী করার সঠিক পথ।[১২] অনুশীলন দলের সুপরিচিত কর্মী ক্ষীরোদ কুমার দত্তও কলেজে ভর্তি হয়ে বিপ্লবী দল গঠনের ব্রতে ব্রতী হন। ১৯২৯ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, মৌলবী জালালুদ্দিন হাসেমী, ডাঃ সুবোধ চন্দ্র বসুর শুভাগমন ও প্রেরণা মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজকে দেশসেবার ব্রতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে।[১৩] দীনেশ গুপ্ত, শশাংক দাসগুপ্ত, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, অমর চ্যাটার্জী, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নরেন দাস প্রমুখ বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১৪]

মেদিনীপুরের আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র প্রতিবাদের মূল ভিত্তি ছিল স্কুল কলেজে পিকেটিং করা, যা শিক্ষায়তনগুলির স্বাভাবিক কাজ কর্মকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাহত করেছিল। মেদিনীপুরে ১৯৩০-এর ৬ ই এপ্রিল আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। কাঁথি, মেদিনীপুর, তমলুক ইত্যাদি স্থানে,

মূলতঃ শহরে ছাত্ররা এই আন্দোলনের পরিধি ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে জেলার সহপাঠীদের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় হয়েছিল, এই জেলার কালিকাপুর, মহিষবাথান, তমলুক ও কাঁথি মহকুমার ছাত্ররা লবন- আইনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রচার অভিযানে সামিল হয়েছিল।[১৫] এ ছাড়া, স্বদেশী ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা সাময়িকপত্র ও প্রচারপুস্তিকা ইত্যাদি বিক্রয়ে বিশেষ ভূমিকা নেয়। সমগ্র বাংলায় মাত্র কয়েকটি জেলাতে ছাত্ররা ব্যাপক অংশগ্রহণ করেছিল আইন অমান্য আন্দোলনে। ঐ জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর ছিল অন্যতম। মেদিনীপুরের তমলুক শহরে ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। এই সময়ে তমলুক শহরের ছাত্র আন্দোলনের কর্মী প্রয়াত কমিউনিষ্ট নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী স্মৃতিচারনে লিখেছেন,—"বঙ্গ দেশে এই আন্দোলন প্রবলতম আকার নিয়েছিল মেদিনীপুর জেলায় এবং তারও মধ্যে তমলুক ও কাঁথি মহকুমাতেই হয়েছিল সবচেয়ে প্রবল, তমলুক মহকুমার এই ব্যাপক গণআন্দোলনে শুধু শহরের ছাত্রযুব মধ্যবিত্তরাই নয় গ্রামের লক্ষ লক্ষ কৃষকও যোগ দিয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অজয় মুখার্জ্জী ও সতীশ সামন্ত এবং তাঁদের সমকর্মীরা"।[১৬] এই সময় মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ শুধু আইন অমান্যের জন্য বড় বড় মিটিং মিছিলে যোগ দেয়নি, শুধু স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম লেখায়নি, শুধু আনন্দ বাজার ফেরি করে বেড়ায়নি, মহকুমার সমগ্র ছাত্রসমাজ জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। শহরে ও গ্রামে সবকটি হাইস্কুলে তারা সাধারন ধর্মঘট সংগঠিত করতে পেরেছিল এবং বৃটিশ শাসকদের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও এক নাগাড়ে প্রায় ছ'মাস সমস্ত স্কুল বন্ধ করে রাখতে পেরেছিল। জেলার শত শত ছাত্র প্রত্যক্ষভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিল। তখনকার সময়ে প্রথম শ্রেনীর (অর্থাৎ বর্তমান সময়ের দশম শ্রেনী) ছাত্র বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারতেন।[১৭] মেদিনীপুরের হিজলী জেলে বন্দীদের উপর নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজ গর্জে ওঠে। অনেক ছাত্রই বিপ্লববাদে আকৃষ্ট হয়, ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবে মেদিনীপুরে পর পর তিনজন কুখ্যাত অত্যাচারী জেলা শাসক পেডী (১৯৩১), ডগলাস (১৯৩২) ও বার্জকে (১৯৩৩) হত্যা করা হয়, এই হত্যার সঙ্গে জড়িত বিমল দাসগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, প্রভাংশু পাল, অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, নির্মল জীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, সুকুমার সেনগুপ্ত, নন্দদুলাল সিংহ, কামাখ্যা ঘোষ, শান্তিগোপাল সেন সকলেই তখন ছাত্র ছিলেন।[১৮] মামলায় অনেকের ফাঁসি হলো। অনেকের দ্বীপান্তর হলো। অনেকের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হলো। অনেকের উপর নির্মম পুলিশী নির্যাতন চললো। বাকি অনেককে শহর থেকে বহিষ্কার করা হলো বা ঘরের মধ্যে অন্তরীণ করে রাখা হলো। এই সব বিপ্লবীদের মধ্যে যারা টাউন স্কুলের ছাত্র তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিমল রায়, ফণীন্দ্র কুণ্ডু, ফণী দাস, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নরেন দাস, বীরেন দাস, বিজয় ঘোষ, অজয় ঘোষ, সুবীর ভট্টাচার্য্য, শৈলেন দত্ত, অশোক দাস ও আরও অনেকে।[১৯] ১৯২৮-২৯ সালে দীনেশ দত্ত, বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সের অধিনায়ক,

মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি বিনয় বোসের নেতৃত্বে ১৯৩০-এর ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আলিপুর জেলে ১৯৩১-এর ৭ই জুলাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩২-৩৩ সালে প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সের লেফটেনান্ট ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের কুখ্যাত জেলা শাসক ডগলাসকে গুলি করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত মেদিনীপুরের অপর এক জেলা শাসক কুখ্যাত বার্জকে গুলিবিদ্ধ করে নিজে জেলা শাসকের দেহরক্ষীর গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ১৯৩৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। ইনি ১৯৩৩-৩৪ সালে মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মার্ডার কেসে অভিযুক্ত হয়ে ১৯৩৪-এর ২৫শে অক্টোবর তিনি মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যুবরণ করেন। এই জেলে তাঁদের আরেকজন বন্ধু ও সহপাঠী নির্মলজীবন ঘোষের বার্জকে হত্যা করার চক্রান্তের অভিযোগে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর প্রাণদণ্ড হয়।[২০] এইরূপ আরও অনেক ছাত্র দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত মেদিনীপুরের ছাত্র-ছাত্রীরা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করতো। সূর্যাস্তের পর শহরের রাস্তাঘাট জনমানবহীন হয়ে পড়তো। প্রত্যেককে চলতে হতো থানা থেকে দেওয়া কার্ড নিয়ে। কারণ পর পর তিনটি ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর মেদিনীপুর শহরে তখন সন্ত্রাসের রাজত্ব।

কলেজের ছাত্রদের উপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। তারা প্রাণভয়ে পলাতক। কলেজ প্রায় শূন্য। সারা কলেজে মাত্র ১১৮ জন ছাত্র। যে গুটিকয়েক ছাত্র তখন শহরে থাকতো তাদের পথ চলতে হতো সাদা, সবুজ কিংবা লাল কার্ড নিয়ে। সাদা কার্ড ধারীরা পুলিশের চোখে নিরীহ। সবুজ ছিল সন্দেহ ভাজন। আর লাল কার্ড ধারীরা ছিল বিপজ্জনক। কোন যুবক বা ছাত্র কি ধরনের কার্ড পাবে তা ঠিক করার মালিক ছিল গোয়েন্দারা। কতদিন যে ছাত্রদের পুলিশের সামনে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো তার হিসেব নেই।[২১] সাইকেল চড়া, বিশেষ বিশেষ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা, ৩/৪ জন একসঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া কারও বাড়ীতে কেউ এলে বা শহরের বাইরে কেউ গেলে থানায় খবর দিতে হতো। সপ্তাহে সপ্তাহে সব যুবকদের থানায় হাজিরা দিতে হতো। রাস্তায় রাস্তায় পিউনিটি পুলিশ টহল দিচ্ছে আর সর্বত্র গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতি বাড়ির উপর উচ্চহারে পিউনিটি ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় সরকারের বশংবদ লোকেদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ভিজিল্যান্স-কমিটি। তারা যখন তখন ঢুকে ছেলেরা কি করছে, কার সঙ্গে মিশছে তা জেনে পুলিশে খবর দিত।[২২] এ সময় মেদিনীপুরের ছাত্র আন্দোলনে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অনিল কুণ্ডু, অনন্ত মাজী, অনিল দে, হিরন্ময় পতি, অনিল ভঞ্জ, সৈয়দ আলি হোসেন ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে কার্ড-ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

১৯৩৫ সালে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে বহু তরুণ বিপ্লবী কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ছাত্রদের মধ্যে তখন একদল মানবেন্দ্র নাথ রায় পন্থী, কেউ সৌমেন ঠাকুর পন্থী, কেউ লেবার পার্টির সমর্থক, আবার কেউবা সোস্যালিষ্টদের পক্ষে ইত্যাদি। তবে যে গোষ্ঠীরই হোক্ না কেন প্রত্যেকেই অনুভব করে সন্ত্রাসবাদী পথে নয়, স্বাধীনতা আসবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পথে। কারণ, পৃথিবীর সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজ বিকাশের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ, স্বাধীনতা লাভের পথপ্রদর্শন, বিকল্প সমাজবাদ দেবার ক্ষমতা মূল আর্থ-সামাজিক স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদের নেই। কারণ সশস্ত্র শ্রেনীসংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়। তাই অগ্নিস্রাবী কথার ফুলঝুরি, চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ ও এক গুচ্ছ অসমসাহসী বীর ছাড়া সন্ত্রাসবাদের দেবার কিছু নেই। আসলে সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে এক রোমান্টিক ধারণা যুব ছাত্রদের অনেকাংশকে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় সুসংহত সুসংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সালে জন্ম নেয় 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'।[২৩] সম্পাদক হলেন মেদিনীপুরের জঙ্গী ছাত্র নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী। এই ছাত্র সংগঠনের সুস্পষ্ট গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচী প্রণীত হল যা ছিল কার্য্যতঃ বে-আইনী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক দলিলেরই ছাত্র সংস্করণ। অবশ্য ছাত্রদের নিজস্ব দাবি দাওয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। বস্তুতঃ সমসাময়িক বঙ্গীয় ছাত্রসমাজ দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিকতর আত্মসচেতন হয়। বিদেশী শোষণকারী, অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্ত ও দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছাত্রসমাজকে চিন্তিত করে। ছাত্রদের মহান আদর্শ হয় পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করা, রক্ষা করা ও সাহায্য করা। এই সমস্ত অভীষ্ট সাধনে শুরু হয় মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজের পথ চলা। ১৯৩৭-৩৮ সালে আন্দামানে বন্দীদের মুক্তির দাবীতে যে গণআন্দোলন শুরু হয় তাতে বাংলার সাথে মেদিনীপুরের ব্যাপক অংশের ছাত্র-যুব সামিল হয়ে স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল ও সমাবেশ করে। এই আন্দোলনের তীব্রতায় ও জঙ্গীপনায় ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘমেয়াদী শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দী ছাড়া বাকী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা ছাত্র ফেডারেশনের ভাবমূর্ত্তিকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়।[২৪]

১৯৩৯ সালে মেদিনীপুর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শুরু হয় চারটি কর্মীগ্রুপে পাঠচক্র। ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়। কর্মীদের জনপ্রিয় করার জন্য সামাজিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। গরীব মেথর, ঝাড়ুদার এবং রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ী চালকদের গরীব বস্তি থেকে ছাত্র সংগ্রহ করে বই, শ্লেট, পেন্সিল, কেরোসিন ও হ্যারিকেনের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরীব ছেলে মেয়েদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেও থাকে। এর সাথে 'Poor Students' Relief Committee' গঠন করে গরীব ছাত্রদের থাকা ও

খাওয়ার জায়গা করে দেওয়া, টিউশনী ও পুস্তক সরবরাহ এবং অবশেষে গরীব ছাত্রদের জন্য কোতবাজারে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়। শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে ছাত্রাবাসের জন্য চাল, টাকা পয়সা সংগ্রহ করা হয়। মেদিনীপুর জেলা ছাত্র সাংস্কৃতিক এসোসিয়েশন স্থাপন করে প্রতিযোগিতাও সংগঠিত করা হয় ইত্যাদি।[২৫] এর ফলে ছাত্র কর্মীরা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে অন্যান্য ছাত্র ও শহরবাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটে। ছাত্র সংগঠনের কলেবর বৃদ্ধির জন্য তাদের কোন রাজনৈতিক শুভক্ষণের অপেক্ষা করতে হয়নি। নিজেদের আত্মত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই তারা তাদের সংগঠনকে মজবুত করেছিল। এ সময় মেদিনীপুরের ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাদের অনেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলা-ধুলা সহ পড়াশোনার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ছিলেন। যেমন, শান্তিময় পতি স্পোর্টস-এ চ্যাম্পিয়ান ছিলেন এবং অনন্ত মাজী খেলাধুলা সহ সাঁতারে কৃতি ছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু ছাত্রনেতা ছিল মার্জিত আচারের মেধাবী ছাত্র।[২৬]

ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মীরা মেদিনীপুর ও খড়্গপুর শহরের ছাত্রদের নিয়ে নাড়াজোল রাজার কাছারী বাড়ীর ছাদে কলেজছাত্রী শ্রীমতী ছায়া গুপ্তার সভানেত্রীত্বে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে মেদিনীপুর জেলা ছাত্রফেডারেশনের সংগঠন কমিটি গঠন করে। অনন্ত মাজী সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন। ঐ সময় ছাত্র অভিযানের সম্পাদক বারীন রায় ও গার্লস স্টুডেন্ট কমিটির প্রাদেশিক সম্পাদিকা শ্রীমতী শান্তি সরকার (বর্তমানে শান্তি বসু) উক্ত কনভেনশনে উপস্থিত থেকে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। এই মিটিং-এ মেদিনীপুর কলেজে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করার দাবীতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আন্দোলন প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর দাবীতে পরিণত হয়। দেওয়াল পোষ্টার, পিকেটিং, ইত্যাদি শুরু হয়। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ছাত্র ইউনিটের দাবী পেশ করা হয়। শেষে কলেজে ধর্মঘটও হয়। সম্ভবতঃ ছাত্রদের সার্বজনীন দাবির ভিত্তিতে এটিই হল মেদিনীপুর কলেজ তথা মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজের প্রথম সফল ধর্মঘট। অবশেষে কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্কিম দাস ব্যানার্জী ছাত্র ইউনিয়ন ও নির্বাচন করার দাবী মেনে নেন। জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে মেদিনীপুর জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভ্যদের নিয়ে প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৭] সম্মেলনে ছাত্র স্বার্থ ও জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, এই সময়ে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবিও আদায় হয়।[২৮]

মেদিনীপুরের ছাত্র আন্দোলনে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী ছাত্ররাই অধিক অংশগ্রহণ করেছিল। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে প্রথমতঃ শহরাঞ্চলে অবস্থিত ছাত্ররা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পিতা-মাতার কাছ থেকে বহুদূরে থাকায় বিনাবাধায় স্বাধীন চিন্তানুযায়ী সুনির্দিষ্ট

পথে বিচরন করার সুযোগ পায়; দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী গ্রন্থাদি বিশেষতঃ মার্কসবাদ সম্পর্কিত পুস্তকাদি পাঠের ফলে এবং শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের নেতাদের সংস্পর্শে এসে এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে চিন্তার জড়তা কাটিয়ে সংস্কারমুক্ত বলিষ্ট আন্দোলনে যোগদানের সুযোগ পায়। ছাত্রসমাজ হয় চিন্তাশীল, অধিকতর স্বাধীনতাকামী, দুর্নীতি ও অত্যাচার নিরোধে বদ্ধ পরিকর এবং সমাজ ও দেশসেবায় অগ্রণী। ছাত্রদের কার্যক্রম হয় নিজেকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করা, বিক্ষোভ-সূচক শোভাযাত্রা বের করা, আবেদনপত্র বের করা, পথে বক্তৃতা দেওয়া এবং বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি ও সাহচর্য লাভ করা। মেদিনীপুর জেলার শহরাঞ্চলে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) সৌখীন ও দুর্নীতিপরায়ণ জীবন যাপনে আসক্ত শ্রেণী (২) আধুনিক ঘটনাবলী অপেক্ষা কলেজীয় পাঠে অধিকতর অনুরক্ত শ্রেণী এবং (৩) নব চিন্তাধারায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছাত্ররা ছিল ছাত্রসম্প্রদায়ের নগন্য অংশ, সম্ভবতঃ ১০-২০ শতাংশের অধিক নয়। কিন্তু তারাই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক রাজনীতি সচেতন এবং সন্দেহবাদিতা তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। এই শ্রেণীর ছাত্ররাই মূলতঃ ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্ব দেয় মেদিনীপুর জেলাতে।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে মেদিনীপুর জেলায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম ছিল। মুসলিম লীগ তাদের ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করতো, তবে সফল হতো না। উল্টে তারা ছাত্র ফেডারেশনের হয়ে কাজ ও প্রচার চালাতো। ১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে মেদিনীপুরে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে সৈয়দ আলি হোসেন ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছাত্রসমাজের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে কখনও অতিক্রম করতে পারেনি। মুসলমান ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের মতো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লবন সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেনি সত্য তবে তারা ইতস্ততঃ সংগঠিত কিছু কর্মসূচী পালন করেছিল। যেমন ঢাকা মুসলিম হলের ছাত্ররা কাঁথিতে লবন সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করেছিল।[২১] যখন মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনকারী কুখ্যাত আই, সি, এস এবং আই, পি, এস অফিসারদ্বয় সমর সেন ও খওয়াজ মহম্মদ কায়সর মুসলমানদের প্ররোচিত করেছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে, সে জেহাদে মুসলিম ছাত্রসহ জনগণ যোগ দেয়নি। কিন্তু নেতৃবর্গের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা যে বেড়ে গিয়েছিল সে কথা অনস্বীকার্য।[৩০]

১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে সারা দেশেই তরুণ ছাত্রসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে সমস্ত বয়েসের এবং সমস্ত শ্রেণীর ছাত্ররা এত ব্যাপকভাবে আন্দোলনে অংশ নেয় যে সেটা ছিল অভূতপূর্ব। মেদিনীপুর জেলাতেও এই আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ঘটেছিল কাঁথি, তমলুক, মহিষাদল, সূতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, ময়না, প্রভৃতি মহকুমা ও থানা অঞ্চলে; যেভাবে তারা থানা ও সরকারি ভবন দখল, রেললাইন ওপড়ানো, ডাক

টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়ার মত জঙ্গী কাজে অংশগ্রহণ করেছিল—অতীতে তেমনটি কখনই দেখা যায়নি। '৪২ -এর আন্দোলনে যে সমস্ত ছাত্র বিশেষ ভূমিকা নিয়ে ছিল তারা হল মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্র মধুসূদন মুখার্জ্জী, সত্যরঞ্জন বেরা, বিমল মহাপাত্র, সুকুমার ঘোষ, দুর্গা মুখার্জ্জী, ভবানী অধিকারী, সত্যেন সরকার প্রভৃতি। আগস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্বে মেদিনীপুর জেলায় চারজন ছাত্র আত্মহুতি দেন। এঁরা হলেন কাঁথি মহকুমার বিভূতিভূষণ দাস (বর্ত্তন, ভগবানপুর), সুকুমার দাস (বারাতলা খেজুরী), তমলুক মহকুমার পুরীমাধ প্রামাণিক (দ্বারিবেড়িয়া, মৃতাহাটা) এবং আশুতোষ কুইলা (মাধবপুর, মহিষাদল)। কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের ছাত্ররা অগাষ্ট আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। নেতৃত্ব দেয় সুবোধগোপাল গুচ্ছাইত, প্রবীর চন্দ্র জানা, বনবিহারী পাল, অমূল্য রতন ভৌমিক, অতুলচন্দ্র মিশ্র, প্রবোধকুমার ভৌমিক, আভা মাইতি প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা। তাঁদের আন্দোলনের ফলে কাঁথি চন্দ্রামণি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় ও কাঁথি হাইস্কুল অচল হয়ে পড়ে। এ সময় এগরা ঝাটুলাল হাইস্কুল জোর পূর্ব্বক বন্ধ করার জন্য ছাত্রনেতা নির্মল মহাপাত্রকে গ্রেপ্তার করা হলে সমগ্র মহকুমায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এসময় ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ ছিল যুদ্ধ বিরোধী। সেকারণে তারা যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় মহকুমাশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় কাঁথি শহরে আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠান পিকেটিং করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। বন্দীদের উপর নানাপ্রকার পুলিশী অত্যাচারের বিরূদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আবার গ্রেপ্তার হয় ছাত্র নেতা অতুলচন্দ্র মিশ্র ও সতীশচন্দ্র মাইতি(কাঁথি), অনন্তকুমার গিরি (ভগবানপুর), প্রবোধকুমার ভৌমিক প্রমুখ ২৮ জন ছাত্র। ইংরেজদের বিচারে এই আঠাশ জন বন্দী ছাত্রের মধ্যে সাতজন বেকসুর খালাস পায়, দশজনের একবৎসর ও বাকি এগার জনের দেড়বৎসর কারাদণ্ড হয়। আবার মাতঙ্গিনী হাজরার মত বৃদ্ধার আত্মাহুতির পর অনেক মেয়েই যে আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি একথা সহজেই অনুমেয়। এমনকি ছাত্র ফেডারেশন নীতিগতভাবে আগষ্ট আন্দোলনের বিরোধীতা করলেও এই সংগঠনের অসংখ্য সদস্যও এই গণ-আন্দোলনের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি, এমনকি কয়েকজন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিল।[৩১]

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের ছাত্রীদের ভূমিকাও নগণ্য নয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্রী ও মহিলা কর্মী মেদিনীপুর জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে যোগ দেয় এবং ছাত্রী ফ্রন্টে সক্রিয় থাকে তাদের একটি তালিকা পাওয়া যায় সরোজ মুখার্জীর স্মৃতিকথা থেকে।[৩২] এরা হল সাধনা পাত্র, বিমলা মাজী, প্রমিলা পাত্র, নির্মলা সান্যাল প্রমুখ। মেদিনীপুরের বিপ্লবী আন্দোলনেও মেয়েরা যোগ দিয়েছে। যেমন—মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে হত্যার সঙ্গে যুক্ত ছিল ঊষা সেন, ইত্যাদি। এরা হয় ছাত্রী, নয়তো ছাত্রীদল থেকেই বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল।[৩৩] সংখ্যায় কম হলেও মেদিনীপুরের ছাত্রীসমাজ ছিল সামগ্রিকভাবে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অশ। তখন ছাত্রীদের অংশগ্রহণ

নিঃসন্দেহে মেদিনীপুরের ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করে।

১৯৪২ এর ১৩ এপ্রিল ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের এক সর্বদলীয় সভা থেকে গঠিত হয় 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতি '। অনতিবিলম্বে মেদিনীপুরের অনেক শহরে ও গ্রামে এই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রচার আন্দোলন, সিভিল ডিফেন্সের কাজগুলি সুগঠিত করা, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, খাদ্য-বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা, জেলা বোর্ড কো-অপারেটিভ বা সরকারি সাহায্যে চাল, ডাল প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যের দোকান চালাতে সাহায্য করা, যুযুৎসু, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের বাহিনী সংগঠিত করা, বিপদের সময় নিজেদের ও প্রতিবেশীদের যাতে রক্ষা করতে পারে তার জন্য এবং গেরিলাযুদ্ধের সাহায্যের জন্য মহিলাদের একটি আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা, 'উৎপাদন বাড়াও' আন্দোলনে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।[৩৪] মনিকুন্তলা সেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম জেলা সম্মেলন হয় তমলুকে। পরে জেলার কেশপুর, দাসপুর, শালবনী, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চলে একটি করে প্রাইমারী কমিটি গঠন করা হয়। মেদিনীপুর জেলায় এই সমিতি বিস্তারে মূল ভূমিকা নেন মনিকুন্তলা সেন, গীতা মুখার্জী, ঊষা চক্রবর্তী, সাধনা পাত্র, বাতাসী ইত্যাদি। জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিল মেদিনীপুর শহরের কলেজ-ছাত্রী প্রতিমা ব্যানার্জী এবং আরও কয়েকজন। তমলুকেই স্থাপিত হয়েছিল জেলা কমিটি।[৩৫] জেলা সম্পাদিকা হয় অনুপমা পট্টনায়েক।

সমসাময়িক কালে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে সংঘটিত একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো বিধানসভা অভিমুখে খাদ্যের দাবীতে এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলাদের বিশাল 'ভূখা মিছিল' (১৯৪৩, মার্চ ১৭)। ছেঁড়া নেকড়ার ফালি পরা হাড্ডিসার শত সহস্র মায়ের দল তাঁদের হাড়জিরজিরে মুমূর্ষু শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসীদের চেতনায় সেদিন যেন কষাঘাত হেনেছিল। কলকাতার অনুসরণে কমিউনিষ্ট মহিলাদের নেতৃত্বে এই সময় মেদিনীপুরেও 'ভূখা মিছিল' জেলা ও মহকুমার সরকারি কার্য্যালয়ের দিকে ধাবিত হয়েছিল। অবশ্য এরই সঙ্গে তখন চলছিল ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রচার।[৩৬] এই প্রচার ও ভুখা মিছিলের পুরোভাগে তখন ছিল মেদিনীপুরের বহু ছাত্র-ছাত্রী।

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ এই দীর্ঘ সময়ে মেদিনীপুরের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধারাতেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। তারা ভিন্ন মত ও পথের পথিক হলেও তাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল দেশকে মুক্ত করা। দেশ সেবা করা। তাই মেদিনীপুরের ছাত্রসমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষহীন সৈনিক বলা যায়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মেদিনীপুরের ছাত্রআন্দোলনের সীমাবদ্ধতা যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। মেদিনীপুরের সমস্ত গণসংগ্রামে তারা যে অংশ নিয়েছে, এমনও নয়। তবু তাদের উদ্দেশ্য, প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ সাধুবাদের যোগ্য। তাদের আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই আতঙ্কিত করেনি, দেশের কায়েমী স্বার্থকেও বিচলিত করেছিল।

নয়

মেদিনীপুরের ডোম সম্প্রদায়ের বিবর্তন

ডোম বা ডোম্ব শব্দ খুব পুরাতন নয়। ষষ্ঠ শতকের পূর্বে, এমনকি অমরকোষের শূদ্রবর্গেও ডোম জাতির নাম নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ডমঃ বলে একটি জাতের নাম পাওয়া যায় - যা বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। আবার মৎস্যসূক্ততন্ত্রের ৪৯ পটলে ডোমদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ডোম, চন্ডাল এবং ঘোষককে (সম্ভবতঃ বাজানিয়া ডোম বা ঢাকী) একস্তরে ধরা হয়েছে। যেমন—

চন্ডালশ্চৈব ডোমশ্চ জ্ঞানকশ্চ- তথা ইতি
দন্ডীরশ্চৈব ভন্ডীরো ভূষুন্ডশ্চ বৃথাশ্রমী।।[১]

নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে ডোমদের উৎস নিয়ে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ মনে করেন-- ডোমরা কোলগোষ্ঠীর। আবার অনেকের মতে ডোমরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। এক্ষেত্রে ড্যাল্টনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ডোমরা কোলগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তারা দ্রাবিড়দের মত উত্তর-পশ্চিমাংশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে নি, করেছে ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ দিয়ে।[২] রিজলের অভিমত ড্যাল্টনের ঠিক উল্টো। তিনি মনে করেন, ডোমরা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত ছিল। আর ইন্দো-এরিয়ান ট্রাডিশানের নমঃশূদ্ররা এক সময় মৌলিকভাবে (Originally) দ্রাবিড় জাতি গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।[৩] তারা যে গোষ্ঠীরই হোক - চর্যাপদে তফসিল জাতি হিসাবে ডোমেদের স্থান সর্বাগ্রে। ডোম জাতির উল্লেখ আছে চর্যাপদের ১০ ৫,১৮,১৯ ও ৪৭ সংখ্যক পদে। অষ্টাদশ শতকের ধর্মপূজা পদ্ধতিতে ডোমেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আরও উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিজমাধবের চন্ডীমঙ্গলে। প্রাচীনকালে ডোমদের অবস্থান মূলতঃ বাংলা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমুহে সীমাবদ্ধ ছিল। আজ ভারতের বহু জায়গায় এই আধা যাযাবর জাতি ছড়িয়ে পড়েছে কয়েকটি শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে। ডোমেদের একটি শাখা মগইয়া (Magaiya) নামে পরিচিত। এরা একসময় স্বভাবজাত চোর বা সিঁদেল চোর ছিল। এদের আর একটি সম্প্রদায় যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে মোটামুটি স্থায়ীভাবে গ্রামে বা শহরের প্রান্তে বসবাস শুরু করে।[৪] যুগের প্রবাহে এই আধা-যাযাবর আদিবাসীর যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, তা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রের কাছেই চিত্তাকর্ষক।

ডোমেরা কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমাজে একেবারে অস্পৃশ্য ছিল। থাকতো শহরের বাইরে। দিনের বেলায় প্রাচীনকালে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলতো। হঠাৎ ছোঁয়ায়, নানান সামাজিক আচার করে শুদ্ধ হতো। অথচ এই সব উচ্চবর্ণের মানুষদের অনেকেই,

এমনকি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাও তাদের দেহসঙ্গ লাভের জন্য রাতের আধাঁরে ডোম্বীনিদের কুঁড়ে ঘরে যেতো। ডোম্বীনিরা তাদের দেহদান করে আনন্দ দিত। এর জন্য ডোম্বীনিদের বিশেষ আর্থিক লাভ যে হতো তা নয়। এটিকে তারা তাদের সামাজিক কর্তব্যের অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করতো। শুধু তাই নয়- তান্ত্রিক কাপালিকদের তন্ত্রসাধনায় সঙ্গদান করে সহজিয়া সাধনতন্ত্রের সহায়ক হতো। এই প্রসঙ্গে চর্যাপদের ১০ সংখ্যক পদের একটি অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

" আরে ডোম্বি, নগরের প্রান্তে তোর কুঁড়ে
আর নিয়মিত আলিঙ্গন করিস নেড়া ব্রাম্ভনকে
হ্যাঁরে ডোম্বী আমিও তোর সহসঙ্গ করব,
কারণ আমি কাহ্নপাদ তান্ত্রিক কাপালিক-উলঙ্গ হয়েই আছি।"[৭]

পদকর্তা কৃষ্ণাচার্য ডোম্বীর দুটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। ডোম্বীনিরা বদ্ধ ও মুক্ত এই দু-জাতীয় লোক নিয়ে লীলা করে। সমাজের কেউ কেউ যেমন তাকে কটু কথা বলে— তেমনি আবার কেউ কেউ তাকে সর্বদাই কন্ঠলগ্ন করে রাখে। ডোম্বীনি যেমন কর্মকুশলা, তেমনি তার থেকে অধিকতর দুষ্টা রমনী এককালে সমাজে ছিল না।[৮] বর্তমানে ডোম্বীনিদের সামাজিক অবস্থান বদলেছে। এই পেশা সমাজে আজ স্বীকৃত নয়। মেয়েদের মধ্যে, আংশিক হলেও, প্রাথমিক শিক্ষার প্রবেশ ঘটেছে। ছেলেদের অবস্থাও তথৈবচ। ১৯৬২ সালে সারা পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৫৩০ জন ডোম সম্প্রদায়ের ছাত্র বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছে।[৯] যে সমস্ত ডোম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে সমীক্ষা চালানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে কয়েকজন মাত্র মাধ্যমিক পাশ করেছে। সরকারের বিভিন্ন রকম আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার যথাযথ বিস্তার না হওয়ার কারণ আছে। এক, শিক্ষালাভের জন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোথায় কি সুযোগ রয়েছে তার সন্ধান অনেক ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ জানে না। দুই, চরম দারিদ্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছেলে মেয়েদের কোন না কোন কাজে লাগিয়ে দেয়। তিন, ডোম সম্প্রদায়ের অনেক মানুষের আজও ধারণা উচ্চ-শিক্ষা, চাকরি-বাকরি তাদের জন্য নয়, ও সব 'বাবু'দের জন্য।[৮]

মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে- ডোমদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সমাজে পুরুষের প্রাধাণ্য বেশি হলেও নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা ভোগ করে। তবে শহরে বসবাসকারী ডোম মহিলারা বেশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। অনেক পরিবারে লক্ষ্য করা গেছে— মেয়েদের উপার্জ্জনেই সন্তান-সন্ততির ভরনপোষন চলে। পুরুষ সদস্যরা তাদের অর্জিত অর্থের অনেকটাই নেশা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করে। বর্তমানে সামাজিক মেলামেশায় মেদিনীপুর জেলার কোথাও কোথাও ডোম সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দৈহিক শৈথিল্য কিছুটা দেখা দেয় ঠিকই, কিন্তু তাতে তেমন দোষের কিছু নয়, সমাজে তা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ডোমেদের বিচিত্র সব পেশা ছিল। আজও আছে। তারা যুগ যুগ ধরে

বাঁশ ও বেতের কাজ করে আসছে। শুধু তাই নয়, বস্ত্রশিল্পেও তারা পারদর্শী ছিল। চর্য্যাপদে পাওয়া যায়---

'আরে ডোমি তুই তাঁত বিক্রয় করিস, চাঙ্গেড়া বিক্রয় করিস
তোর পাশে এসে আমি নাচের পোশাক ছেড়ে ফেলি'।[৮]

বর্তমানে মেদিনীপুরের কোন ডোম পাড়ায় বা গ্রামে তাঁতের কাজ চলে না। তারা কি কারণে এই পেশাটিকে পরিত্যাগ করেছে তা বোঝা যায় না। অনেক ডোম সম্প্রদায়ের মানুষই জানে না যে তাদের পূর্ব পুরুষেরা তাঁতের কাজ করতো। তবে চাঙ্গেড়া ইত্যাদি বানানোকে তারা আজও তাদের অন্যতম মূল পেশা হিসাবে রেখেছে। কোথাও কোথাও তারা খেজুর পাতার চাটা এবং মাদুর তৈরী করে।[১০] তারা বাঁশ ও বেতের সাহায্যে আজও ঘরের কাজের বা অলংকরণের জিনিসপত্র বানায়। যেমন- ঝুড়ি, কুলা, সাজি, পাখা, টোকা(গ্রামে চাল ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়), চাঁচ, জালা, রিক্সার হুড্, মুটে মজুরের ঝাঁকা বা গুনচিহ্ন (×) আকারের চানাওয়ালা টুকরী। প্লাস্টিকের জিনিসপত্রের দৌরাত্মে তাদের সযত্নে রক্ষিত বহুদিনের কুটীর শিল্পটি আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে। শিল্পটির যেটুকু আজও টিকে আছে তা দু-একটি জেদী ও ধৈর্য্যবান শিল্পীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়াসে। অথচ এই কাজ ও শিল্পটিই ডোমেদের আদি পেশা (original profession) এবং পেশায় অধিক নিযুক্ত হোতো ডোম মহিলারা। আজ পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এক কাজ করে।

পূর্বে ডোমেদের অন্যতম পেশা ছিল মাছের কারবার করা। পুরুষরা মাছ ধরতো— আর মেয়েরা তা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো। অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব ছিল যৌথ। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল থেকে জানতে পারি—

'মাছোনি বসিছে মৎস্যের পসার লইয়া কোলে।
পসার হোন্তে মৎস ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে।।
মৎসধরি ডোমনীয়ে করে টানাটানি।
কড়ি না দিয়া মৈছ্য লৈয়া যাও কেনি।।
ভাঁড় দত্ত বোলে ডোমনী বলিরে তোমারে।
এথকাল মৎস বেচ কর দেয় কারে।।
ডোমনীয়ে বোলে ভাঁড়ু তুই তার কে।
করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় যে।। (ভাঁড়ু দত্তের বেসাতি)

হাটে জিনিস বিক্রির জন্য কর দেওয়ার রীতি বহুদিনের। বাজারে যে তাদের উপর জুলুম চলতো তা বেশ বোঝা যায়। আজকাল মেদিনীপুর জেলার ডোমদের মধ্যে মাছ বিক্রি পেশা নেই বল্লেই চলে। মাছ চাষ ও ব্যবসায় বর্তমানে আর বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দীঘার সমুদ্রে মাছ ধরা ও ব্যবসায়ে উচ্চবর্ণের মানুষও নিযুক্ত।

প্রাচীন কাল থেকেই ডোমেদের অন্যতম পেশা উৎসব আনন্দে বাজনা বাজানো। যারা

বাজনা বাজায় তারা 'বাজানিয়া ডোম' নামে সমাজে পরিচিত।[১২] ডোম নারীরা কেবল তাদের স্বজাতির বিবাহে উৎসবে নাচগান করে থাকে। অন্যজাতির উৎসব আনন্দে ডোমনারীরা অংশগ্রহন করাকে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও হাস্যকর বিবেচনা করে।[১৩] উপজাতিদের বাদ্যসঙ্গীত আজও সমাজে বিশেষ স্থান লাভ করে আছে। স্বল্প সময়ের জন্য কাজের খোঁজে অন্যত্র কোথাও গেলে তারা আজও বাঁশি, মাদল, প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে যায়। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যে বেলায় তাদের অস্থায়ী অস্বাস্থ্যকর কুঁড়ে ঘরটি বাঁশি মাদলের তালে তালে সঙ্গীত মুখর হয়ে ওঠে। ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক মহাশয় মনে করেন— ডুম ডুম করে বাজনা বাজানো থেকেই 'ডোম' শব্দের উৎপত্তি। ডোম শব্দটি ধন্যাত্মক।[১৪] বর্তমানেও অনেক ডোম ঢাক, ঢোল, সানাই বাজানোয় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। যেমন— সানাইবাদক হিসাবে একসময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল খড়গপুর শহর সংলগ্ন ডোমপাড়ার ওস্তাদ রমানাথ মাদুলী। বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে একসময় ডোমেরা নাচে গানেও বিশেষ পটু ছিল। কেউ কেউ মনে করেন— অধুনাকালের ধাঙ্গড় নাচটিই ডোমনাচের ঐতিহ্যবাহী। সাঁওতালদের বিবাহে আজও ডোমেদের নাচ গান বাজনার বিশেষ স্থান আছে। তবে ডোমেদের এই শৈল্পিক সত্বাটি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে আধুনিক আমোদ প্রমোদের করালগ্রাসে। আজকাল ডোম বিবাহ বাসরে তাদের নিজস্ব গান বাজনার বদলে সারা রাত ধরে ভি.ডি.ও. চলে। নিম্নমানের দৃশ্য দেখতে অনেকে ভালবাসে। কারণ— তারা বাবু সমাজের উলঙ্গ দৈনিক জীবন দেখে মজা পায় ও হাসে।

মেদিনীপুরের একটি বিশাল অঞ্চল একদা জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল। ঐসব এলাকার অধিকাংশ জমিদারের অধীনে ডোমরাই ছিল লেঠেল, বরকন্দাজ, কাহার, ঢালি অথবা বিশ্বস্ত অনুচর। এরা যে ঢাল আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করতো তা বেত দিয়ে তৈরী হত এবং বানাতো তারা নিজেরাই। এই থেকেই সম্ভবতঃ লড়াকু ডোম জাতি বেত— বাঁশের শিল্পকর্মের অনুপ্রবেশের দরজা খুঁজে পেয়েছিল। ডোমরা একদা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য সমাজে বিশেষ সমাদৃত হতো। মানিকচন্দ্র রাজার গানে উল্লেখ আছে যে— রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মাতা রাজাকে (পুত্রকে) এক হাড়ি—জাতীয় গুরুর কাছে দীক্ষা ও শিক্ষা নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। একটি বহু প্রচলিত পুরানো ছড়া থেকে ডোমদের সমর কৌশলের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে
ঢাক ঝাঁঝর মাদল বাজে
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি— ইত্যাদি।

জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়ার সাথে সাথেই ডোমেদের এই পেশাটিও উঠে যায়। তাদের অধিকাংশই পেশা হিসেবে বেছে নেয় কৃষিকাজকে। বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার শতকরা পঞ্চাশভাগেরও বেশি ডোম কৃষিকাজ করে। তবে বহুদিন তারা ছিল ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক— প্রধানতঃ ক্ষেত মজুরের কাজে লিপ্ত। বামফ্রন্টের আমলে ভূমি সংস্কারের ফলে তাদের বসবাসের জমিটিতে

পাট্টা হয়েছে। চাষের জন্য লাভ করেছে কিছু খাস জমি। ভাগ চাষও তারা করে। তবে প্রাপ্ত জমিটুকুর আয় দিয়ে তাদের সমবৎসর ভরণপোষণ চলে না। তাই অন্নসংস্থানের জন্য তাদের বেছে নিতে হয়েছে অন্যকাজ। যেমন— দিন মজুরী খাটা, পাহারাদারের কাজ করা, ছোট খাট ব্যবসা চালান, রিক্সা চালান, দরজির কাজ করা, নগরের আবর্জনা পরিষ্কার করা, মৃতদেহ সৎকার করা প্রভৃতি।[১১] কোন কোন ডোম ঘাতকের কাজও করতো। বর্তমানে থানায় বা হাসপাতালে পোষ্ট মর্টামের জন্য লাশ নিয়ে যাবে কে ? — ডোম, হাসপাতালে শরীর ব্যবচ্ছেদে সাহায্য করবে কে? শহরের নোংরা পরিষ্কার করবে কে? — সবই ডোম। সমাজের যত ঘৃনা ও নিকৃষ্টতম কাজগুলি ডোমদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হতো। হিন্দুসমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠদের তাদের প্রতি অবিচার কয়েক বছর আগে পর্যন্তও চলেছে। এই কারণেই E. T. Datton মন্তব্য করেছেন, I do not doubt that the Aryans had their helots, and I consider that we have in the really servile Castes `the Chandu;as, the lowest of men`, Pariahs, Dorns, and others, the people to whom, from the time immemorial, the vilest offices have leen assigned, and who so seldom rise from their abjcet condition, The descendants of those very helots; but I find no reason for the assertion that the progenitors of the modern Sudras were helots'[১২]

ডোম সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক সময় নৌ- চলাচলের সাথে যুক্ত ছিল। চর্যাপদের দশম সংখ্যক পদে দেখা যায়—

" হ্যাঁ লো ডোম্বি এখন তোকে ভালভাবেই জিজ্ঞেস করি—
তুই কার নৌকায় যাওয়া আসা করিস"[১৭]

আবার অনেক সময় ডোমসম্প্রদায় নৌ—বাহনের মাধ্যমে সমাজ সেবা করত নিঃস্বার্থভাবে। যাত্রীদের কাছ থেকে নৌ—পারাপারের জন্য কোন পয়সা বা বিনিময় সেবা গ্রহন করতো না।[১৮]

বর্তমানে মেদিনীপুরে নৌচলাচলের ব্যবস্থা নেই বল্লেই চলে। আর যেটুকু আছে তা মূলতঃ মাঝি সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই পেশাটি ডোমগণ কেন পরিত্যাগ করেছে তা বলা কঠিন। তবে আসাম উপত্যকায় আজও কিছু ডোমকে ধীবর ও নৌ চালকের ভূমিকায় দেখা যায়।

ডোমেদের মধ্যে স্ববর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ উভয়ই চলতো। তবে অসবর্ণ বিবাহেরই আধিক্য ছিল। তাদের মধ্যে গোত্র ও 'টোটেম' উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুরের ডোমদের বর্তমান গোত্র হল সান্ডেল্য (শোল মাছ খায় না), ময়ূর, চাঁদ (চাঁদা মাছ খায় না) প্রভৃতি। বহুকাল ধরে ডোমদের মধ্যে স্ববর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ চালু ছিল। তাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বহু বিবাহ করে। বিবাহের পূর্বে প্রাচীন প্রথামত কিছু কন্যাপণ দিতে হয়। তারপর কন্যার বাড়ি থেকে বরকে নগদ টাকা ও ঘড়ি, সাইকেল, ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয়।

মেদিনীপুরের ডোমদের বিবাহের রীতি নীতি সর্বত্র এক নয়। তবে আজকাল অধিকাংশ জায়গায় হিন্দু সমাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে কোন কোন অঞ্চল তাদের সাবেক রীতি বজায় রেখেছে। যেমন--- বিয়ের অনুষ্ঠানের পূর্বে পাঁচজন সধবা মহিলা সাদা আলতা পাড় শাড়ী পরে তিনটি কলসী ও শাঁখ নিয়ে পুকুর ঘাটে যায় এবং পরস্পর ছোঁয়াছুয়ি করে জলভরে ঘরে আসে। একটি শিলের চারধার চারটি তীরকাঠি ও সূতো দিয়ে বেষ্টন করে পান সুপারী দিয়ে পূজা করে। তার সামনে পাত্রপাত্রীর গায়ে হলুদের পর গ্রামের লোকজনের উপস্থিতিতে মালাবদল ও সিদুঁরদান হয়। বিয়েতে ব্রাহ্মণের কোন ভূমিকা নেই। আত্মীয় স্বজনরাই বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে।[১১] তবে কোন কোন গ্রামে কোন পরিবারে ডোমদের বিয়েতে ব্রাহ্মণদেরও প্রয়োজন পড়ে। এদের কাছে ব্রাহ্মণ দুরকমের। কম মূল্যের ব্রাহ্মণ ও বেশি মূল্যের ব্রাহ্মণ। ডোমেদের কেউ যদি নিজেই গলায় পৈতা নেয় এবং তাদের দশ কর্ম করায়, এমনকি নিজের সম্প্রদায়ের ছোঁয়া জলটুকু পর্যন্ত না খায় --- তাকে ডোমরা তাদের পুরুত বলে মেনে নেয়। এইসব ব্রাহ্মণ কিভাবে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের মন্ত্র নকল করে বিয়ে দিত এবং তাই নিয়ে কিভাবে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি চলত তার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসে। যেমন---

"রাখাল পন্ডিত (ডোম বামুন) বরকে বলিল--- বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।
বর আবৃত্তি করিল--- মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।
রাখাল কন্যাকে বলিলেন--- বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ।।
.... এমন সময় শিবু পন্ডিত দু হাত তুলিয়া বজ্রগর্জনে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্তরই নয়। বিয়েই হল না।

শিবু পন্ডিত তখন ঔদার্য দেখাইয়া কহিলেন, রাখালের দোষ নেই, আসল মন্তর আমি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কেউ জানেই না। .... এই বলিয়া সেই শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারন করিতে লাগিলেন এবং পরাজিত রাখাল নিরীহ ভাল মানুষটির মত বর- কন্যাকে আবৃত্তি করাইতে লাগিলেন।

শিবু কহিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় ভূজ্যপত্রং নমঃ।
বর আবৃত্তি করিল, মধু ডোমায় কন্যায় ভূজ্যপত্রং নমঃ।
শিবু কহিলেন, মধু এবার তুমি বল, ভগবতী ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ।

সকন্যা মধু ইহাই আবৃত্তি করিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে পদার্পন করে নাই। শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিলেন, বিপিন, তুমি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহা। বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে বহু সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল। শিবু কহিলেন , বর-কন্যা দুজনেই বল, যুগল মিলনং নমঃ। বর ও কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল। ইহার পরে বিরাট হরিধ্বনি সহকারে বর-কন্যাকে বাটীর মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমার চতুষ্পার্শ্বে একটা গুঞ্জন রোল উঠিল---

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে, হ্যাঁ, একজন শাস্ত্রজানা লোক বটে! মন্তর পড়াল বটে! রাখাল পন্ডিত এতকাল আমাদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।" এই উদাহরণ অনার্য সমাজে আর্য সামাজিক পক্রিয়ার অনুপ্রবেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উচ্চবর্ণের রীতিনীতি অনুসরণ করার সামাজিক মানসিকতা এতে প্রতিফলিত। মন্ত্রগুলো ঋষিরুবাচ না হোক, তবু তো এ মন্ত্র বিবাহবন্ধনে শিথিল নয়। বর্তমানে অনেক গ্রামে উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ব্রাহ্মনেরাও ভাল দক্ষিনাদি পেলে ডোম বা অন্য উপজাতিদের বৈদিক মন্ত্র পাঠদান পূর্ব্বক বিবাহ কার্য সমাধা করে দেন। বিবাহের আচার অনুষ্ঠান বর্ণ হিন্দুদের মত পালন করা হয়।[২১]

জেলায় ডোমেদের ধর্ম পালনের ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। বর্ণ হিন্দুদের আঞ্চলিক প্রভাব ডোমেদের উপর প্রতীয়মান। বর্তমানে ডোমেদের অনেকেই বৈষ্ণব,ধর্ম গ্রহন করে রাধাকৃষ্ণের পূজা করে। মনসা পূজা, জুগনী পূজা, টুসু ও ভাদু পূজা, কালী পূজা, শীতলা পূজা প্রভৃতি প্রচলিত প্রায় সব পূজাই মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ডোমরা করে। পূজাকে কেন্দ্র করে মুরগী,পাঁঠা, পায়রা, ঘুঘু প্রভৃতি বলি দেওয়া হয় এবং দেশী মদের আয়োজন করা হয়। বয়স্কদের সামনে কিশোর কিশোরীরাও কোথাও কোথাও নেশা করে। একে সামাজিক অপরাধ রূপে গন্য করা হয় না।[২২] মেদিনীপুরের বেশ কিছু অঞ্চলে আজও ধর্মপূজার প্রচলন আছে। আজও ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা, যদিও এখন কৈবর্ত,শুঁড়ি, বাগদী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপূজার পুরোহিত বিরল নয়।

বহুদিন ডোমেরা প্রথাগত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। আজকাল তাদের মধ্যে কিছুটা শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। তবু ৫% অধিক স্বাক্ষরলাভ সম্পন্ন হয় নাই। মাধ্যমিক পাশের সংখ্যা খুবই কম। মেয়েদের মধ্যে পড়াশুনার চল নেই বল্লেই চলে। এর প্রধান কারণ চেতনার অভাব। আর্থিক অনটন অবশ্যই দায়ী। তবে ডোম সমাজে নারীদের শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আজও অনেক পুরুষ স্বীকার করে না। পূর্বে ডোম নারীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করত আজ তা অনেকাংশে খর্বিত। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সারা জেলায়[২]। ১ জন ডোম তরুণ গ্রহন করেছে মাত্র। বর্তমানে স্নাতকোত্তর শ্রেনীতে অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা মাত্র একজন।[২৩]

মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এরা বহুকাল ধরে মৃতদেহ হয় কবর দেয় নতুবা দাহ করে। আর্থিক অসচ্ছলতা কবর দেওয়ার মূল কারণ। মৃতদেহ সৎকারের পর স্নান করে একটি লৌহ খন্ড, একটি পাথর, কিছু গোবর স্পর্শ করে মৃতব্যক্তি পূর্বপুরুষদের স্মরন করে ভাত ও মদ উৎসর্গ করে ঘরে ঢোকে। মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ৯ দিন, কোথাও ১২ অথবা ১১দিন অশৌচ পালন করার সময় মাছ মাংস খায় না। শ্রাদ্ধের দিন কোথাও শূয়োর, কোথাও ছাগল কেটে রান্না করা হয়। সম্পূর্ণ নেশা না হওয়া পর্যন্ত মাংসের সাথে দেশী মদ খাওয়া চলে। কোন কোন জায়গায় ব্রাহ্মণের সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। কোন কোন জায়গায় আবার সম্পূর্ন ভিন্ন চিত্র। ব্রাহ্মণদের দিয়ে বামুন কায়েত ঘরের মত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। কিছুটা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত ডোম

পরিবারের মধ্যে এটি পরিলক্ষিত হয়। মৃতব্যক্তির সম্পত্তি তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে সমানভাগে বণ্টিত হয়।

কথিত হয়, বল্লাল সেনের আমলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় হাড়ি,চামার, মুচি, বাউড়ী, ও ডোম সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীভূক্ত ছিল। এদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ সহ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা জল ও মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করতো না। বর্ণ হিন্দুদের ধোপা, নাপিত প্রভৃতিরাও তাদের বাড়িতে কাজ করতো না। এদের অপরাধ ছিল সর্বপ্রকারের অপরিচ্ছন্ন খাদ্য খাওয়া।[১৮] তাদের খাদ্যের তালিকায় ছিল গরুর মাংস, শূকর মাংস, ঘোড়ার মাংস, ধানের ক্ষেতের মধ্যে গর্ত করে থাকা ইঁদুর, এমনকি যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার স্বাভাবিকভাবে মারা যেত- সেই মরা জন্তুর মাংস।[১৯] এ সমস্ত খাদ্য গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ছিল চরম নিষিদ্ধ।

তবে আজকের অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুর হেঁসেলে ডোমেদের অবাধ বিচরণ। হাঁড়ি কলসী মাজা থেকে রান্না করা পর্যন্ত। সমাজে আজ আর তারা ব্রাত্য নয়। আগে ডোমেদের একাংশ অভাবের তাড়নায় মরা ছাগলের মাংস খেত। বর্তমানে আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে তা বর্জিত হয়েছে। তবে ডোমদের মধ্যে নেশার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এর কবলে পড়ছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল ভোট লাভের আশায় মাঝে মাঝে মদের যোগান দেয়। সব রাজনৈতিক দলের কম বেশি লক্ষ্য হল যেন তেন প্রকারে রাজনীতির বাজারে তাদের সমর্থন আদায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও আর্থিক উন্নতির বিষয়ে তারা প্রায় উদাসীন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও ডোমেদের আর্থিক উন্নতি হয়নি বল্লেই চলে। অথচ তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য সরকার অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আবার আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক বিবর্তন ঘটে। তবে আশার কথা — পূর্বে ডোম সহ অন্যান্য আদিবাসী সমাজ যেভাবে অবহেলিত হত তা আজ আর হয় না। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে আজকের মতো আদিবাসীদের বিভিন্ন জাতি হিসাবে দেখা হত না। তারা অবলীলাক্রমে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরে বিচিত্র কাজের ভার নিয়ে যোগ দিত। তারপর ধীরে ধীরে ধাপের পর ধাপ ডিঙ্গিয়ে পুরাতন পরিচয় ফেলে হিন্দু সমাজের বিচিত্র শ্রমজীবী দলে বিলীন হয়ে যেত। বর্তমানেও পুরানো প্রবাহে নতুন করে জোয়ার এসেছে। একথা ঠিকই, মেদিনীপুর জেলার ডোম সম্প্রদায়ের অনেকেই আজও দরিদ্র, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, নিরক্ষর তথাপি তারা আর অস্পৃশ্য নয়, ব্রাত্য নয়— তারা বর্তমান বাংলার আর্থ সামাজিক বিবর্তনের অন্যতম ক্লান্তিহীন পথিক।

সূত্র নির্দেশ ও টীকা

এক

১। তরুণদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ১১৬।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬-১১৭।

৩। প্রণব রায়, 'অবতরণিকা', মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ২য় খণ্ড, বিনোদশংকর দাস ও প্রণব রায় (সম্পাঃ) কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ঝ।

৪। বিনোদশংকর দাস (সম্পাঃ), মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ১ম খন্ড, কলিকাতা,১৯৮৯, পৃ.।

৫। প্রণব রায়, মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ, কলিকাতা,১৯৮৬, পৃ.৮ ।

৬। যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৮, পৃ.৪২-৪৩।

৭। নিবারণ চন্দ্র বসু, 'মেদিনীপুরের সেকাল একাল', মাধবী, তৃতীয় বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা।

৮। তারাপদ সাঁতরা, (তথ্য সংকলন ও গ্রন্থনা), পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ-উত্তর মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ.৬।

৯। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৬-৭ ।

১০। Ain-i-Akbari of Abul Fazl-i-Allami, Vol-II, Translated into English by Colonel H.S.Jarret, Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1949, P.156

১১। তারাপদ সাঁতরা, পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ-উত্তর মেদিনীপুর, প্রাগুক্ত, পৃ.৬

১২। Sabba Rao, 'The History of the Eastern Ganges of Kalinga', Journal of the Historical Research Society, Vol.4, Parts 3-4, January-April, 1986

১৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (সংক্ষেপিত সংস্করণ), কলিকাতা,১৩৭৩, পৃ.৬৯

১৪। "মেদিনীপুরেতে পাতসাহ সুবাস্থানে,
কড়কড়ি দ্রব্য লঞা করিল দর্শনে।"
রসিক মঙ্গল, পূর্ব বিভাগ, ১০ম লহরী (প্রণব রায়ের মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ থেকে সংগৃহীত। পৃ.১০)

দুই

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ১১৮-১৯

২। B. N. Mukherjee and P. K. D. Lee, Technique of Indian Coinage, Calcutta, 1988, P. 73

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (সম্পাঃ), পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় রচনাবলী, ১৩৫৭, পৃঃ ৬-১৪

৪। নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬০

৫। সুশীল আঢ্য, 'শুশুনিয়া থেকে তাম্রলিপ্ত', প্রবন্ধ সংকলন ঃ প্রসঙ্গ তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর, ১৯৯৩, পৃ ১৯২-৯৩

৬। প্রবোধ কুমার ভৌমিক, মেদিনীপুর কাহিনী, মেদিনীপুর, ১৯৮৬, পৃঃ ২১

৭। B. N. Mukherjee, Kharoshthi and Kharoshthi - Brahmi Inscriptions in West Bengal (India), Calcutta, 1990

৮। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'প্রাচীন তাম্রলিপ্ত ও সামুদ্রিক বাণিজ্য', প্রবন্ধ সংকলন ঃ প্রসঙ্গ তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর, ১৯৯৩, পৃঃ ১৭

৯। ভারতী, ষষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৩১৫

১০। প্রনব রায়, মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১১৪

১১। B. N. Mukherjee, Economic Factors in Kushan History, Calcutta, 1970, PP. 47-48

১২। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০

১৪। বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বাণিজ্যক প্রেক্ষাপটে সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত', প্রবন্ধ সংকলনঃ প্রসঙ্গ তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর, ১৯৯৩, পৃঃ ৯২-৯৩

১৫। প্রণব রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩

১৬। A. L. Basham, The Wonder That Was India, India Ed. 1963, P. 223

১৭। S. K. Maity, Economic Life of Northern India in the Gupta Period, Calcutta, 1957, P. 130

১৮। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০

১৯। Trailokya Nath Rakshit, A Short History of Tamluk, Midnapore, 1972, P. 68

২০। ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য্য 'প্রাচীন বঙ্গ-লেখ ও লিপি', প্রবন্ধ সংকলন ঃ প্রসঙ্গ তাম্রলিপ্ত,

মেদিনীপুর, ১৯৯৩, পৃঃ ৪০

২১। Puspa Niyogi. Contributions to The Economic History of Northern India. Calcutta. 1962. P. 148

২২। প্রবোধ কুমার ভৌমিক. প্রাগুক্ত. পৃঃ ২৯

২৩। নীহাররঞ্জন রায়. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫

২৪। B. N. Mukherjee. 'Coins of Pre-Gupta Bengal". Studies in Achaeology. Papers prasented in the memory of P. C. Das Gupta. Edited by Asoke Dutta. New Delhi. 1991. P. 299

২৫। B. N. Mukherjee. "Trade Coinage and Media of Exchange in Pre-gupta Banga," Coinage. Trade and Economy. A. K . Jha (Ed). Nasik. 1991. P. 46

২৬। শ্রীসুহৃদ কুমার ভৌমিক, 'বন্দর হিসাবে তাম্রলিপ্তের অবস্থান, প্রবন্ধ-সংকলন ঃ প্রসঙ্গ তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর. ১৯৯৩. পৃঃ ৮২

২৭। বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়. প্রাগুক্ত. পৃঃ ৯২-৯৩

২৮। সুশীল আঢ্য, প্রাগুক্ত. পৃঃ ১০৬

২৯। দুর্গাদাস লাহিড়ী. ভারতবর্ষ (২য় সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড), হাওড়া. ১৩২১. পৃঃ ৭৬, ৭৯

৩০। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়. প্রাগুক্ত. পৃঃ ২১

৩১। Indian Museum Bulletin. Vol XVII. 1982. PP. 73-74. 77-78

৩২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা. ১৩৫৫, পৃঃ ১

৩৩। J. A. A. Campos. History of the Portuguese in Bengal. (Date not available) P 97.

৩৪। মহেন্দ্রনাথ করণ, হিজলীর মসনদ-ই-আলা, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা. ১৯৫৮, পৃঃ ১১৩

৩৫। Bengal : Past and Present. 1910. Part - II. PP. 281-282

৩৬। L. S. S. O'Malley. Bengal District Gazetteers Midnapore. Calcutta. 1911. P 40

৩৭। Ibid. P. 184

৩৮। Bengal : Past and Present. 1916. Vol - XIII. P. 48

৩৯। L. S. S. O'Malley. P. 184

৪০। J. A. A. Campos, P. 95

৪১। ibid

৪২। মহেন্দ্রনাথ করণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮
৪৩। J. A. A. Campos, PP. 118-119
৪৪। L. S. S. O'Malley, P. 55
৪৫। Ibid, P. 46
৪৬। কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত, দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস (মধ্যযুগ), কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১০৯
৪৭। Census 1961, West Bengal, Midnapore, Vol. - I, Calcutta, 1966, P. 122
৪৮। Ibid
৪৯। অমূল্যরতন ভৌমিক, 'ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ কেন্দ্র, বন্দর-নগর খেজুরী,' আঞ্চলিক ইতিহাস ও গণআন্দোলন, প্রবোধ কুমার ভৌমিক (সম্পাঃ) মেদিনীপুর, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৬
৫০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১
৫১। খেজুরী বন্দর, মহেন্দ্রনাথ করণ, পৃঃ ১৬
৫২। W. W. Hunter, a Statistical Account of Bengal, Delhi, 1973, PP. 152-153

তিন

১। প্রণব রায়, মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ, কলিকাতা, ১৯৮৬ পৃ.২৫৮
২। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ.১৫৭
৩। Orissa Historical Research Journal, vol-XI (No-4), PP.206-'29 ff
৪। The Journal of the Asiatic Society, Vol- XXXIX (No-1), P.72
৫। Ibid, P.73
৬। JASB (Letters), Vol-XI,PP.3-8 ff
৭। বিনোদশঙ্কর দাশ (সম্পাঃ), মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ.১০০
৮। Epigraphia Indica, Vol.XXIX,PP.210 ff
৯। The Journal of the Asiatic Society, Vol-XXXIX (No-1) P.75
১০। Archaeological Survey of Mayurbhanj, Vol-1,PP.XXXVI-XXXVII.
১১। Ibid. PP.72-73

১২। Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol XL. Part-I. PP.161-167

১৩। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, "পশ্চিমবঙ্গ দর্শন", মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ২২৮

১৪। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ.১২১

১৫। Epigraphia Indica, Vol. XXXVI. PP-307-312

১৬। Orissa Historical Research Journal. Vol.XXXII (Nos 1+2). PP. 43-57 + plate.

১৭। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৮২-৮৩

১৮। Epigraphia Indica. Vol IX. PP.1 ff

১৯। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৮৯

২০। Census 1961. West Bengal. Vol-1. P.114

২১। S.K.Saraswati. Architecture of Bengal. Book-1. 1976. PP.72-73

২২। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩ পৃ.৪২৮

২৩। প্রণব রায়, মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ.২৫৯

২৪। তারাপদ সাঁতরা, মেদিনীপুর সংস্কৃতি ও মানব সমাজ, হাওড়া, ১৯৮৭, পৃ.২৯

২৫। হরিসাধন দাস, মেদিনীপুর সম্পদ, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ.২১০-২১১

২৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ.৮০

২৭। তারাপদ সাঁতরা, মেদিনীপুর সংস্কৃতি ও মানব সমাজ, হাওড়া, ১৯৮৭, পৃ.৩৯

২৮। হরিসাধন দাস, মেদিনীপুর সম্পদ, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ.৮৪

চার

১। Hunter, W.W, A Statistical Account of Bengal, Vol-III. London.1876, First Reprinted in India 1973, P18

২। Chakrabatti Bahadur, RaiMonmohan, A Summary of the changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916. Calcutta.1999 P.39

৩। Ibid, PP.39-40

৪। Census of India 1941, West Bengal. Midnapore. P.XV

৫।

রাজ্য/ ইউনিয়ন শাসিত রাজ্য	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গ কিমি)
ক) হিমাচল প্রদেশ	৪২,৩৭,৫৬৯	৫৫,৬৭৩
খ) মেঘালয়	১৩,২৭,৮৭৪	২২,৪৮৯
গ) মনিপুর	১৪,৩৩,৬৯১	২২,৩৫৬
ঘ) নাগাল্যান্ড	৭,৭৩,২৮১	১৬,৫২৭
ঙ) ত্রিপুরা	২০,৬০,১৮৯	১০,৪৭৭
চ) সিকিম	[illegible]	৭,৯৯
ছ) মিজোরাম	৪,৮৭,৭৫৮	২১,০৮৭
জ) অরুনাচল প্রদেশ	৬,২৮,০৫০	৮৩,৫৭৮
ঝ) গোয়া	১০,৮১,১৭৭	৩,৮১৩

৬। Census of India, 1961, West Bengal. Midnapore, Vol-1.P.8

৭। Public-A, November 1911, Nos 292-293

৮। Ibid

৯। বসন্তকুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৭৫।

১০। Political Department, Political Branch, File 4J/5, 12 Progs No.22,1917

১১। Ibid

১২। বসন্তকুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৭৪।

১৩। চিত্তরঞ্জন দাস, মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস, মেদিনীপুর, ১৯৬৯, পৃ.৩১

১৪। Home Department, Political Branch, F.No. 4J-12, Progs B.99 April 1919

১৫। Home Department, Political Branch, F.No. 4J-18, Progs B.619 May 1919

১৬। Home Department, Political Branch, F.No. 4J-7, Serial No. 1-2

১৭। Political Department, Political Branch, F.No. 4J/5 (16), Progs No.6,1917

১৮। Letter from Secretary of State for India to the Governor General of India in Council, Letter No. 64 Public, dated London, the 23rd August. 1918

১৯। Political Department, Political Branch, F.No. 4J/5 12, Progs No.22,1917

২০। Proceedings of the Government of Bengal in the Political Department (Political) for the month of December. 1921

২১। Census of India, 1921, Vol-V, Part-I. Bengal. P.118

২২। Census 1961, West Bengal, Midnapore. Vol-1, P.31

২৩। The Amrita Bazar Patrika. April 3, 1920

২৪। Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908, New Delhi, 1977, P.223

২৫। Gouripada Chatterjee, Midnapore the Forerunner of India's Freedom Struggle, Delhi, 1986, P.6

২৬। Dr. Niranjan Ghosh, Role of Women in the Freedom Movement in Bengal (1919-1947), Midnapore, 1988, P.24

২৭। The Amrita Bazar Patrika, April 3, 1920

২৮। Narendra Nath Das, History of Midnapore, Part -II, Calcutta, 1962, P. 91

২৯। বিনোদশঙ্কর দাশ (সম্পাঃ), মেদিনীপুর- ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ.২২৫

৩০। The Amrita Bazar Patrika, April 3, 1920

৩১। বিনোদশঙ্কর দাশ (সম্পাঃ), মেদিনীপুর- ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ.২২১

৩২। Census of India, 1921, Vol-V, Part-I, P.118

পাঁচ

১। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, মেদিনীপুর, কলিকাতা ১৯৭৯, পৃ.১৯০

২। W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal Vol. III. London,1876, P.5

৩। Judicial Department (Criminal) Proceedings. Letter to the Board of Revenue By Mr. Mihat, District Collector, Midnapore, 6th April, 1799

৪। Ibid

৫। বিনোদশঙ্কর দাশ (সম্পাঃ), মেদিনীপুর- ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৭০

৬। Jagadish Chandra Jha, The Bhumij Revolt, (1832-33), Delhi, 1967, P.19

৭। হরিসাধন দাস, মেদিনীপুর সম্পদ, মেদিনীপুর, ১৯৩৫, পৃ.২০৪

৮। Letter to Mr. Dowdeswell. Acting Collector of Midnapore from the Rev. Board dated the 29th Jan. 1794

৯। Letter to John Piearee, Collector of Midnapore from the Governor General. Dated Calcutta 22nd July.1782

১০। Letter From the Collector Dated the 14th & 19th January.1971 Cited in the History of Midnapore Vol I By Narendra Nath Das. P.167

১১। Letter to Collector General James Alexander from Vansittart. Midnapore. 10th April. 1769.

১২। Letter to Lieut. Nun from Vansittart. Dated Midnapore. 31thMarch. 1770.

১৩। Letter to Mr. Dowdeswell. Acting Collector of Midnapore from the Rev. Board dated the 29th Jan. 179·

১৪। বিনোদ শংকর দাশ, জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুরের গণবিক্ষোভ, মেদিনীপুর, ১৯৬৮, পৃঃ ৩৪

১৫। Notes left by Mr.Henry Strachey. Judge of Midnapore in 1802.

১৬। প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়,কর্ণগড়ের কথা - সা· · ক.ব্য. কলিকাতা (?), পৃ.১০

১৭। J C.Price. The Chuar Rebellion of 1799 cited in Changing Profile of the Frontier Bengal By Binodsankar Das. Delhi. 1984. P. 264

১৮। বিনোদ শংকর দাশ, জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুরে গণ বিক্ষোভ, মেদিনীপুর. ১৯৬৮,পৃ.৩৪

১৯। প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, কর্ণগড়ের কথা-- সাধনা ও কাব্য, কলিকাতা, (?) পৃ.৮

২০। Narendranath Das. History of Midnapore. Vol.I Midnapore. 1956. P. 208

২১। Binodsankar Das. Changing Profile of the Frontier Bengal. Delhi. 1984. P.231

২২। প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, কর্ণগড়ের কথা- সাধনা ও কাব্য. কলিকাতা,(?), পৃ.১১

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ.১১

২৪। Narendranath Das. History of Midnapore. Vol.I PP 211-212

২৫। Judicial Department (Criminal) Proceedings, Vol. 50, Report to adjutant General Scott By S. Watson. Commanding Officer.Midnapore. 7th April. 1799

২৬। Judicial Department (Criminal) Proceedings Vol. 50. Report of Rovert Grenarge. Magistrate.Midnapore, 5th April. 1799

২৭। L-S.S. O' Malley, Bengal District Gazetteers.Midnapore. Calcutta. 1911, P. 42

২৮। Narendranath Das, History of Midnapore, Vol. I P. 214
২৯। Letter to Colonel Dun From Collector, Midnapore. Dated Midnapore 21st March, 1799

ছয়

১। Final Report on the Survey and Settlement Operation in the district of Midnapore (1911-1917).P.39
২। রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাঃ), বাংলা দেশের ইতিহাস,২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৫ পৃ.১১৭
৩। কল্যানী কার্লেকর, ভারতের শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড, বৃটিশযুগ, কলিকাতা, ১৯৬১ পৃ.৪৭
৪। হরিপদ মণ্ডল, মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ইতিকথা (১৮৩৪-১৯৮৪), কলিকাতা, সন, পৃ.১-২
৫। W.W.Hunter, A Statistical Account of Bengal, Delhi, 1973, P.175
৬। নিতাই চরণ দে, চয়নিকা, মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মারক সংখ্যা, ৩রা জানুয়ারী,১৯৮৩, পৃ.১৪-১৫
৭। প্রাগুক্ত
৮। Hunter, A Statistical Account Of Bengal, op. cit P.178
৯। নিতাই চরণ দে, চয়নিকা, প্রাগুক্ত পৃ.১৫
১০। তথ্যদাতা - শ্রী মাখনলাল রায়, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। মহিষাদল রাজস্কুল। ১১/৯/৯৮
১১। বঙ্কিম ব্রহ্মচারী, মহিষাদল ও রাজকাহিনী, মেদিনীপুর, ১৯৯১, পৃ.৪৮
১২। প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫-৬৬
১৩। Hunter, A Statistical Account Of Bengal, op. cit P.178
১৪। উমাচরণ অধিকারী প্রণীত তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সম্পাদনাঃ- প্রশান্তকুমার মন্ডল ও কমলকুমার কুন্ডু, মেদিনীপুর, ১৯৯৫ পৃ.৩০-৩১
১৫। প্রাগুক্ত, পৃ.৩০-৩৫
১৬। Hunter, A Statistical Account Of Bengal, op. cit P.178
১৭। Ibid
১৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার, আধুনিক যুগ, ৩য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬ পৃ.১২৫
১৯। Pradip Sinha, Nineteenth Century Bengal-Aspects of Social History, Calcutta, 1965, P.45
২০। A Retrospect on One Hundred Years of Contai High School (An

Address Delivered on the 20th March, 1957 on the Occassion of the Centenary Celebration of Contai High School)

২১। (অতীতের পৃষ্ঠা থেকে, বানেশ্বর জানা) কাঁথি হাই স্কুলের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা।

২২। Biharilal Chakraborty, The Builders of Our School, ষটত্রিংশ বর্ষ সংখ্যা, ১৩৯০, গড়বেতা হাইস্কুল পত্রিকা, পৃ. ৬২-৬৩

২৩। স্মরণিকা, মিশন বালিকা বিদ্যালয়, মেদিনীপুর, ১৯৯২-'৯৩

২৪। Hunter, Statistical Account of Bengal, op.cit. P.179

২৫। Ibid, P.181

২৬। Ibid, P.182

২৭। কল্যানী কার্লেকর, ভারতের শিক্ষা, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯

২৯। Hunter, Statistical Account of Bengal, op.cit. P.181

৩০। Ibid, P.182

৩১। কল্যানী কার্লেকর, ভারতের শিক্ষা, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬-৭৭

৩২। Hunter, Statistical Account of Bengal, op.cit. P.185

৩৩। Rajat Sanyal, Voluntary Associations and the Urban Public Life in Bengal (1815-1876), An Aspect of Social History, Calcutta, 1980, P.206

৩৪। ভারতবর্ষ, ১৩৩৮, পৃ.৯৯২

৩৫। Education Department Consultation, 24th January 1856, No 82: Education Department consultation, 13 March 1856, No-79

৩৬। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ "সার্কেল-সিস্টেম" প্রবর্তিত হয়। এতে তিন চারটি গ্রাম নিয়ে একেকটি "সার্কেল" (Circle) করে তার পরিদর্শনের জন্য সরকারি পন্ডিত নিযুক্ত করা হত। শিক্ষাধীন ছাত্রেরা কিছুদূর অগ্রসর হলে অগ্রগতির মান অনুযায়ী পুরষ্কৃত হত। আর গুরুকে তাদের সকলের পুরষ্কারের সমান বেতন দেওয়া হত। সরকার শিক্ষক ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দ্বারা গ্রামবৃদ্ধদের উদ্যোগিতা বাড়াবার চেষ্টা করতেন।

৩৭। Proceedings of the Lieutenant Governor of Bengal, Education Department, September 1862 No-73

৩৮। ইন্দ্র মিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ২৪২-২৪৩

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

৪০। শতবর্ষ স্মরণিকা, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় (১৮৯০-১৯৯০), পৃ. ৩-৪

৪১। Appendices to General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1858-59, ii P. 84-85

৪২। শতবর্ষ স্মরণিকা, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় (১৮৯০-১৯৯০), পৃ.৭-১১

৪৩। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal for 1860-71. Source- Unpublished Letters of Vidyasagar. Ed. A.Guha. Calcutta. 1971. P55

৪৪। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৬-১৭

৪৫। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাংলার সরকার কর্তৃক 'এ-কোর্স', 'বি-কোর্স' ও 'সি-কোর্স' এই তিন ধারার পরিকল্পনা করা হয়। 'এ-কোর্স' ছিল সাধারণ তাত্ত্বিক পরীক্ষার অর্থাৎ প্রচলিত এন্ট্রান্স পরীক্ষার পড়া, 'বি-কোর্স' যারা ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্প শিক্ষার বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের সেই শিক্ষার গোড়া পত্তন হত এবং 'বি-কোর্স' বিষয়গুলি যারা পড়তো তাদের উক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কম সময়ও লাগতো। 'সি-কোর্স' ছিল বাণিজ্যিক বা কমার্সের শিক্ষা, এতে অংক, 'আধুনিক' ইংরাজী, ইতিহাস,ভূগোল, বাণিজ্যিক ভূগোল, অংকন ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা পড়ানো হতো। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত এন্ট্রান্স পরীক্ষার কাঠামোর মধ্যেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল।

৪৬। L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, Midnapore. Calcutta. 1911. P.162

৪৭। Technical and Industrial Instruction in Bengal. 1908. P16. Quoted in L.S.S.O' Malley's Bengal District Gazetteers, Midnapore, op.cit

৪৮। Centinary Commemoration Volume, 1973, Midnapore College, P.29

৪৯। Ibid, P.4

৫০। Calcutta University Calender, 1889, P.260

৫১। শ্রী হরিপদ মন্ডল,মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ইতিকথা (১৮৩৪-১৯৮৪), কলিকাতা, পৃ. ৩৪

৫২। প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬-৪৭

৫৩। Centinary Commemoration Volume, 1973, Midnapore College, P4

৫৪। শ্রী হরিপদ মন্ডল,মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২

৫৫। Graduates of Calcutta University from 1858 to 1881 with their degrees and occupation. The list does not include doctors without arts degree, and licentiates in law, who were also a substantial element in the educated society of the time. Pradip Sinha, Nineteenth Cen-

tury Bengal, op.cit. PP.160-199

সাত

১। L.S.S.O'Malley, Bengal District Gazettees, Midnapore. Calcutta, 1911, P.130
২। Panchanan Saha, History of the Working Class Movement in Bengal, New Delhi. 1978 P.74
৩। Proceedings of the Hon'ble Government of Bengal for the month of May, 1906 P.77
৪। Midnapore District Census Report 1951 P.xxviii
৫। R.R. Bhandari, The Blue Chip Railway, Calcutta, 1987, P.23-24
৬। বেহুলা, নববর্ষ সংকলন, খড়গপুর,১৩৯৬
৭। Saha, Working Class Movement in Bengal, P.74
৮। The Bangalee, 12 August, 1906
৯। Ibid
১০। Amritabazar Patrika, 7 September, 1906
১১। Ibid, 5 September, 1906
১২। Ibid, 7 September, 1906
১৩। Home Public. Progs A, December 1906 n.75
১৪। A.B.P., 7 September, 1906
১৫। Home Public. Progs A, December 1906 n.75
১৬। A.B.P., 7 September, 1906
১৭। Ibid
১৮। Ibid
১৯। Home Public. Progs A, December 1906 n.75
২০। A.B.P., 7 September, 1906
২১। Ibid
২২। Telegram From the Chief Secretary to the Govt. of Bengal to the Secretary to the Govt.of India. Home Department dated the 5th September, 1906
২৩। Home Department Public-A Progs n.70-75
২৪। Ibid
২৫। A.B.P., 8 September, 1906
২৬। Home Public. Progs A, December 1906 n.75
২৭। Ibid
২৮। A.B.P., 7 September, 1906

২৯। Ibid
৩০। Ibid,5 September, 1906
৩১। Simla Records-1. 1906, Government of India. Home Department, Public-A. Progs, December 1906,n 70-75

আট

১। পান্নালাল ব্যানার্জী, 'মেদিনীপুরের অগ্নিযুগে টাউন স্কুল', মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব স্মারক সংখ্যা, ৩ রা জানুয়ারী, ১৯৮৩, পৃ.৩৮
২। কিরণ চৌধুরী, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কথা, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ.২৬৪
৩। বসন্ত কুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খন্ড, মেদিনীপুর, ১৯৮০, পৃ.৯২
৪। প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪
৫। কিরণ চৌধুরী, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কথা, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬৬
৬। সুকুমার মিত্র, ''শ্রী অরবিন্দ আকরোড ঘোষ,'' মাসিক বসুমতি,১৩৫৮ (ব.শ)
৭। সুকুমার সেনগুপ্ত, 'মেদিনীপুর জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা', স্মরনিকা,মেদিনীপুর জেলা রজত জয়ন্তী সম্মেলন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ৬-৮ ফেব্রুয়ারী,'৯৩
৮। সুধাংশু শেখর ভূঞ্যা কর্তৃক প্রণীত ও অমূল্যরতন ভৌমিক কর্তৃক সম্পাদিত স্বাধীনতা সংগ্রামে নন্দীগ্রাম। মেদিনীপুর, ১৯৯১, পৃ.২১৪
৯। সুকুমার সেনগুপ্ত, 'মেদিনীপুর জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা', প্রাগুক্ত
১০। বসন্ত কুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৩-'২৪
১১। প্রাগুক্ত
১২। মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব স্মারক সংখ্যা, ৩ রা জানুয়ারী, ১৯৮৩, পৃ. ৪৯
১৩। বসন্ত কুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৫-'২৬
১৪। মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব স্মারক সংখ্যা, ৩ রা জানুয়ারী, ১৯৮৩, পৃ. ৪৯
১৫। রঞ্জিৎ কুমার রায়, 'স্বদেশী থেকে আইন অমান্য ঃ রাজের বিরূদ্ধে বাংলার ছাত্র সমাজের সংগঠিত বিক্ষোভ, ' বরুন দে (সম্পা),মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২৫
১৬। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 'আমি কমিউনিষ্ট হলাম', কমিউনিস্ট হলাম, মেদিনীপুর, ১৯৭৬,

পৃ.৭৯
১৭। প্রাগুক্ত, পৃ.৮০
১৮। সুকুমার সেনগুপ্ত, 'মেদিনীপুর জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা', প্রাগুক্ত
১৯। মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব স্মারক সংখ্যা, ৩ রা জানুয়ারী, ১৯৮৩, পৃ. ৪০
২০। Midnapore College Centinary Commemoration Volume, 1973, PP-46-47
২১। অনিল ভঞ্জ, 'না জেনেই যে পথে পা বাড়িয়ে ছিলাম আজ বিশ্বাস নিয়ে সেই পথে চলেছি,' কমিউনিস্ট হলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০
২২। মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব স্মারক সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০
২৩। সুকুমার সেনগুপ্ত. 'মেদিনীপুর জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা', প্রাগুক্ত
২৪। প্রাগুক্ত
২৫। অনন্ত মাজী, 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্রোতধারা থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে এলাম।' কমিউনিস্ট হলাম.প্রাগুক্ত, পৃ.১৬
২৬। সুকুমার সেনগুপ্ত, 'মেদিনীপুর জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার কথা', প্রাগুক্ত
২৭। অনন্ত মাজী. 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্রোতধারা থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে এলাম।' প্রাগুক্ত , পৃ.১৬
২৮। অনিল ভঞ্জ, 'না জেনেই যে পথে পা বাড়িয়ে ছিলাম আজ বিশ্বাস নিয়ে সেই পথে চলেছি,' প্রাগুক্ত, পৃ.২৪
২৯। তনিকা সরকার,বেঙ্গল ১৯২৮-৩৪, দিল্লী, ১৯৪৯, পৃ.-১৪
৩০। বরুন দে (সম্পাঃ), মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ, প্রাগুক্ত, ভূমিকা-চ
৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্র সমাজ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ.৫৮-৫৯
৩২। সরোজ মুখার্জী, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ.২৭১-'৭৬
৩৩। সুস্নাত দাশ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ ঃ- একটি সামগ্রিক রূপরেখা।' মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪
৩৪। কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা'। একসাথে। শ্রাবনী, ১৩৯৪, পৃ.১৩
৩৫। সুস্নাত দাশ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ ঃ- একটি সামগ্রিক রূপরেখা।' প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯

নয়

১. ৪৯ পটল, মৎস্যসূক্ত তন্ত্র। ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিকের 'আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা' গ্রন্থে (মেদিনীপুর, ১৯৯১), ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

২. Descriptive Ethnology of Bengal, Edward Tuite Dalton Calcutta, 1872. P. 235.

৩. The People of India, Sir Herbert Risley, Edited by W. Crooke, Second Edition, Delhi, 1969 P. 76.

৪. (Description of) *Plate xxxv.* Sir Herbert H. Risley, op.cit.

৫. 'নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মণ নাড়িয়া।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ।।'
চর্য্যাপদের ১০ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

৬. 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই।।
কাহ্নে গাই তু কাম চণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চিছনালী।'
চর্য্যাপদ ১৮ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

৭. Hand Book on Scheduled Castes And Scheduled Tribes of West Bengal, Amal Kumar Das, Bidyut Kumar Roy Chowdhury and Manis Kumar Raha (Special Series No-8.) Bulletin of the Cultural Research Institute. Tribal Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, 1966.P.32.

৮. তথ্যদাতা—পরেশ ধাড়া , গ্রাম- গোপকালী, ৩নং অঞ্চল, ডেবরা থানা, জেলা- মেদিনীপুর, তারিখ- ৪/১/৯৯.

৯. 'তান্তি বিকনঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া।।'
চর্য্যাপদের ১০ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।

১০. Hand Book on Scheduled Castes And Scheduled Tribes of West Bengal, op cit, P. 31.

১১. The Tribes And Castes of Bengal, Vol. I, H. H. Risley, Calcutta, 1981 P.250.

১২.Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal, op cit, P.31.

১৩.The Tribes and Castes of Bengal, Vol.I, opcit, P.250.

১৪.আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা, ডাঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, মেদিনীপুর, ১৯৯১, পৃঃ-৩৪.

১৫.Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal, op. cit, P. 51.

১৬.Descriptive Ethnology of Bengal, E. T. Dalton, op. cit, P.314.

১৭.'হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহারি নাবেঁ।।'
<u>*চর্যাপদের ১০ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।*</u>

১৮.'গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ নীলে পার করেই।।
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপসাত্র জাইব পুনু জিনউরা।।

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।

....
<u>*চর্যাপদের ১৪ সংখ্যক পদের অংশ বিশেষ।*</u>

১৯. তথ্যদাতা—নিমাই মণ্ডল, ইন্দা, খড়্গাপুর।

২০. শরৎসাহিত্য সমগ্র—১, সম্পাদক, সুকুমার সেন, কলিকাতা, ১৪০০ (২য় মুদ্রণ), পৃঃ-৪০৪-৪০৫।

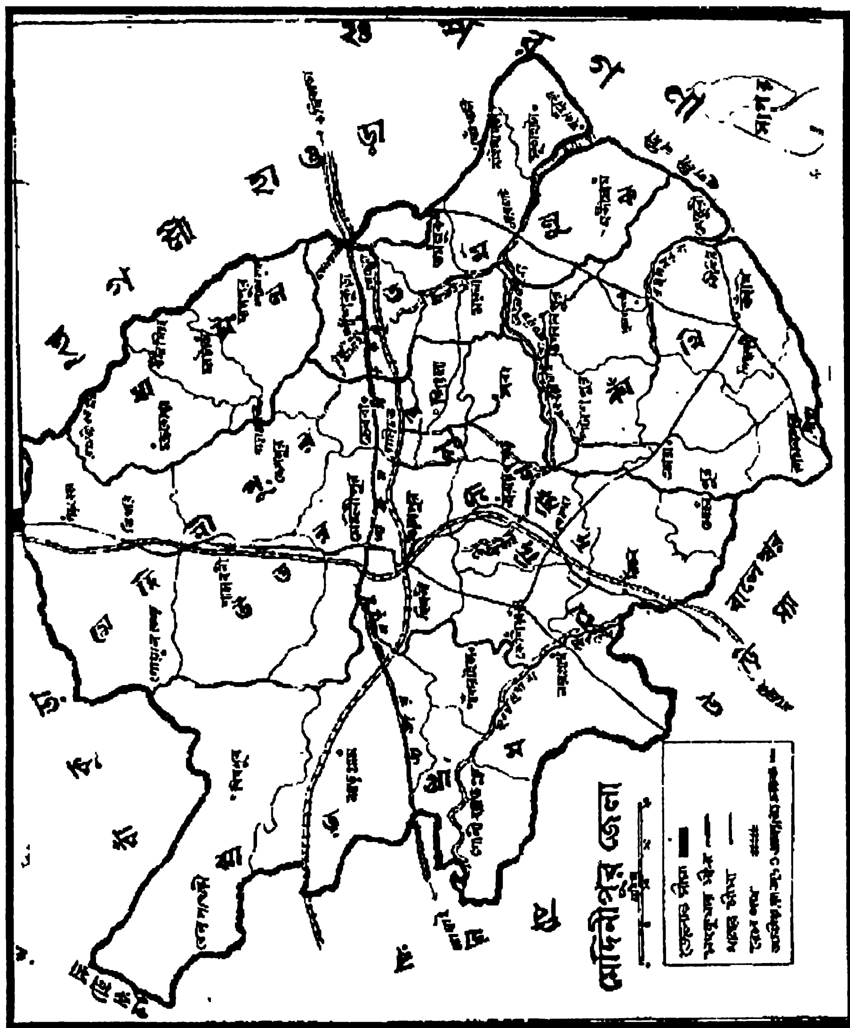
২১. তথ্যদাতা—দুঃখুরাম বৈঠ্যা (মোড়ল), গ্রাঃ-কৃষ্ণনগর, থানা- খড়্গাপুর (গ্রাঃ), মেদিনীপুর।

২২. তথ্যদাতা— সদানন্দ ঘোড়াই, গ্রাম ধোবাশোল, থানা-সাঁকরাইল, মেদিনীপুর।

২৩. তথ্যদাতা—বিশ্বজিৎ রানা, কমলাপুরিয়া, নয়াগ্রাম, মেদিনীপুর।

২৪. The People of India, Sir Herbert Risley, op. cit, PP. 120-121.

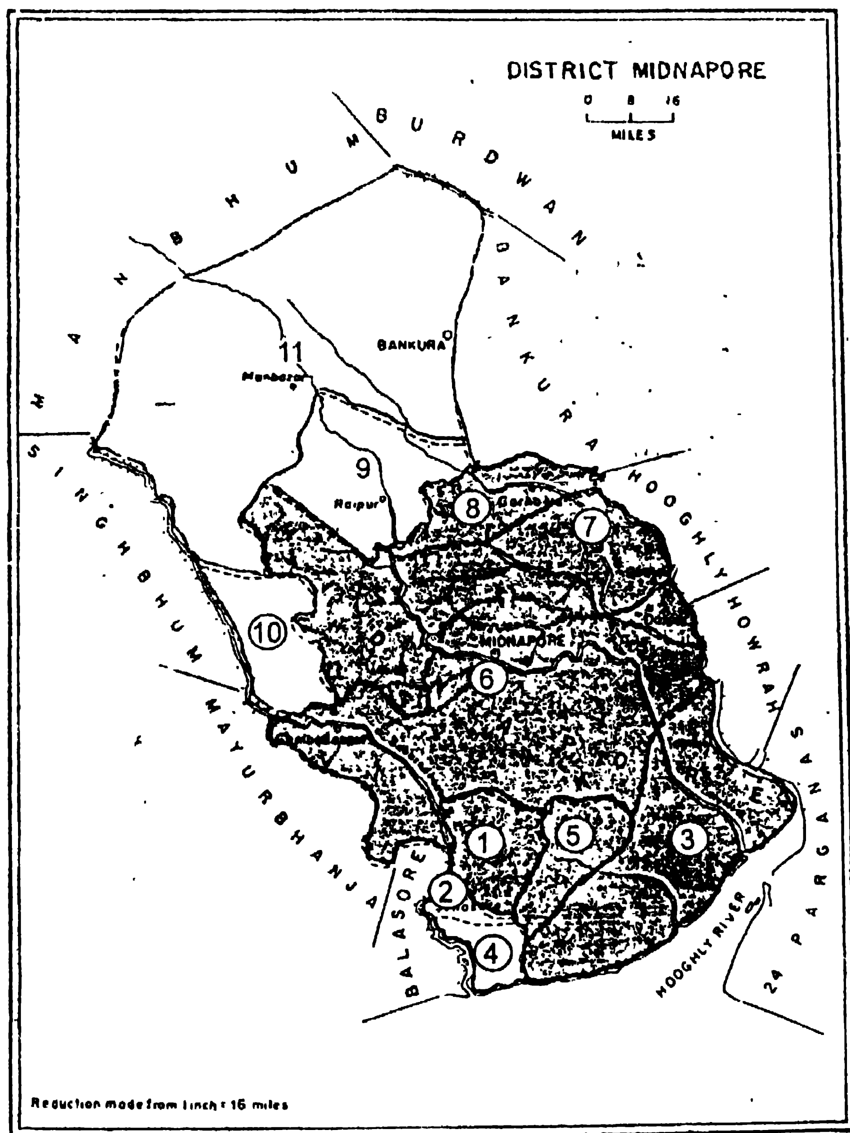
২৫. Ibid, Description of Plate <u>xxxv.</u>


মেদিনীপুর জেলা

মানচিত্র 'ক'


CHANGES IN BURDWAN, HOOGHLY, HOWRAH, & BANKURA DISTRICTS.
16 8 0 16
MILES
MURSHIDABAD
Asansol
Raniganj
Bankura
Vishnupur
Raipur
Burdwan
Jamalpur
Pandua
Chinsura
Chandernagore
Serampore
Bally
Ghatal
Uluberia
Contai
Ramnagar
HOOGHLY RIVER
24 PARGANAS

মানচিত্র খ


DISTRICT MIDNAPORE
0 8 16
MILES
BURDWAN
MANBHUM
BANKURA
BANKURA
HOOGHLY
HOWRAH
SINGHBHUM
MAYURBHANJA
BALASORE
24 PARGANAS
HOOGHLY RIVER
MIDNAPORE
11
9
Raipur
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Reduction made from 1inch = 16 miles

পরিশিষ্ট

(ক)

PROPOSED DIVISION OF THE DISTRICT OF MIDNAPORE INTO TWO DISTRICTS

NOS. 292-293

Secy wants a precis put up with papers showing precisely how the matter stands .....

In July 1907 the Government of India declined to sanction the proposed partition of this dirstrict and left it to the Government of Bengal " to make the best arragement possible under the existing conditions." There are no further papers in the Public Section.

Pub.A, July1907, nos, 92-93
V. DAWSON
Pub.A, April1907, nos, 117-118

2. In the correspondence regarding the recruitment of the Indian Civil Service provision has been made for an Additional District Magistrate for the Midnapore District. Originally an appointment was sanctioned* for two years but in 1909 the Government of India thought that it was practically certain that an additional officer would always be needed to assist the Collector, if the District is not divided, and they accordingly proposed that an additional superior appointment (a Magistrate Collectorship of the 3rd grade on Rs.1,500) should be provided on this account. The proposal has been sanctioned the appointment has been sanctioned practically as a permanent measure, it will last so long as the local Government are satisfied that its retention is necessary.

Estabts A, Sept.1908, nos, 80-82
Estabts A, July 1909, nos.173-174

Estabts A., March1910 nos,118-119
Estabts A. April 1911 no.51
Estabts A., July 1910, nos. 99-100

A. K., -14-6-11, V. DAWSON,-15-6-11

Midnapore had, in 1906 a population of 2,780,114 inhabitants. Its area is 5,445 square miles. The proposal to split it up into two districts was made by the Govenment of Bengal in 1906. The original proposal to locate the new head-quarters of a second district at Contai was abondoned in favour of locating one at Hijli near Kharagpur. The local people being averse from this latter proposal, the Govenment of India

suggested in the same year that the head-quarters of the new district should for the present be fixed at Midnapore.

2. In reply, the Government of Bengal urged various objections to the proposal made by the Government of India and urged that the proposal to create a fresh district with head-quarters at Hijli might be sanctioned. The Government of India refused on political grounds to allow this, and Sir Harvey Adamson's and Lord Minto's notes of 23rd March 1907 and 4th April 1907, written on a memorial received, show that the very name of partition in any shape was at that time anathema. The expedient of appointing an Additional District Magistrate has accordingly been resorted to.

3.The correspondence on the subject of the partition of the Midnapore District is now stale, and we may ask the Bengal Government what their present views on this subject are. Are they contented with the present arrangement ? And how far have recent proposals as regards the delegation of powers altered the situation ? On receipt of their reply, the matter may be considered further.

A.KARLF-17-6-11

Draft submitted J.L.J (ENKINS),-18-6-11

C.C.S.,-23-6-11.

V. DAWSON,-24-6-11
M.S.D. BUTLER-21-6-11
A. EARLF-25-6-11.

PUBLIC-A. NOVEMBER 1911 NOS. 292-293

(খ)

PROPOSED DIVISION OF THE DISTRICT OF MIDNAPORE INTO TWO DISTRICTS

No. 1511, dated the 27th June1911 No. 292

From– A. EAKLE ESQ. C.I.E. Secretary to the Government of India, Home Department,

To– The Chief Secretary to the Government of Bengal.

I am directed to refer to the correspondence ending with the Home Department letter no. 1665, dated the 10th July 1907, regarding the proposed division of the district of Midnapore into two districts. In that

letter, the Government of India declined, mainly for political reasons, to give their assent to any scheme of partition of the district, and left it to the Government of Bengal to make the best arrangement possible under the then existing conditions. The expedient has since been adopted of appointing an Additional District Magistrate to relieve the District Officer of Midnapore.

2. I am to request that the Government of India may be informed whether, in the opinion of the Lieutenant-Governor in Council, the present arrangements for the administration of the Midnapore district are adequate and suitable, and how far recent proposals as regards the delegation of powers have altered the situation, or wether, on the other hand, the partition of the district is still considered necessary for good administration.

No. 3501-P.D., Dated the 2nd November 1911 No. 293

From– The Hon'ble Mr. C. J. Stevenson-Moore, I. C. S., Chief Secretary to the Government of Bengal,

To– The Secretary to the Government of India, Home Department.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter no. 1514, dated the 27th June 1911, regarding the proposed division of the district of Midnapore into two districts. The Government of India enquire whether the present arrangements for the administration of the Midnapore district are adiquate and suitable, and how far recent proposals as regards delegation of powers have altered the situation, or whether, on the other hand, the parttion of the district is still considered necessary for good administration.

2.The reasons which induced this Government to submit the proposal for partitoning the Midnapore district and the scheme suggested for carrying it into effect were detailed at length in Mr. Carlyle's letter no.1361-T.R., dated the 30th June 1906, and need not be recapitulated. The Government of India considered it inexpedient mainly for political reasons, to proceed with the scheme at that time and accordingly an Additional District Magistrate was appointed to the District with the sanction of the Government of India conveyed in Home Department letter no. 915, dated th 19th September 1908, as this was the only possible alternative means of lightening the strain of overwork from which the

District Officer was suffering. In pursuance of this arrangement the work of the district has been divided between the District Officer and the Additional District Magistrate in the following manner. The latter officer is vested with the control of all the magisterial courts in the district ; he inspects and supervises the work of these courts, including the sub-divisional courts, and hears appeals from the second and third class Magistrates. He deals also with almost the whole work of the Magistrate's side of the office and disposes of all the correspondence, medical sanitation, chaukidari, emigration, etc. He is also the Chairman of the District Board and District Registrar, and is vested with the control of all the Municipalities. The Sadar sub-division is extremely large, covering an area of over 3,000 square miles, and the direct supervision of the courts which deal with the crime of this large area is in itself no light task. The appellate work is heavy as there are at present five officers in the district with second class powers who are actually engaged in criminal work, and five independent benches from all of which courts the appeals lie to the Additional District Magistrate.

3. The District Officer retains the whole of the collectorate work, and on the Magistrate's side, keeps in his own hands all matters connected with the Police and the working of the Arms Act. He has also to deal with all political questions which arise. In nearly all departments the revenue work is considerably heavier than that of an average district, while the Embankment Department gives a great deal of work of a kind not ordinarily met with in Bengal districts and the large and important Government Estates require very close and careful attention. The Lieutenant-Governor in Council believes that even with the assistance of the Additional Magistrate, the District Officer is over worked. But it is not merely for this reason that the present system is to be condemned; there are other and more grave objections. Under the present division of duties the District Officer is cut off entirely from very important branches of administration, such as education and sanitation, which it is desirable should be in the hands of the head of the district. He is deprived of many opportunities of meeting the prominent men of the district whom he may wish to influence, for such opportunities most often arise in connection with the ordinary District Officer's work as Chairman of the District Board and in his supervision of Municipalities. Again, overburdened as the Collector is with revenue and routine work, he is so

much tied to his desk that he cannot easily acquire the knowledge of his district which he ought to possess, nor is he seen and known by the people as he should be. In view of the recent history of this district nothing could be more unfortunate than the lack of close personal contact between the District Officer and the people which at present prevails.

4. The question as to whether a redistribution of the departments between the District Officer and the Additional Magistrate would furnish a satisfactory solution of the difficulty has been carefully considered, and the Lieutenant-Governor in Council is of opinion that while the appointment of an Additional Magistrate may furnish the necessary amount of relief in a district which is somewhat bigger than the normal, it is impossible, for this arrangement to furnish an adequate remedy in a district like Midnapore in which the volume of work is fully twice that of an ordinary district. There are statutory objections to the Collector transferring many of his revenue powers, and consequently in order to secure any sort of relief, he has to make over departments, such as the District Board, which offer special facilities for keeping touch with the more influential people of the district and ascertaining their needs and feelings.

5. The objections which the leading residents of Midnapore advanced against the partition of the district were summarised and discussed in paragraphs 10 and 11 of Mr. Carlyle's letter above mentioned. The Lieutenant- Governor in Council not only adheres to the opinion then expressed, that the objections raised could not be held to outweigh the advantages which would accrue from this much needed administrative reform, but would point out that the subsequent history of the district has robbed the opponents of the partition of one of their strongest arguments for maintaining existing arrangements Thus, the Raja Sati Prasad Garga of Mohisadal in support of his opposition to the proposed reform asserted that "the past history of Midnapore brings to light the fact that it has always been one of the best administered districts in Bengal." A similar line of argument was adopted by others among those consulted. Recent events have proved conclusively the hollowness of this contention and have given unpleasant prominence to the grave necessity which exists for adopting really effective measures in order to lighten the burden of the District Officer.

6. The Lieutenant- Governor in Council is firmly convinced that

the District of Midnapore will never be properly administered as a single district, and would urge upon the Government of India to take into consideration the arrangement for its partition in accordance with the scheme which was outlined in paragraphs of Mr. Carlyle's letter of the 30th June 1906. There will be some reduction in the initial cost which was then estimated at R 7,25,000, as the land has been actually acquired for the necessary buildings at the new head-quarters of Kharaghpur, and an Additional District Magistrate having been permanently added to the cadre, no increase in the Civil Service will be required.

7. The present time is however not opportune for publishing the intentions of Government and actually carrying the scheme into effect. Opponents of the partition would stigmatise it as an act of vengeance or punishment for the recent Midnapore cases; the motives of Government would be misrepresented and the success of the scheme jeopardised. The Lieutenant-Governor in Council would therefore prefer to refrain from moving openly in the matter until a year or two have elasped and the public feeling which was aroused by these cases has had time to settle down. He is strongly of opinion that in the meantime necessary details should be worked out so that the scheme may be ready for adoption at the earliest favourable opportunity and he proposes to undertake this work at once.

Proceedings of the Home Department, November 1911, Pro No-292-293

(গ)

Jone Peiarce Esqr.

Collector of Midnapore.

Sir,

Enclosed We transmit you copies of two petitions presented to us by Chooneylaul Khan and [Annundlal Khan] containing complaining against the Widow of late Zemindar of Midnapore, we request youwill ascertain and reportto us if there be any and what ground for their accusations—We are etc.

Calcutta,
the 27th February 1787.

Wm. Cowper
Thos. Graham,
John Mackenzie.

Exclosure No.1.

JohnStables Esqr.,

Presidt. and the Members of the Board of Reve.

The humble Petition of Chooneylaul Khawn of Midnapore.

Sheweth- That on the death of Ogeet Singh the late Rajah of Midnapore, the management of his Zemindarry devolved on his two widows, Ranny Bhobany and Seeromoney.

That the said widows continued for some time in the possession of the said Zemindary, till one Goverdun Surdar, and Sotoorgun Mohapatter with several Chohars, and other armed men attacked and plundered the Kela, or Fort, called Curnogur where the said two widows resided, and took possession of the said Zemindary.

That the said widows were in consequence obliged to retire from the said Fort, and went to Bowanneypeor, from whence they sent their servants and people to your petitioners uncle Treelochon Khawn who at a considerable expence attacked and routed the said Chohars and replaced the said widows in the possession of their said Zemindary.

That on the deaths of the said widow Bhowany, and your Petitioners said uncle Treelochun, one Jugul Mohapotter, with the assistance of several Chohars and some neighbouring Marattahs, again attacked and plundered the said Fort, and obliged the said surviving widow Seeromoney to retire from the said Kela, and place herself under the protection of Moteyram Khawn, your petitioners cousin, who was the Zeminder of Topah Naurajole.

That the said Mootiram Khawn, (under a promise and agreement of future, and adequate reward) not only protected the said widow, but kept a force for considerable time for the purpose and in the end again routed the said Chohars plunderers, and replaced the said surviving widow in the said Zemindary he the said Moteyram Khawn continuing for several years and till the time of his death to manage the said Zemindary on her account.

That the said Moteyram by his Will, he quitted the management of the said Zemindary, as also that of Topa Naurajole to your petitioners elder brother Seetaram, who immediately took possession of and managed the same for the space of twenty four years or there about.

That in the Bengal Year 1185, the said Jogal Mohapatter again attacked and plundered the said Fort, and took possession of the said Zemindary

and the said surviving widow accompanied and remained with your petitioners said brother Seetaram. In Degungo for the space of three years, when the said Seteram at great charge and expence. again recovered the possession the Said Fort and Zemindary and the said widow in return for such service. confirned the said Setaram by a Sunnud. in the care and management of the said Zemindary.

That in the Bengal Year 1189 the said surviving widow together with your petitioners said brother Setaram. made application to your Board. to bestow on your Petitioner the care and management of the said Zemindary when your Board was pleased to accede thereto. and granted a Perwannah to your Petitioner accordingly.

That your Petitioner managed the said Zemindary from that time till the Bengal Year 1191 when Setaram your Petitioners said brother died.

That the said widow. from such last mentioned period. incurring great expences. and thereby creating much difficulty. and confusion. in the discharge of the Malgoozary your Petitioner applied to. and obtained from your Board. a Purwannaw for the management of the said Zemindary and to prevent all further expenditure. till the said Malgoozary was fully discharged as also the interference of any of the people or servantsof the said surviving widow respecting the collection thereof.

That your Petitioner also obtained another Purwannaw from the Dewanny Adawlut of Midnapore, to the same purport and effect.

That notwithstanding such Purwannahs so issued from your Board and the said Dewanny Adawlut. the said surviving widow with her servants and dependants. with hold from your Petitioner the care and managementof the said Zemindary. entirely forgetting unmindful of the charges and expences. your Petitioner and his family incurred. and the losses they sustained in keeping and maintaining forces sufficient to recover the Zemindary for, and maintain and defend the said Deceased and surviving widow. in the quiet and peaceable possession of the same.

Prayer :

Your Petitioner therefore most humbly prays that the Purwannah already issued from your Board. in favor of your Petitioner may be inforced or that your Board will issue such further Order thereon as may operate to secure and confirm your petitioner. in the management and collection of the said Zemindary.

And your Petr. shall ever pray &ca.

Enclouser No.2.
John Stables Esqr.,
President and the Members of the Board of Revenue.
The Humble Petition of Anund Laul Khawn of Topa Naurajole.
Sheweth– That Rogoonautpoor balarampoor and other Villages in the District of Midnapore, and Dica Bazer, were held in farm by your petitioner, for the space of Twenty five years or there about, and your petitioner regularly discharged his Malgoozary for the same, down to the Bengal year 1185.
That in the following year 1186 when Jugol Mahapatter from his attack, and Depredation became possessed of the said pergunnahs of Midnapore, and Dica Bazar, he left your petitioners said villages to farm, to one Chunderseker Ghose, who held the same till the Bengal year 1188.
That in the Bengal year 1189 when the said Jugool Mohapatter was driven out of the said Pergunnah, by Rannee Suremoney Zemindar of Midnapore, and Dica Bazar aforesaid, your petitioner recovered the possession of the said village and regularly discharged the Malgoozary for the same till the month of Maug Bengal year 1192, without any arrear, at which period your petitioner was dispossessed of his said farms by the said Rannee, who collected and received Paddy and Money from the Riots belonging to the same, which your petitioner had [lent and supplied] them with for the cultivation of the said lands.
That your petitioner represented the said Injury to your Board, who issued a purwannah to the said Rannee, to restore the said property but she has not hitherto obeyed, or paid the least attention to it.
Prayer :
Your petitioner therefore most Humbly prays, that a peremptory order may be issued to the said Ranney, to restore the said money and paddy, so unjustly taken and detained, and that your petitioner may have such further relief in the premises as to your Board shall seem meet.
And your Petitioner as in duty bound shall ever pray & ca

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক সূত্র

A. Manuscripts

i) District Collectorate Library / Record Room. From 1906-1947
Midnapore District Judge Court Record Room. From 1919-1947
ii) Manuscript letters corresponded between the District authorities (Residential / Collector / Judge-Magistrate of Midnapore) and the Higher authorities at Midnapore

B. 1) National Archives of India, New Delhi, Government of India.

Department of Industries and Labour
Department of Railways, Establishment Branch
Foreign Department, Political Proceedings
Home Department, Political
Home Department, Public
Home Department, Judicial
Home Miscellaneous, Vols-30-36
Public Works Department, Railway Construction
Railway Department (Railway Board), Establishments
Revenue and Agriculture Department, Revenue Branch

2) West Bengal State Archives, Calcutta

Commerce, Labour and Industrial Department.
1) Industries Branch 2) Labour Branch 3) Commerce Branch
General Department , Miscellaneous Branch
Labour Department, Labour Branch
Municipal Department, Municipal Branch
Political Department, Political Branch
Political Department, Police Branch

3) West Bengal State Police Archives

C.I.D. (I.B.) reports, 1939-1945

C. Contemporary Gazetteers, Bulletins, Newspapers, etc.

The Indian Annual Register
The Indian Quarterly Register
Bulletin of the Cultural Research Institute, Tribal Welfare Department, Govt. of West Bengal, Calcutta,1966.

Bengal Nagpur Railway Gazettee
Amrita Bazar Patrika
Forward
Hindusthan Standard
Kharagpur Municipal Diary, 1994
Liberty
Native Newspapers and Periodicals
The Statesman
The Englishman
Times of India
Orissa Historical Research Journal
The Journal of the Asiatic Society of Bengal
Centinary Commemoration Volume, 1973, Midnapore College
মেদিনীপুর টাউন স্কুল শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা
মেদিনীপুর মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের ১৯৯২-'৯৩ সালে প্রকাশিত স্মরণিকা
শতবর্ষ স্মরণিকা বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়
স্মরণিকা, মেদিনীপুর জেলা রজত জয়ন্তী সম্মেলন; ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ১৯৯৩
আনন্দবাজার পত্রিকা
যুগান্তর
স্বাধীনতা
গণশক্তি
বেহুলা
মাসিক বসুমতী
একসাথে
গড়বেতা হাইস্কুল পত্রিকা, ১৩৯০

D. সাক্ষাৎকার

ক) পরেশ ধাড়া, গ্রাম গোপকাশী ৩ নং অঞ্চল, ডেবরা থানা, জেলা মেদিনীপুর, ৪/১/৯৯
খ) নিমাই মন্ডল, ইন্দা, খড়গপুর, ৮/১/৯৯

গ)দুঃখরাম বৈঠ্যা (মোড়ল), গ্রাম কৃষ্ণনগর, থানা- খড়গপুর (গ্রাঃ), মেদিনীপুর, ১২/১/৯৯
ঘ)সদানন্দ ঘোড়ই, গ্রাম ধোবাশোল, থানা- সাঁকরাইল, মেদিনীপুর, ১৭/১/৯৯
ঙ)বিশ্বজিৎ রানা, কমলাপুরিয়া,নয়াগ্রাম, মেদিনীপুর, ২১/১/৯৯

Government Publications and Contemporary Gazetteers

M.M.Chakravarty, A Survey in the changes in the jurisdiction of the district of Bengal, 1757-1916, Calcutta, 1918
M.N.Banerjee, Monograph on Cotton Fabrics of Bengal, Calcutta, 1898
H.V.Bayley, Memoranda of Midnapore, Calcutta, 1902
M.N.Gupta, Analytical Survey of Bengal Regulation reproduced in the Census Report, Midnapore, 1951
A.K.Tamerson, Midnapore, 1910-18
Henry Ricketts, Report on the district of Midnapore, including Hidgelle and Cuttack, Calcutta, 1858
– –, Selection from the Records of the Bengal Government, No.XXX, Report on the district of Midnapore incli ding Hidgelle and Cuttack, Calcutta, 1859
N.K. Sinha (Ed), Midnapore Salt papers : Hijli and Tamlook, 1781-1807, Calcutta, 1954
Bengal District Gazetteer, Midnapore, Calcutta, 1911
Bengal District Gazetteer Midnapore District B Volume: Statistics 1911-1912 to 1920-21, Calcutta, 1923
Census of India 1951, District Handbook, Midnapore, Calcutta, 1954
Census of India 1961, West Bengal District Census Hand Book; Midnapore, Vol–I, Calcutta, 1966
Census of India, Basic Results of 1961 Census, New Delhi, 1966
Census of India 1971, General Population Tables, Delhi,1975
Census of India 1941, West Bengal, Midnapore
Census of India1971, West Bengal District Census Hand Book Midnapore District, n.d.
Census of India 1981, General Population Tables, Series , Part 2 A (i), Tables A- I to A-3, Delhi, 1985
Census of India 1981, West Bengal District Hand Book, Midnapore District, Calcutta, 1982

Pocket Book of Health Statistics 1973, Department of Family Planning, Government of India, New Delhi, 1973
Bengal Administration Report, 1872-1913
Circular issued on 4 October. 1739- Governor- General-in-Council on the issue of the restoration of peace in Midnapore Collectorate.
Memorandum on the Revenue administration of the Lower Bengal, Calcutta 1873
L S S O' Malley, Bengal District Gazetteers, Midnapore, Calcutta, 1911
Report of the Committee appointed under Famine Commission to enquire into the management of irrigation work in Madras, Orissa and Midnapore, Calcutta-1879
Census of India 1921, Vol.V, Part I, Bengal
Mukherjee, R.K., Indian Land System, The Report of the Land Revenue Commission, Vol-II, Calcutta, 1940
Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District, Department of Economic Studies, United Bank of India (1971)

দ্বৈতীয়িক সূত্র

ক-গ্রন্থ

Ahmed Salahuddin, Social idea and Social changes in Bengal, 1818-35, London, 1965
Allami Fazl Abul, The Ain-i- Akbari, Vols-II, Translated into English by colonel H.S. Jarret, Calcutta, 1949
Baden Powel, B.H., The Land System of British India, 3 Vols, Oxford, 1892
Banerjee, A.C., Agrarian system of Bengal, Vol-2, Calcutta, 1981
Banerjee.,T.D, Zamindars and Ryots of Bengal, Calcutta, 1886
Bose, Nemaisadhan, Indian Awakening and Bengal, (Second Edition), Calcutta, 1869
Bhandari, R.R., The Blue Chip Railway, Calcutta, 1987
Bipan Chandra, Rise and Growth of Economic Nationalism in India, New Delhi, 1966
Bhattacharyya, Sukumar, The East India Company and Economy in Bengal, 2nd ed. Calcutta,1969
Chatterjee, Gouripada, History of Bogri Rajya, Garhbeta, 1976

– – – –, Midnapore the Forerunner of India's Freedom Struggle, Delhi. 1986
Chakraborty. Dr. Ramakanta, Vaisnavism in Bengal, 1486– 1900. Calcutta, 1985
Chattopadhyaya, Goutam, Communism and Bengal Freedom Movement, New Delhi, 1970
Chaudhuri, S.B., Civil Disturbances during the British rule in India (1765– 1857), Calcutta, 1955
Cobden Ramsay L.E.D., Feudatory States of Orissa, Calcutta, 1909
Das, B.S. Civil Rebellion in Frontier Bengal, Calcutta, 1973
– –, Changing Profile of the Frontier Bengal, Delhi, 1984
Das, Narendra Nath, History of Midnapore (Political), Vol–I (1760-1803), Midnapore, 2nd ed., 1962
– – History of Midnapore, Part Two, Calcutta, 1962
– –, Fight For Freedom in Midnapore (1928-38), Midnapore, 1980
De, Amalendu, Roots of Separatism in nineteenth century Bengal. Calcutta, 1974
Dalton, Edward Tuite, Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1872
Desai, A.R. (ed). Peasent struggles in India, Calcutta, 1979
Dutta, R Palme, India To-day, Bombay, 1949
Dutta, K.K., The Santal Insurrection, Calcutta, 1940
– –, Alivardi and his times, Calcutta, 1939
Epygraphia Indica, Vol. XXIX
Gadgil, D.R., The Industrial Revolution in India in recent times (1860-1939), Delhi, 1973
Ghosh, Dr. Niranjan, Role of Women in the Freedom Movement in Bengal (1919-1947), Midnapore, 1988
Gupta, A.C.(ed), Studies in Bengal Renaissance, Calcutta, 1958
Jha, Jagadish Chandra, The Bhumij Revolt, (1932-33), Delhi, 1967
Hamilton, W., Description of Hindostan, Vol– I, Delhi, 1971,
Hunter W.W., Statistical Account of Bengal, Vol–III, London, 1876
– –, Annals of Rural Bengal (6th edition), London, 1883
Khan, Raja Mahendralal, The History of Midnapore Raj. Calcutta, 1889
Maiti, Sachindra Kumar, Freedom Movement in Midnapore, Calcutta, 1975
Macchetchion, D.J., Late Medieval Temples of Bengal, Calcutta, 1972

Mathur, J.S., Indian Working Class Movement, Allahabad, 1964.
Mohanty, A.B.(ed), Madla Panji, Cuttack, 1940
Palit, Chittabrata, Tensions in Bengal Rural Society, Calcutta, 1975
Price, J.C. Notes on History of Midnapore, Vol-I, 1876
Rasul, M.A.A, History of the All India Kishan Sabha, Calcutta, 1974
Risley, Sir Herbert H, The People of India, Delhi, 1961
– – –, The Tribes and Castes of Bengal, Vol.-I Calcutta, 1981.
Ray Choudhury, Satyabrata, Leftist Movements in India, 1917-1947, Calcutta, 1973
Santra, Gangadhar, Temples of Midnapore, Calcutta, 1980
Saha, Panchanan, History of the Working Class Movement in Bengal, New Delhi, 1978
Sarkar, D.C., Indian Epigraphy, Baranasi, 1965
Sarkar, Sumit, The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908, New Delhi, 1977
Sen, Sunil, Agrarian Relations in India, 1793- 1941, New Delhi, 1979
Saraswati, S.K., Architecture of Bengal, Book I, 1976
Sinha, Pradip, Nineteenth Century Bengal: Aspects of Social Change, Calcutta, 1965
Sanyal, Rajat, Voluntary Associations and Urban Public Life in Bengal (1815-1876), An Aspect of Social History, Calcutta, 1980
Sur, A.K., History and Culture of Bengal, Calcutta. 1963
Vidya-Bhavan, Bharatiya, British Paramountcy and Indian Renaissance, Part-II, Bombay 1965
অধিকারী, ইন্দুভূষণ (সম্পাঃ), রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭
আলবেরুণী, ভারত তত্ত্ব, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনূদিত, ১৯৮২, বাংলা একাদেমী, ঢাকা
করণ, মহেন্দ্রনাথ, হিজলীর মসনদ-ই- আলা (২ য় সংস্করণ), কলিকাতা, ১৯৫৮
কর্মকার, ফকির নারায়ণ, কীর্ত্তিভূমি বিষ্ণুপুর , কলিকাতা, ১৩৮৫
কার্লেকর, কল্যানী, ভারতের শিক্ষা (২য় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৬১
কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ, ভারতীয় সাধনার ধারা, কলিকাতা, ১৯৭৫
খান, আজহারউদ্দীন (সম্পা), বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৩, মেদিনীপুর

গ্রন্থপঞ্জী

খান, আজহারউদ্দীন, বীক্ষণী, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
গিরি, সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, কলিকাতা, ১৯৮৮
গায়েন, হৃষীকেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর
গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, ১৩৮৮
গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন, সঙ্গীতসার, ১৮৬৯
গোস্বামী, গোপীনন্দন, বাংলার হলদিঘাট, তমলুক
গোস্বামী, সনাতন (সম্পাঃ), গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রী চৈতন্যদেব , কলিকাতা, ১৯৮৮
গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যানকুমার, বাংলার ভাস্কর্য, কলিকাতা, ১৯৪৭
গঙ্গোপাধ্যায়, মনোমোহন, স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা, ১৯৫৯
ঘোষ, বিনয়, পঃবঃ সংস্কৃতি (১ম খন্ড) কলিকাতা,১৯৫৭
ঘোষ, বিনয়, পঃবঃ সংস্কৃতি (২য় খন্ড) কলিকাতা, ১৯৭৮
ঘোষ, শৈলেন্দ্রকুমার, গৌড় কাহিনী (১৯৬৪)
ঘোষ, দেবপ্রসাদ, স্টাডিস ইন মিডিয়াম অ্যান্ড মিউজিওলজি ইন ইন্ডিয়া,১৯১৮
ঘটক, অধর, নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত, মেদিনীপুর,(প্রকাশকাল অজ্ঞাত)
চৌধুরী, শশীভূষণ, এথনিক সেট্‌লমেন্টস্ ইন অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, কলিকাতা,১৯৫৫
চৌধুরী কামিল্যা, মিহির, রাঢ়ের গ্রাম্যদেবতা, বর্ধমান, ১৯৮৯
চৌধুরী, কিরণ, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কথা, কলিকাতা, ১৯৮৭
চক্রবর্তী, রাধানাথপতি, কেশিয়াড়ী
চক্রবর্তী, পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
চক্রবর্তী, পঞ্চানন (সম্পাঃ), শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন
চক্রবর্তী, কবিকঙ্কন মুকুন্দ, চন্ডীমঙ্গল (সম্পাঃ ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ১৯৭৭)
চক্রবর্তী, রাধারমণ, কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি
চক্রবর্তী, রাধারমণ, শাক্ততীর্থ কর্ণগড়
চক্রবর্তী, রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড, কলিকাতা,১৯৯৯
চক্রবর্তী, ব্যোমকেশ, খড়গপুরের কথা, মেদিনীপুর, ১৩৬৭
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র, দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা, কলিকাতা, ১৯৫৭
চট্টোপাধ্যায়, ডঃ গৌরীপদ , দঃ পঃ বাংলার ইতিহাস ১ম খন্ড, মেদিনীপুর, ১৯৮৬
চট্টোপাধ্যায়, ডঃ গৌরীপদ, দঃ পঃ বাংলার ইতিহাস, ২য় খন্ড, মেদিনীপুর, ১৯৮৭
চট্টোপাধ্যায়, গৌতম, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ, কলিকাতা, ১৯৯০
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯০
চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ, কর্ণগড়ের কথা- সাধনা ও কাব্য, কলিকাতা, (?)
জানা, যুধিষ্ঠির, বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)
জানা, সুরেন্দ্রনাথ, বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত (সম্পাঃ সুকুমার মাইতি), মেদিনীপুর, ১৯৯০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ শ খন্ড, পঃ বঃ সরকার
দত্ত, অক্ষয়কুমার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (সম্পা) বিনয় ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৯৪৫
দত্ত, স্পেনসার সুব্রত, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ১ম খন্ড ১৯৮৭
দাস, কৃষ্ণচরণ, শ্রী শ্রী শ্যামানন্দ প্রকাশ, মেদিনীপুর, ১৩৮৪
দে, বরুণ (সম্পাঃ), মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, কলিকাতা, ১৯২২
দাস, বসন্তকুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর (১ম খন্ড), কলিকাতা, ১৯৮০
- - - - , স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর (২য় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৮৪
দাস, গোপীজন বল্লভ, রসিক মঙ্গল ১৯৪১
দাস, বিনোদশঙ্কর, জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুরের গণ বিক্ষোভ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৮
দাস, বিনোদশঙ্কর (সম্পাঃ) মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ১ম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৯
দাস, চিত্তরঞ্জন, মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস, মেদিনীপুর, ১৯৬৯
দাস, গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬
দাস, হরিসাধন, মেদিনীপুর সম্পদ, কলিকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ
দাস, সনাতন (সম্পাঃ) শ্রীমন্ মহাপ্রভু, চন্দ্রকোনা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ
দাশ, সুধীররঞ্জন, উৎখনন বিজ্ঞান (১৯৭৫)
দাস অধিকারী, গোপালচন্দ্র, শ্রী শ্রী গোকুলানন্দ মাহাত্ম্য ও তুলসীচারা মেলার ইতিকথা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
দেব গোস্বামী, ব্রজেন্দ্র নন্দনানন্দ, অনিরুদ্ধবতার শ্রী রসিক মুরারী, শ্রীপট গোপীবল্লভপুর ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ
দেবগোস্বামী, ব্রজেন্দ্র নন্দনানন্দ, কণকমঞ্জরী শ্রী শ্রী শ্যামানন্দ শ্রীপট গোপীবল্লভপুর ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ
দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)
দীর্ঘাঙ্গী, কানাইলাল, ভগ্ন দেউলের ইতিবৃত্ত, চন্দ্রকোনা, ১৩৭৬
পাল, ত্রৈলোক্যনাথ, মেদিনীপুরের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড), মেদিনীপুর, ১৩০২
পাল, ত্রৈলোক্যনাথ, মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, কলিকাতা, ১৮৯৭
পাল, ত্রৈলোক্যনাথ, মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, কলিকাতা, ১৮৯৭

গ্রন্থপঞ্জী

পতিশর্মা, রাধানাথ, কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর, ১৩২৩
ব্রহ্মচারী, বঙ্কিম, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর,
বসু, যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩২৮
বসু, নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বকোষ, অষ্টাদশ খন্ড, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ
বসু, প্রবোধচন্দ্র, ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা,১৯৭৬
বসু, ত্রিপুরা, সাহিত্য সেবায় মেদিনীপুর,১৩৮৮
বসু, অতুলচন্দ্র, মেদিনীপুরে বোমা পিস্তল, কলিকাতা
বসু, লোকেশ্বর, আমাদের পদবীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৬
ব্রহ্ম, তৃপ্তি, লোক জীবনে বাংলার লৌকিক ধর্ম সঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা, ১৩৯২
ব্রহ্মচারী, বঙ্কিম, মহিষাদল ও রাজকাহিনী, মেদিনীপুর, ১৯৯১
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, দেখা হয় নাই, ১৩৮০, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি (২য় সংস্করণ), কলিকাতা, ১৯৭৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত, রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহ ও শ্রীশ্রীবিশালাক্ষীমাতার ইতিবৃত্ত, মেদিনীপুর, ১৯৪১
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র ও দাস সজনীকান্ত, (সম্পা), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, ১৩৫৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র (সম্পাঃ), শূন্যপুরাণ, কলিকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবন লোক সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯০
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, লৌকিক ঐতিহ্য, লোকায়ত মানস ও আধুনিক বাংলা কাব্য, কলিকাতা, ১৯৭৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাংলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩২১
বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র, মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালী, কলিকাতা, ১৯৮৬
ভৌমিক, খগেন্দ্রনাথ, আমাদের পদবীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৬
ভৌমিক, প্রবোধকুমার, মেদিনীপুরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ১৯৮৪
ভৌমিক, প্রবোধকুমার, মেদিনীপুরের কাহিনী , মেদিনীপুর, বর্দ্ধিত সংস্করণ, ১৯৮৫
ভৌমিক, প্রবোধকুমার, আমাদের মেদিনীপুর, সেকাল একাল,কলিকাতা, ১৯৮১
ভৌমিক শ্যামাপদ, খড়গপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯৪
ভৌমিক, ডঃ সুহৃদ কুমার, আদিবাসীদের ভাষা ও বাংলা, মেদিনীপুর, ১৯৯১
ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৭৩
ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর, বৃহত্তর গড়বেতার ইতিহাস, মেদিনীপুর, ১৯৮২
ভট্টাচার্য, তরুণদেব, মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৭৯
ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস (পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

ভট্টাচার্য, গোকুলেশ্বর, স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (১ম ও ২য় খন্ড)
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, নয়াদিল্লী ১৯৮১
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭০
ভট্টাচার্য, বিজন বিহারী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি , কলিকাতা, ১৯৮৫
ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ, ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
ভূইঞা, সুধাংশু শেখর, স্বাধীনতা সংগ্রামে নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৯১
মিত্র, অশোক (সম্পাঃ), পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, তৃতীয় খন্ড, দিল্লী, ১৯৭১
মিত্র, অশোক (সম্পাঃ), ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস্, মিডনাপুর, কলিকাতা, ১৯৫১
মিত্র, সারদাচরণ, উৎকলে শ্রীচৈতন্য (১৩২৪)
মিত্র, ইন্দ্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৯৬৯
মিত্র, সনৎকুমার, পঃ বঃ লোকসংস্কৃতিবিচিত্রা
মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ - মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ) কলিকাতা, ১৯৮৮,১৯৮৭,১৯৮১
মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (মুক্তিযুগ), কলিকাতা, ১৯৮২
মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচৈতন্য, ফা-হিয়েনের দেখা ভারত, কলিকাতা, ১৩৬৭
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন (সম্পাঃ) পদাবলী পরিচয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৫৯
মুখার্জ্জী, সরোজ, ভারতের কম্যুনিষ্ঠ পার্টি ও আমরা, ১ম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫
মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, গৌড়ের কথা, ১৩৯০
মালীবুড়ো, তাম্রলিপ্তের ময়ূর রাজবংশ,
মীনহাজ-ই-সিরাজ, 'তবকাত-ই- নাসিরী', আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৩
মন্ডল, পঞ্চানন (সংকলিত), পুঁথি পরিচয় ১ম খন্ড (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)
মন্ডল, হরিপদ, মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ইতিকথা, কলিকাতা, (?)
মন্ডল, ডঃ সুশীলা, বঙ্গদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৩
মন্ডল, বিজয়কুমার, শালমহুয়ার দিন, খড়গপুর, ১৯৯৩
মাইতি, রবীন্দ্রনাথ, চৈতন্য পরিকর (তারিখ অজ্ঞাত)
মাইতি, প্রদ্যোৎকুমার, বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিত, মেদিনীপুর, ১৯৮৮
মাইতি, ডঃ প্রদ্যোৎকুমার, তাম্রলিপ্ত-তমলুকের সমাজ ও সংস্কৃতি, তমলুক,১৯৮৭
রায়, নীহার রঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), কলিকাতা, ১৯৫৯
রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথমভাগ, কলিকাতা, ১৯৬৬

রায়, পঞ্চানন, বাংলার মন্দির, মেদিনীপুর, ১৯৭৪
রায়, পঞ্চানন, দাসপুরের ইতিহাস, কলিকাতা ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
রায়, প্রণব, মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন সম্পদ, কলিকাতা, ১৯৮৬
রায়, প্রণব ও দাস, বিনোদশঙ্কর (সম্পা), মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯৯৮
রায়, বি (সম্পাদিত), ডিষ্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১,মিডনাপুর, ভল্যুম-১, কলিকাতা, ১৯৬৬
রায়, মৃগাঙ্কনাথ, মেদিনীপুর জেলার জাড়া রায়বংশের পরিচয়, মেদিনীপুর, ১৩৬৮
রায়, সুধাংশু কুমার, দি ফোক আর্ট অব ইন্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯৬৭
রায়, পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ও রায়, প্রণব, ঘাটালের কথা, ঘাটাল, ১৯৭৭
রনদিভে, বি. টি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৮৭
রক্ষিত, ত্রৈলোক্য নাথ, তমোলুকের ইতিহাস, ২য় মুদ্রন, মেদিনীপুর, ১৩৭৯
ষড়ঙ্গী, সত্যেন্দ্রনাথ, শাঁকরাইল থানার কথা (তারিখ অজ্ঞাত)
সেন, সুকুমার, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলকাতা, ১৩৫০
সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৯৩
সেন, সুকুমার, (সম্পা), শরৎ সাহিত্য সমগ্র-১, কলিকাতা, ১৪০০
সেন, সুকুমার, বাংলার স্থাননাম, কলিকাতা, ১৩৮৯
সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল, চীন ভারত ও ভারত চীন পরিব্রাজক বৃন্দ (১৯৭৭)
সেনগুপ্ত, কান্তি প্রসন্ন, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ, কলিকাতা,
সারস্বত সমাজ, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ
সরকার, দীনেশচন্দ্র, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ,. কলিকাতা, ১৩৮৯
সরকার, দীনেশচন্দ্র, পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত, ১৩৯২
সরকার, দীনেশচন্দ্র, পাল সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২
সরকার, তনিকা, বেঙ্গল ১৯২৮-৩৪, দিল্লী, ১৯৪৯
সরকার, জগদীশ নারায়ণ, বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৮৮
সিংহ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫), কলিকাতা, ১৯৬৭
সিংহ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার অর্থনৈতিক জীবন, কলিকাতা, ১৯৬৭
সিংহ, রাধারমণ, চন্দ্রকোনায় নবকুঞ্জ মহোৎসব, ১৩৮৩
সিংহ, রায়মল্ল, নিরঞ্জন, বঙ্গোৎকলে আগত শোলাঙ্কী রাজপুত ক্ষত্রিয়, মেদিনীপুর,১৯৭২

সাঁতরা, তারাপদ, বাংলার দারু ভাস্কর্য, হাওড়া, ১৯৮০
সাঁতরা, তারাপদ, মন্দির লিপিতে বাংলার সমাজচিত্র, কলিকাতা, ১৩৯০
সাঁতরা, তারাপদ, মেদিনীপুর ঃ সংস্কৃতি ও মানব সমাজ, হাওড়া, ১৯৮৭
সাঁতরা, তারাপদ (৩য়) সংকলন ও গ্রন্থনা, পশ্চিমবঙ্গের পুরা সম্পদ- উত্তর মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৮৭
সুর, অতুল, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৭৭
হালদার, যোগীলাল (সম্পাঃ), রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন, কলিকাতা, ১৯৫৭
ত্রিপাঠী, অমলেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), কলিকাতা, ১৯৩৭

প্রবন্ধ

কুন্ডু, কমল, ভারতের হরপ্পা তমলুক, দৈনিক বসুমতী , ১৩৮৩
খাঁড়া, সুধীর, শিলাবতীর প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমি, কৌশিকী ,১৩৭৮
গুঁই, রাধাশ্যাম, মেদিনীপুর জেলার রেশমচাষ, কৌশিকী, ১৮৮২
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, বঙ্কিম রচনা সমগ্র, প্রথম খন্ড, সাক্ষরতা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৪
দাস, দীপকরঞ্জন, বালিহাটির জৈন মন্দির, কৌশিকী, ১৯৭৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত, এই আমাদের মেদিনীপুর, উপত্যকা, ১৯৭৮
বসু, সন্তোষ, ভারতীয় শিল্পকলায় দেহজ শ্রমের অভিব্যক্তি (২য় পর্ব), ১৯৭৫
মুখোপাধ্যায়, হৃষীকেশ, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত প্রসঙ্গে, আনন্দম, ১৩৭১
মন্ডল, প্রশান্তকুমার, ইউনিক ফসিলস ফাউন্ড ইন তমলুক, দি টেলিগ্রাফ, ১৯৮৪
ম্যাককাচ্চন, ডেভিড জে, নোটস্ অন সাম রিপ্রেজেন্ট্যাটিভ টেম্পলস অব মিডনাপোর ডিস্ট্রিক্ট, সেনসাস হ্যান্ডবুক, মিডনাপোর ১৯৬১
রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, নায়েক বিদ্রোহের এক অজানা তথ্য, কৌশিকী, ১৩৭৭
সরকার, দীনেশচন্দ্র, শশাঙ্কের রাজত্বকালীন এগরা তাম্রশাসন সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা, ১৩৮৭
সামন্ত, বিশ্বনাথ, লালজলের চিত্রকলা, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র স্মরণিকা, ১৯৮২
সেন, প্রবোধচন্দ্র, সাম জনপত্তস্ অব অ্যানিসিয়েন্ট রাঢ়, ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ভল্যুম ৮, ১৯৩২
সাঁতরা, তারাপদ, মেদিনীপুরের একজন মন্দির স্থপতি; শিল্প নিপুনজীবন পরিচয়, 'চতুষ্কোন', আশ্বিন, ১৩৭৭।

নির্ঘন্ট

নির্ঘন্ট